নোঙরহীন নৌকা

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন : ১৩৪৭

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

যে শক্তি আজ ইহাদের ভিতর হইতে
জন্মলাভ করিতেছে সেই শক্তির উদ্দেশ্যে
ইহা
উৎসর্গ করিলাম

—**মনোরঞ্জন**

নোঙরহীন নৌকা

রাত্রি প্রায় দশটা হইবে···

রতনপুরের পাঁচুদাসের বাড়ীর দাওয়ার একদিকে বসিয়াছিল প্রতিবেশী অঘোর সাউ। আরেক দিকে লণ্ঠনের টিম্‌টিমে আলোর সম্মুখে বসিয়া আহার করিতেছিল নিরাপদ। পাশে পাঁচুর মেয়ে সুশীলা বসিয়া বসিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছিল। বেশ শক্ত-শক্ত চেহারা নিরাপদর, গায়ের রঙ পরিষ্কার, হাতকাটা একটা মের্জ্জাই গায়ে, পরণে একখানা ফুলপাড় আটহাতী কাপড়। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সুশীলা কেবলই বলিতে থাকে, এটা দিই, ওটা দিই আর নিরাপদ ঘাড় নাড়িয়া জানায় অসম্মতি।

অঘোর সাউ বলে, খা, খা, ভাল ক'রে খা—সুশীলার বড় ইচ্ছে।

কথাটা নিরাপদর ভাল লাগে না। যদিও গ্রাম সম্পর্কে লোকটা তাহার খুবই বন্ধু, কিন্তু মনটা তাহার কদাকার চেহারার অনুরূপ বলিয়া সে তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। তাহার উপর আবার ইহাদের বাড়ী সে প্রায়ই আসে, একথা জানিবার পর সে তাহাকে আর ভালচোখে দেখিতে পারে না। যেখানে পাঁচুদাসের ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং বালবিধবা মেয়ে রহিয়াছে সেখানে অঘোরের মত লোকের যাতায়াতটা বাঞ্ছনীয় নহে।

খাওয়া শেষ হইলে নিরাপদ হাতমুখ ধুইয়া দাওয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ঘর হইতে সুশীলা আনিয়া দেয় পান। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে অঘোরকে, কি রে যাবি ?

অঘোর হাই তুলিয়া উত্তর দেয়, তুই যা—আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সে যে যাইবে না তাহা নিরাপদ জানে। সুশীলার মাকে উদ্দেশ করিয়া সে বলে, খুড়ীমা আমি চলি গো'—

যাবে, ঘর হইতে সুশীলার মা বলে।

নিরাপদ বলে, হঁ্যা আর ত খানিক বাদেই বেরুতে হবে? খুড়ো চালাক লোক ঘুমিয়ে নিচ্ছে, আমিও যাই—

সুশীলা বলে, দাঁড়াও আলোটা ধরি।

দরজার কাছে আসিয়া নিরাপদ বলে, যাও সুশীলা!

নিরাপদ পথে নামিয়া পড়ে। সুশীলা বলে, আবার এসো।

রাত্রে বৃষ্টির জন্য যাত্রার পালা গানটী অৰ্দ্ধেক হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া দলপতি গ্রামবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পরদিন দিনের বেলাতেই 'যাত্রা' স্বরু করিয়া দেয়। অবশ্য রাত্রেই যাত্রা হইতে পারিত, কিন্তু রতনপুর হইতে প্রায় মাইল দশেক দূরে কি একটা গ্রামে পরের দিন রাত্রে তাহাদের 'বিট' আছে বলিয়া আজ গাহিয়াই এখানকার সবকিছু চুকাইয়া দিতে চায়। কেন না রাত্রে অভিনয়ান্তে পরদিন সেখানে পৌছাইতে পৌছাইতেই সন্ধ্যা হইয়া যাইবে, দলের অভিনেতারা ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, 'প্লে' তাহাতে জমিয়া উঠিবে না, দলের নাম খারাপ হইয়া যাইবে। আর নাম খারাপ হইলে পসার কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। অথচ এখানেও গ্রামবাসীদের সন্তুষ্ট করিতে হইবে, গণিয়া দেড়শতটি মুদ্রা লওয়া হইয়াছে দুইখানি নাটক অভিনীত হইবে বলিয়া। প্রথম রাত্রে 'নরকাসুর' অভিনীত হইয়াছে, দ্বিতীয় রাত্রে হইতেছিল 'রামানুজ'। রামানুজের মাঝেই আসিয়াছিল বৃষ্টি! তাই মাঝামাঝি উপায় অবলম্বন করিয়া 'রামানুজ' পালাটী দিনের বেলাতেই গাওয়া হইতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে ড্যাম্-ড্যাম্ করিয়া ঢোল পিটাইয়া যাত্রা শেষ হইল বলিয়া ঘোষণা করিলে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল বাড়ী ফিরিবার জন্য। আসরে ও এদিক্-ওদিকে কয়েকটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলিতেছিল। লোকে তাহারই আলোকে ছুটাছুটি হাঁকা-হাঁকি করিয়া যে-যার সঙ্গী-সাথীদের ডাকিতেছিল।

নিরাপদ চুপ করিয়া আসরের দিকে একটা আলোর পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। সে চাহিয়া দেখে যে লোকটা কৈকেয়ী সাজিয়াছিল পাউডার-মাখা মুখে সে এদিক্-ওদিকে ঘুরিতেছে। নিরাপদ ভাবে, যাত্রার দলের লোক ত, মেয়েরা বাহির হইবে তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে। মেয়েরা তখন চিকের আড়াল হইতে সবেমাত্র বাহির হইতে সুরু করিয়াছে। নিরাপদর বড় রাগ হয়—লোকটা অমনি করিয়া চিকের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিবে! গ্রামে কি লোক নাই? কেহ ত কিছু বলিতেছে না। নিরাপদ ভাবে, তাহারই বা কি দায় পড়িয়াছে যে সে লোকটাকে বারণ করিবে! তাহার বাড়ীর মেয়ে ত কেউ ওখানে নাই। তাহাদের বৌ-ঠাকরুণ অর্থাৎ বনমালীর বউ ত আসে নাই, উপরি-উপরি দেড়টা রাত জাগিয়া আজ সে ঘুমাইতেছে, তাহা ছাড়া সে আসিতে পারে নাই, সংসারে তাহার বহুকাজ। কাজেই নিরাপদর কোন দায়িত্ব নাই মেয়েদের সম্পর্কে।

কিন্তু না বলিলেও ত চলে না। হঠাৎ নিরাপদ পিছন হইতে কাহার কণ্ঠস্বর শোনে। কে তাহাকে যেন ডাকিতেছে! পিছনদিকে তাকাইয়া নিরাপদ দেখিতে পায়, পেট্রোম্যাক্স আলোয় তাহার যে ছায়াটা পিছনদিকে পড়িয়াছে তাহারই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কে একজন স্ত্রীলোক! মাথাটা একটুখানি সরাইতেই তাহার মুখের উপর আলো পড়িল, মুহূর্ত্তমধ্যে সে তাহাকে চিনিতে পারে। পাঁচুদাসের মেয়ে সুশীলা। নিরাপদ তাহার দিকে আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, ডাক্‌ছিলে সুশীলা?

হ্যাঁ বাড়ী যাব—রাত হয়েছে—একলাটী, সুশীলা বলে।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, কার সঙ্গে এসেছিলে তুমি ?

—কালীদের বৌয়ের সঙ্গে।

—তারা গেল কোথায় ?

—কি জানি বোধ হয় চ'লে গেছে !

—তাহ'লে ত মুস্কিল !

সুশীলা বলে, মুস্কিল আর কি, তুমি ত বাড়ী ফিরবে চলনা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই।

—তাহলে ত কোন ভাবনা ছিলনা সুশীলা, বলিয়া নিরাপদ এদিক্ ওদিকে তাকায়।

—ভাবনা আর কি—কপাল আমার ভেঙেছে অনেকদিন, সুশীলা যেন আরও কি বলিতে যায়।

নিরাপদর বড় মায়া হয়। সুশীলা বিধবা, শুধু তাই নয়, বয়স তাহার একুশের অনধিক হইবে। সুতরাং নিন্দা তাহার সম্বন্ধে যে-কোন সময়েই উঠিতে পারে। নিরাপদ চায় সেটুকু বাঁচাইতে। কিন্তু সুশীলা যেন সকল বিষয়েই একটু বাড়াবাড়ি করে। কালীদের বউয়ের সহিত যদি সে আসিয়াছিল, তাহাদের ছাড়িয়া দিল কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর কি সুশীলা নিজেই দিতে পারিবে ?

অগত্যা নিরাপদই তাহাকে লইয়া যায়। বারোয়ারীতলা হইতে তাহাদের বাড়ী অনেকটা দূর। বনের পথ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অন্ধকারে ঢিপি-ঢাপা পার হইয়া দুইজনে চলিতে থাকে। সুশীলাদের সহিত নিরাপদর বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। ঘনিষ্ঠতা অর্থে নিরাপদর আত্মীয়ও নয় কুটুম্বও নয়, এক পাড়ায় বাস করে বলিয়া তাহাদের সহিত সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক আরও একটুখানি দৃঢ় হইয়াছে, প্রায়ই নিরাপদ উহাদের বাড়ী যাতায়াত করে বলিয়া।

নোঙরহীন নৌকা

পথে যাইতে যাইতে সুশীলা বলে, তোমাদের বৌদিকে বোলোনাগো একদিন আমাদের বাড়ী আস্‌তে।

বল্‌ব'খন, বলিয়া নিরাপদ হাততালি দিয়া হাঁটিতে থাকে। কে জানে যদি জঙ্গল হইতে সাপ আসিয়া ছোবল মারে পায়ে, তবু হাততালির শব্দে পালাইয়া যাইবে। সুশীলা চলিতে চলিতে কেবলই আবোল-তাবোল বকিতে থাকে; নিরাপদকে সে বলে, হ্যাঁগা তুমি বিয়ে করনি কেন?

নিরাপদ বলে, খাওয়াবো কি?

—কেন তুমি নিজে যা' খাও!

—আমি নিজে পরের বাড়ী খাই।

—বউও না হয় খাবে।

নিরাপদ বুদ্ধি করিয়া বেশ একটা কথা বলে, বউ কখনো পরের বাড়ী খায়না, নিজেই ঘর বাঁধবার চেষ্টা করে।

—তাই হলেই ত ভাল।

—কিন্তু পয়সা কোথায়?

—কেন উপায় করবে!

—কত আর উপায় করব?

—দুটো মানুষের পেট চালাবার জন্যে আর উপায় করতে পারবেনা?

—কিন্তু দুটো মানুষই কি চিরদিন থাক্‌বে?

বিজ্ঞের মত সুশীলা বলে, তা' অবিশ্যি বটে—ছেলে পুলে হবে ত!

পথে দুই-একজনের সহিত দেখা হয়। নিরাপদ যাইতেছে দেখিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করেনা। সঙ্গে মেয়ে ছেলে দেখিয়া কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারিত কিন্তু সকলেই জানে বনমালীর বউ কাঁদন, নিরাপদর সহিত যাওয়া-আসা করিয়া থাকে। বনমালীর বউ নিরাপদর বৌদিদি হয়, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে সন্দেহজনক ধারণা কেহ করে না।

পথ নির্জ্জন হইলেই সুশীলা নানারকম কথা বলিতে থাকে। নিরাপদ কোনটা শোনে, কোনটা শোনেনা। মাথার উপরে রাত্রির আকাশ—দিকে দিকে ছড়ানো নক্ষত্রের দল, পাশে জঙ্গল হইতে ডাকে ঝিঁ ঝিঁ পোকা। বৈশাখের দক্ষিণা বাতাস আচমকা ললাট স্পর্শ করে।

সুশীলা বলে, আচ্ছা এই রকম রাতে বেশ ঘুরতে ইচ্ছে করে না?

নিরাপদ উদাসভাবে জবাব দেয়, কি জানি!

—আমার ত ইচ্ছে করে খুব খানিকটা ঘুরি—ঘুরবে খানিক?

নিরাপদ হাসিয়া বলে, তাহ'লে আর সকালে মুখ দেখাতে হবে না।

—কেন?

—কেন তা' বুঝি জাননা?

সুশীলা কি যেন ভাবে। তারপর বলে, আমার কোন কিছুই ভাল দেখায়না, আমি বুঝি সেকথা। কিন্তু কি কর্‌ব—

নিরাপদ জোরে জোরে পা ফেলিতে থাকে। পিছন হইতে হু হু করিয়া সুশীলা ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। নিরাপদর কাণে গিয়া তাহা বাজে।

কিছুক্ষণ পরেই তাহারা পাড়ায় আসিয়া পড়ে। আর খানিকটা গেলেই সুশীলাদের বাড়ী। সুশীলা বলে, তুমি কিন্তু বোলোনা যে বারোয়ারীতলা থেকে আমাকে নিয়ে এসেছো। তুমি বোলো যে তোমাদের বউদিদির কাছ থেকে রেখে যাচ্ছো। তা' না হ'লে মা আমায় খেয়ে ফেল্‌বে।

কেন, জিজ্ঞাসা করে নিরাপদ।

সুশীলা বলে, জানইত সব! আপন মা হ'লে না হয় একটা কথা থাকৃত। মা আমায় সব সময়ে কি যেন সন্দেহ করে।

সুশীলার জন্য দুঃখ হয় নিরাপদর। বাস্তবিক এমন হতভাগ্য মেয়ে যে মা হারাইয়াছে, স্বামী হারাইয়াছে। পৃথিবীতে যাহাদের উপর

জোর খাটিবে তাহার তাহারাই বাঁচিয়া নাই। দরজা ঠেলিয়া সুশীলা বাড়ীতে প্রবেশ করিলে নিরাপদ বলিয়া উঠে, তাহলে আমি যাই ?

সুশীলা খপ্ করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলে, লক্ষ্মীটি এক্ষুণি যেও না ! খাওয়া দাওয়া করে তারপর যেও—

নিরাপদ বিস্ময়ান্বিত ভাবে বলে, সে কি করে হয় সুশীলা ?

দাওয়ার একদিকে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। তাহারই অনুজ্জ্বল আলোকে শয়ন গৃহের দরজার নিকট বিমাতাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সুশীলা নিরাপদর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলে, বাবা কোথায় মা ?

শুয়েছে, বলিয়া সুশীলার মা দাওয়ার একদিকে বসিবার জায়গা দেয়।

সুশীলা নিরাপদর দিকে তাকাইয়া বলে, মুখপোড়াটা এসেছে।

নিরাপদ সুশীলার দিকে তাকায়। সুশীলা বলে, দু'চক্ষে দেখ্তে পারি না পোড়ারমুখোকে।

নিরাপদ হাসে।

সুশীলা আগে আগে গিয়া দুয়ারের উপর মাদুর বিছাইয়া দিয়া বলে, এসো,—ব'স ততক্ষণ !

নিরাপদ উঠিয়া বসে দাওয়ার উপর। অঘোর তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন যাত্রা শুন্লি নীরো ?

মন্দ নয়, বলিয়া নিরাপদ সুশীলার মাকে জিজ্ঞাসা করে, খুড়ো এত সকাল সকাল শুল যে ?

সুশীলার মা বলে, দুরাত যাত্রা শুনেছে ঘুমোয় নি একটুও—কাল আবার গাড়ী নিয়ে যেতে হবে তাই ঘুমোচ্চে।

অ, বলিয়া নিরাপদ অঘোরের সহিত গল্প করে। সে মাত্র কয়েক মিনিট আগে এখানে আসিয়াছে।

মায়ে-ঝিয়ে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব কথা হয়। খানিক পরে সুশীলার মা ভাত লইয়া আসে। নিরাপদ খাইতে বসে। সুশীলা সাম্‌নে বসিয়া বসিয়া খাওয়ায়। এইটুকুই ত আনন্দ সুশীলার। তা ছাড়া পল্লীগ্রামের ইহাই রীতি। এই রীতি হয়ত এতখানি নাও পৌঁছাইতে পারিত কিন্তু যেখানে সুশীলার মত মেয়ে রহিয়াছে সেখানে রীতির মাত্রা যে ছাড়াইয়া যাইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

চলিতে চলিতে নিরাপদ ভাবে, সুশীলা কি কিছু ইঙ্গিত করিল তাহাকে ?

কয়েকটা বাগান ও কয়েকখানা বাড়ী পার হইলেই নিরাপদর ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানি পাওয়া যাইবে। বনমালীর বাড়ীর কাছে আসিয়া সে ভাবে একবার উহাদের ওখানে যাইলে হইত! আবার ভাবে থাক্ রাত হইয়া গিয়াছে। কয়েক মিনিট পরেই সে নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়ে।

*　　*　　*　　*

চিরদিন কি এম্‌নি করিয়াই কাটিয়া যাইবে ? কে জানে ইহাই হয়ত জগতের নিয়ম ! শুইয়া শুইয়া নিরাপদ ভাবিতে থাকে। চোখে তাহার ঘুম আসে নাকো, চোখ বুজিয়া সে যে-অন্ধকারকে উপলব্ধি করিতে পারে, ঠিক তেম্‌নি অন্ধকারেরই এক বিশাল সাগরে সে খুঁজিয়া বেড়ায় তাহার জীবনের অর্থ। সময় সময় সে মানুষের জীবনের অর্থও খুঁজিতে গিয়াছে। কিন্তু তাহা এত বিরাট ব্যাপার যে সে কেবল হা-হুতাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে। তবে নিজের জীবন সম্বন্ধে ভাবিতে তাহার আপত্তি নাই, থাকিতে পারে না। মানুষ তাহার নিজের সম্বন্ধে ভাববে বৈ কি !

কিন্তু জীবন তাহার একঘেয়েমিতে পূর্ণ। কবে কিসের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া যে সে এই রতনপুর গ্রামের একান্তে আসিয়া পড়িয়াছিল

তাহা সে নিজেই আজ মনে করিতে পারে না। পিছন দিকে তাকাইলে আজ কেবল সে দেখিতে পায়, জাহানাবাদের অহল্যাবাঈ রোডের পাশে, সহর হইতে প্রায় ছ'মাইল দূরে সন্তোষপুর বলিয়া একটি গ্রামের মাঝামাঝি একখানা ছোট্ট কুঁড়েঘর। দিবাবসানের সাথে সাথে নিরাপদর হাত ধরিয়া তাহার পিতা রামপদ ও তাহার ভগিনী রাধার হাত ধরিয়া জননী মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর বহু দিনের বাস্তুভিটাটি ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে বারকয়েক সেদিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইল। গ্রামের লোক ইতিমধ্যেই ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেকে তাহাদের দেখিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল কেহ কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিল। নিরাপদ তখন খুবই ছোট। তবু সে কেমন অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল। সে হাসিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার সেই হাসির রেখার আড়ালে আড়ালে অপমানের বেদনা যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

কেন যে তাহাদের এরূপ করিয়া পথে বাহির হইয়া আসিতে হইয়াছিল তখন সে সব কথা জানে নাই। জানিয়াছিল পরে। আজ কেবল তাহার মনে পড়ে আদালতের একজন লোককে। লোকটা বুড়া—বুড়ার মাথায় ছিল টাক, গায়ে একখানা পাত্‌লা উড়োনী। পরণে আটহাতী একখানা লালপেড়ে রঙ ওঠা কাপড়, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা। সঙ্গে ছিল একজন মুচী। তাহার পিঠে ছিল একটা ঢোল। বুড়া একেবারে তাহাদের উঠানে আসিয়া উঠিল। তারপর মুচীটাকে কি ইঙ্গিত করিল, সে ঢোল পিটাইয়া দিল। বুড়া একখণ্ড কাগজ হইতে কি সব পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিল। তাহাদের বাড়ী ছাড়িবার দিনটী ইহারই মাস তিনেক পরের ঘটনা।

বর্ষার দিন···

অহল্যাবাঈ রোডের প্রশস্ত বুকে কাদার অন্ত ছিল না। জন্ম

হইতেই কাদা ঘাঁটিতে তাহারা অভ্যস্ত। সেই কাদার উপর দিয়া দীর্ঘ ছ'মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এক সময়ে তাহারা দারকেশ্বরের তীরে আসিয়া পৌছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। ওপারে জাহানাবাদ সহর। সহরের দোকানপাটে তখন আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এপার হইতে বেশ দেখায়। ইতিপূর্ব্বে একবার মাত্র জাহানাবাদে আসিয়াছিল এবং তখনই কেন কি জানি সে এই নগণ্য মহকুমার-কেন্দ্র জাহানাবাদ সহরটীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাই বর্ষার খরস্রোত দারকেশ্বরের বিস্তীর্ণ বক্ষের সীমা অতিক্রম করিয়াও এক অজানা ঔৎসুক্যে চাহিয়া রহিল সেই অন্ধকারে জোনাকির মত জ্বলিয়া ওঠা সহরের রহস্যময় আলোগুলার দিকে। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। খেয়ানৌকা ঘাটে ভিড়িতেই তাহারা পার হইয়া আসিল।

রাত্রিটা একটা হোটেলের একদিকে শুইয়া কাটাইয়া দিয়া পরদিন সকালে আবার তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল। তারপর দুপুরের মাঝামাঝি আসিয়া পৌছাইল মায়াপুর। চটীতে স্নানাহার সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা তিনটা নাগাদ আবার চলা। একে একে পার হইল রসুলপুর, পার হইল বেগরহানা। বেগরহানা বর্ষায় যথেষ্ট ফুলিয়া উঠিয়াছিল। খেয়ানৌকা না হইলে পার হওয়া যায় না। অন্যান্য যাত্রীদের মত তাহাদেরও খেয়া-নৌকায় পার হইতে হইল। পার হইয়া পুনরায় চলা, যেন সে চলার শেষ নাই।

সন্ধ্যার সময় তাহারা দামোদরের তীরে আসিয়া পৌছিল। রাক্ষুসে দামোদর তখন কলকল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে দক্ষিণের পথে। খেয়া চলে সাবধানে। অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহারা খেয়া-নৌকায় পার হইল। পার হইতেই চাঁপা-ডাঙ্গা। চাঁপা-ডাঙ্গার একটা দোকানের রকে তাহাদের রাত্রি কাটিল।

পরদিন সকালে যাত্রা করিয়া দুপুরের দিকে আসিয়া পৌঁছাইল তারকেশ্বরে। তাহার বেশ মনে পড়ে যে, তারকেশ্বরে আসিয়া সে প্রথম রেল দেখে। এই রেল দেখার আনন্দ যে ইহার কতদিন পরেও সে কত রকম ভঙ্গী করিয়া, মুখে কত রকম শব্দ করিয়া কত লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াছে—তাহা আজও মনে পড়ে এবং পড়িলেই সে এখনও লজ্জিত হইয়া পড়ে। দুঃখও বোধ করে সে, কেননা যাহারা তাহাকে এই লজ্জা দিবে, তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই; তাহারা তাহার বাবা ও মা, অনেকদিন হইল মারা গিয়াছে।

তারকেশ্বর হইতেই তাহার বাবা তাহাদিগকে রতনপুরে লইয়া আসিয়াছিল। এখানে তাহার বাবার এক মামাতো ভাই থাকিত। সেও আজ বাঁচিয়া নাই। সংসারে শুধু, তাহার আপন বলিতে বাঁচিয়া আছে সেই বোনটা। কিন্তু সেও আট দশ বৎসর হইল কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল তাহা সে জানিত না, জানিয়াছে সম্প্রতি।

হাটের শেষে সেদিন নিরাপদ শেওড়াফুলি ষ্টেশনের রেল লাইন পার হইয়া নোনাডাঙ্গা বলিয়া যে পল্লীটি তার ভিতর দিয়া গরুর গাড়ী লইয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অভিমুখে আসিতেছিল। শীতের দিনের বেলা শেষ হইয়া সন্ধ্যা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া নামিতেছিল। নিরাপদ গরুর জাব্ দেওয়া বড় বড় চ্যাঙারী গুলাকে ঠিক পিছনেই রাখিয়াছিল। তাহার উপর ঠেস্ দিয়া জাপানী সূতার লতাপাতা আঁকা ময়লা চাদর খানাকে বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া মুখে দু'এক প্রকার শব্দ করিয়া গরু গুলাকে ঠিক ভাবে চলিতে নির্দ্দেশ দিতেছিল।

এই পল্লীটির ভিতর দিয়া যখনই নিরাপদ যাতায়াত করিয়াছে, তখনই কি একরকম উত্তেজনায় তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তারপর আবার উত্তেজনায় উত্তেজনায় ক্লান্ত হইয়া গিয়া সে ভাবিয়াছে, না ও সব ভাবা পাপ। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মানুষ ত আর

দেবত্ব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই তাই যখনই সে এপথ দিয়া যায়, যখনই পথের দু'দিকে দরজার সম্মুখে যাহাদের সে সাজ-সজ্জা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে, তাহাদের দিকে চাহিয়া তাহাদের হাবভাবগুলি নিরীক্ষণ করিতে তাহার ভালই লাগে।

রাস্তার পাশেই একটা চায়ের দোকান। ঘরটা মাটীর। সাম্‌নে বাঁশের মাচায় কতকগুলি কাপ ডিস সাজানো। তার নীচে বাঁশের মাচায় ঢাকা পথের নর্দ্দমা। সেই নর্দ্দমার উপর বাঁশের মাচায় দাঁড়াইয়া একটী তেইশ চব্বিশ বছরের মেয়ে বিড়ি টানিতেছিল অসঙ্কোচে। দূর হইতে নিরাপদ মেয়েটির সাজ-সজ্জার কায়দাটী লক্ষ্য করিতেছিল। মেয়েটীর রঙটীতো বেশ ফর্সা। ঠিক তাহার ভগিনী রাধার মত! একটু কাছে আসিতেই তাহার ধারণা আর ধারণা রহিল না। সে ভাবিয়াছিল ঐ মেয়েটী তাহার বোনের মত দেখিতে, কিন্তু সত্যিই তাহার বোন সেখানে দাঁড়াইয়া।

অনেকক্ষণ নিরাপদ রাধার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। দোকান ঘরের ভিতর হইতে একটা নির্লজ্জ হাসির ঢেউ ছুটিয়া গেল। কে একজন রাধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—রাধা তোর মনের মানুষ নাকি রে?

রাধা হাতের বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া জিব্ কাটিয়া দৌড়াইয়া আসিল গরুর গাড়ীর দিকে। হা, হা, করিয়া নিরাপদ থামাইয়া ফেলিল গাড়ী। রাধা গরুর গাড়ীর পাশে আসিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল, দাদাগো!

নিরাপদ কথা কহিতে পারিল না। ভগিনীকে সে যে এইভাবে দেখিবে, ইহা তাহার কল্পনারও অতীত। সে এইরূপ কল্পনাকে ইতিপূর্ব্বে কখনও যে মনে স্থান দেয় নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা যে এমন নির্ম্মম সত্য হইবে, একথা সে কোনদিনও ভাবে নাই। সে জানে, রাধার স্বামী অনন্ত তাহাকে অনেক নির্য্যাতন করে এবং সেই জন্যই

সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পালাইয়া গিয়াছে নিরুদ্দেশের পথে। তাহার পর যে মেয়ে বাঁচিয়া থাকে তাহাকে যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইতে হয়, তাহা অত স্পষ্টভাবে চিন্তা করা বা কল্পনা করার মত বুদ্ধি নিরাপদর নাই। নিরাপদ সাধারণ হইতেও সহজ এবং জগৎটাকে দেখে অত্যন্ত সোজা দৃষ্টিতে।

নিরাপদ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, তুই কি এখানে থাকিস ?

পোড়াকপালীর আর জায়গা কোথায় হবে বল, বলিয়া রাধা ঘাড় নীচু করিল।

নিরাপদ যেন কি অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহারই জন্য যেন তাহার সমস্ত কিছু ঘোলাইয়া গিয়াছে। কি বলিবে সে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। সে কহিল,—অনন্তর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

রাধা মুখ তুলিয়া কহিল, না।

রাস্তার মাঝে নিরাপদ গরুর গাড়ীর উপরে, আর রাধা নীচে দাঁড়াইয়া এমনি অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল। রাধা দেখিল পিছনে তাহার বান্ধবীর দল খুব হাসাহাসি করিতেছে। হয়ত তাহারা কত বিশ্রী ইঙ্গিত করিতেছে। কেহ বুঝিতেছে না যে এই লোকটা তাহার দাদা, সহোদর ভ্রাতা। রাধা বোধ হয় অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল। সে কহিল, এস না দাদা আমার বাড়ী।

যাব ? নিরাপদ প্রশ্ন করিল। যেন রাধার বাড়ীতে গেলে সে একটা মস্তবড় অপরাধ করিয়া বসিবে। সে অপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আর কাহার সাথে সে এখন পরামর্শ করিবে। বনমালী কাছে নাই। অতএব রাধাই হইতেছে এখন পরামর্শ দিবার একমাত্র মানুষ। তাই সে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

রাধা বহুদিন দাদাকে দেখে নাই। পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে এই দাদাই তাহাকে মানুষ করিয়াছে, বিবাহ দিয়াছে। দাদাকে সে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। এই দীর্ঘ দশ বৎসর যে সে কি করিয়া এই বোকা ও সরল মানুষটাকে ভুলিয়া ছিল, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হয়। তাই দাদাকে সম্মুখে পাইয়া মনটা তাহার হাহাকার করিয়া উঠিল। বিগত দিনগুলিতে দাদাকে যে সে ভুলিয়া ছিল, আজ সেই ভুলিয়া থাকার প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ যদি বা সে পাইয়াছে ইহাকে সে বিফলে যাইতে দিবে কেন? সে কহিল, দাদা সে সময়ে কেউ যদি এতটুকু জায়গা দিত আমাকে তাহলে কি আমায় এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে আসতে হত? কি করবে বল। আজ খাওয়া দাওয়া ক'রে তবে তোমার যাওয়া হবে। নাও চল—

নিরাপদর মনটা যাই যাই করিতেছিল। তাই সে আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়াই গাড়ীটাকে পথের একদিকে সরাইয়া রাখিয়া রাধাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

সে রাত্রি রাধা নিরাপদকে আসিতে দেয় নাই। নিরাপদ একবার মাত্র বাহিরে আসিয়া গরু দুইটাকে খুলিয়া তাহাদের গায়ে থলের জামা পরাইয়া দিয়া রাধার দুয়ারের এককোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহাকে রাধা লুচী মাংস রাঁধিয়া খাওয়াইয়া অনেক গল্প বলিয়াছিল। সে সব গল্প অধিকাংশই রাধার নিজের জীবন সম্বন্ধীয়। নিরাপদ সেই সকল গল্প হইতে রাধার জীবনের বহু কাহিনী এবং তাহার বর্ত্তমান জীবন ধারায় যে লোকটী উপস্থিত কর্ণধার—এ সকল বিষয় জানিতে পারে। লোকটার নাম অমরবাবু। অমরবাবু লোকটা বিপত্নীক এবং ছেলেপিলে নাই। দেশে কিছু জমি জায়গা আছে এবং এখানের রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকিট কালেক্টরের কাজ করে। কিছুদিন আগে অমরবাবু বালি ষ্টেশনে কাজ করিত। সেইখানেই

রাধার সহিত তাহার পরিচয়। তারপর বদলী হইয়া এখানে আসে। আজ পাঁচ বছর ধরিয়া অমরবাবু ও রাধা একত্র বসবাস করিতেছে।

ও কিন্তু লোক মন্দ নয় দাদা, রাধা এটুকুও বলিতে ভুলে না।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করিল, সে আসবে না ?

না, তার নাইট ডিউটী ! সেই সকালে আসবে।

রাধার নরম বিছানায় ক্লান্ত নিরাপদ ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন ভোরেই সে যাত্রা করে গ্রামের দিকে।

নিরাপদর যাহা আছে তাহা শুধু ওই। আর যাহা কিছু আছে তাহা হইতেছে জীবিকা সংস্থানের একটা অসম্ভব প্রয়াস। এই পৃথিবীর স্নেহ-ভরা বুক হইতে কেহ সরিয়া যাইতে পারে না, কোন রকমে দুঃখ কষ্ট সহিয়া যেক'টা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়, কাহিনী রচনা হয় তাহারই সংগ্রামময় মুহূর্ত্তগুলি দিয়া। কাল বৈষ্ণবাটীর হাট। অভয় সিংহীর কলার গাড়ী লইয়া তাহাকে ও বনমালীকে যাইতে হইবে। সারাদিন ধরিয়া বিক্রয় করিয়া তাহাদের ফিরিতে হইবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে। আর খানিক পরেই হয়ত বনমালী আসিয়া তাহাকে ডাকিবে। অথচ সে একটুখানিও ঘুমাইতে পারিতেছে না। * * * *

সারারাত্রি ছট্‌ফট করিয়া নিরাপদ শেষ রাত্রের দিকে একটু ঘুমায়। বনমালী আসিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে, নিরাপদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ব্যস্ত হইয়া সে উঠিয়া বসে। দরজা না খুলিয়াই সে বলিয়া উঠে,—কে, বনমালী নাকি ?

হাঁ-হাঁ দু'টো বেজে গেছে, বাহির হইতে বনমালী বলে।

নিরাপদ বালিশের নীচ হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া

কেরোসিনের ডিবাটী জ্বালায়। তারপর ঘরের দরজা খুলিয়া বনমালীকে বলে, আয় বনমালী ঘরে আয়।

বনমালী দাওয়ার ওপরে আসিয়া বলে, হ্যাঁরে রাতে এলিনি আমাদের ওখানে?

নিরাপদ রাতে কোথায় ছিল? হুঁ, না, করিয়া, গোঁজামিল দিয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইবার জন্য নিরাপদ বলে, যাত্রা শুনে এসেই শুয়ে পড়্‌লুম্।

বনমালী বলে, তা' এখনও ঘুমুচ্ছিস্। নে' তাড়াতাড়ি, রায়েদের বর্ম্মণদের সব গাড়ী চলে গেল—

এই যে আমি আস্‌ছি। একটু বোস্‌না ভাই, বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার ঘরের উঠান হইতেই অভয় সিংহীর কলাবাগান আরম্ভ হইয়াছে। এই কলাবাগানে পাহারা দিবার জন্যই তাহার ঘরটী বছর দশেক পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। সেই হইতেই নিরাপদ এখানে আছে। উঠানের বাঁদিকে কলাবাগানের ভিতরে যাইবার পায়ে-চলা একটী সরু পথ আছে। নিরাপদ সেই পথ দিয়া সোজা চলিয়া যায়। বেড়ার একস্থানে রাংচিতার গাছগুলি খুব ঘন, দূর হইতে একটা ঝোপের মত দেখায়। নিরাপদ সেইখানে আসিয়া থলেয় জড়ানো কি একটা বোঝা কাঁধে তুলিয়া লইয়া তাহার ঘরের দিকে আসিতে থাকে।

দাওয়ার উপরে সেটাকে ফেলিয়া রাখিয়া সে ঘরের ভিতরে যায়। বনমালী বলে, হল?

নিরাপদ তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া গলার স্বর নীচু করিয়া বলে, আরে ভাই। কাল সকালে এককাঁদি মর্ত্তমান রাঙ্-চিত্তিরের বনে লুকিয়ে রেখেছিলুম, কি জানি কর্ত্তা যদি এসে যায়। সেইটা নিয়ে এলুম।

ও, বলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে বনমালী। কেন সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য বনমালীর কৌতূহল হয় না, কারণ সে জানে এ কাঁদি কোথায় যাইবে। বনমালী জিজ্ঞাসা না করুক কিন্তু নিরাপদর না বলিলে ত চলে না। সংসারে এমন অনেক মানুষ আছে যাহারা গোপনে অপরের জন্য ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার করে, সে কথা তাহাদের কেহ জানিতে পারে না কিন্তু কেহ জানিতে পারে না বলিয়া যে গোপনে পরোপকারী ব্যক্তিটী তাহার নিজের কথা কাহাকেও বলে না তাহা নহে বরং তাহাদের গোপন করিবার ফলে আত্মপ্রচার বেশীই হয় এবং এইজন্যই সংসারে একটী কথার সৃষ্টি হইয়াছে যে অমুক পরোপকারী ব্যক্তি বটে, কাক-কোকিলেও ওর দানের কথা জানিতে পারে না। এই যে গুপ্ত ও নিখাদ সুনাম, ইহার জন্য নিরাপদর কোনই ঔৎসুক্য নাই; সে শুধু চায়, সে যাহা করিবে বনমালী তাহা জানিবে কারণ বনমালী পর হইলেও তাহার আপন, সুখদুঃখের একান্ত অংশীদার—সে শুধু বন্ধুতা-সূত্রেই। সে জানে তাহার ভগিনী পতিতা। ভগিনী পতিতা হইলেও সে যে ভগিনী এই কথাটা সে আদৌ ভুলিতে পারে না এবং তাহার এই বলিবার আকাঙ্ক্ষা শুধু এই জন্যই যে সে যেমন তাহার ভগিনীকে ভালবাসে, বনমালীও যেন সেইরূপ ভালবাসে। তাহার ভগিনী পতিতা হইলেও সময়ে-অসময়ে নিরাপদ বনমালীকে রাধা-সম্বন্ধীয় কথা বলিয়া যায়। সে গলার স্বর তেমনি নীচু করিয়াই বলে, দেখ্‌লুম রাধাটা এমন পুরুষ্টু সরেস জিনিষ কখনো খেতে পায়না তাই কাল কেটে রাখলুম। ভাবলুম যখন যাব নিয়ে যাব।

তা' বেশ করিচিস্, বলিয়া বনমালী বাহির হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। নিরাপদ ফতুয়াটা গায়ে লাগাইয়া বলে, আর ভাই

পাঁচটা নয়, সাতটা নয় একটা বোন তাকে ত আর ফেলে দিতে পারিনা, হলেই বা নষ্ট ? এক মায়ের পেটের ত ? এবার সে স্বাভাবিক গলাতেই বলে।

বনমালী সমর্থনের স্বরে বলে, নিশ্চয়ই।

অত্যধিকভাবে উৎসাহিত হইয়া নিরাপদ আলোটা লইয়া বাহিরে আসে। দরজায় তালা লাগাইয়া আলোটা নিভাইয়া দেয়। তারপর থলেয় জড়ানো মর্ত্তমান কলার কাঁধিটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া দুই জনে চলিতে থাকে। পাশেই বনমালীর বাড়ী। সেই বাড়ীর পাশেই আবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেটে-পথ। পথের উপর দু'খানা কলা বোঝাই করা গাড়ী দাঁড়করানো ছিল। গাড়ী দুটার নীচে দুইটা হারিকেন জ্বলিতেছিল টিম্‌টিম্ করিয়া। বনমালী নিরাপদের ঘরে যাইবার আগে গোয়াল হইতে গরু আনিয়া গাড়ীতে জুড়িয়া সব ঠিকঠাক্ ভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। নিরাপদ তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠে, তুই যে সব ঠিক ক'রে রেখে গেচিস্ বনমালী ?

তবে না, বলিয়া তড়াক্ করিয়া একটা লাফ দিয়া বনমালী পিছনের গাড়ীখানার উপর উঠিয়া পড়ে। নিরাপদকে বলে, দে নীরো কাঁধিটা এর ওপর রাখি। সে কাঁধি লইয়া গাড়ীর দিকে আগাইয়া যায়। তাহার কাঁধ হইতে বনমালী তুলিয়া লইয়া গাড়ীর কলার কাঁধির গাদার মধ্যে রাখিয়া দেয়। তারপর বলে, তুই এগাড়ীতে থাক্ আমি সামনের গাড়ীতে যাই।

যা, বলিয়া নিরাপদ বনমালী নামিলে গাড়ীতে উঠিয়া পড়ে। তারপর বনমালীও সম্মুখের গাড়ীটায় উঠিয়া যায় এবং গাড়ী ছাড়িয়া দেয়। ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিয়া মন্থর গতিতে গরুর গাড়ীর চাকা পাড়াগাঁয়ের উঁচু নীচু পথে কেবলই গড়াইতে থাকে। উপরে থাকে নক্ষত্রভরা রাত্রির আকাশ, সম্মুখে বিশাল অন্ধকার। সেই সুবিস্তৃত

অন্ধকারের মায়া গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের চোখে আনিয়া দেয় তন্দ্রার রেশ।

রতনপুর হইতে বৈদ্যবাটীর হাট প্রায় নয় দশ মাইলের পথ। সকালেই সুরু হইবে হাট, অতএব সময় থাকিতে সেখানে পৌছিতে হইবে। একসময়ে তাহারা শেওড়াফুলি তারকেশ্বর রোডে আসিয়া পড়ে। পিছনে পড়িয়া থাকে সিঙ্গুর ষ্টেশন। রাস্তাটা পাকা। পথের পাথরে আর গরুর গাড়ীব চাকার লৌহাংশটীতে হয় ঘর্ষণ, কর্কশ-শব্দে গাড়োয়ানদের ভাঙ্গিয়া যায় ঘুম।

রেল লাইন পার হইলেই অনেকখানি পথ একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে বনমালী দেখিতে পায় কাহাদের গাড়ীর লণ্ঠনের আলো। নিরাপদকে বলে, কাদের গাড়ী বল্‌ত ওটা নীরো?

নিরাপদ ডানদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলে, বেরাদের বোধ করি!

দাঁড়া হেঁকে দেখি, বলিয়া বনমালী হাঁকে, কারা যায়গো আগে-এ-এ-এ?

দূর হইতে ভাসিয়া আসে, ব-র্‌-ম-ণ-রা-গো-ও-ও!

নিরাপদ শুনিতে পায়। তবু বনমালী বলে; বেরাদের নয়রে নীরো। ও কালি সামন্ত যাচ্ছে।

হাঁ, বলিয়া নিরাপদ এবার কলার কাঁধির গায়ে হেলান দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করে। পথ চেনা এবং সোজা, গরুগুলা ঠিক যাইতে পারিবে। এখন একটু ঘুমাইয়া না লইলে সারাদিনে আর সে একটুও ঘুমাইতে পাইবে না।

খানিকদূর আগাইয়া যায়। অনেক পিছন হইতে দূরাগত গাড়ীর শব্দ ভাসিয়া আসে। বনমালী বলে, গ্যাখ্‌ত নীরো কারা আসে?

নিরাপদ অনেক আগেই ঘুমাইয়া গিয়াছে। সে সাড়া দেয় না। বনমালী জোরে জোরে ডাকে, নীরো ও নীরো ?

নিরাপদ এবার চমকাইয়া উঠে। বলে, কি ?

ছ্যাখ্ না পিছনে কারা আসে, বলিয়া বনমালী উত্তরের আশায় ব্যগ্র হইয়া উঠে।

কোথায় কে, বলিয়া নিরাপদ আবার বেশ জুৎ করিয়া মাথাটি রাখিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করে। বনমালী বলে, কিরে কি হল ?

নিরাপদ নীরব। বনমালী বলে, ছ্যাখ্ না ছ্যাখ্ না—ঘুমুলি বুঝি ? ও নীরো ?

নিরাপদ অসোয়াস্তি বোধ করে। বলে, কি বাপু তুই বকাস্ ? তারপর উঠিয়া পাশের দিকে ঝুঁকিয়া পশ্চাৎদিকে তাকাইয়া দেখে একখানা গাড়ী আসিতেছে। বলে, গাড়ী ত আস্চে একখানা !

বনমালী বলে, হ্যাঁ তাই তো বল্ছি আমি। শুধোনা কাদের গাড়ী।

নিরাপদ বলে, বর্ম্মণ-টর্ম্মণদের হবে।

তোর মাথা, বিরক্তিভরে বনমালী বলিয়া উঠে, বর্ম্মণদের তো আগে গেল ! শুধোনা একবার—

নিরাপদ অগত্যা হাঁকে, কারা আসে গো-ও-ও···

গাড়োয়ান হয়ত ঘুমাইয়া থাকে। সাড়া মেলে না। নিরাপদ কিছু বলিবার আগেই বনমালী বলে, ডাক্-ডাক্।

ঘুম যখন চটিয়া গিয়াছে তখন চীৎকার করিয়া আর কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। নিরাপদ আবার হাঁকে। এবার হাঁকটা একটু জোরেই হইয়াছিল। তাই পিছন হইতে উত্তর পাইতে বিলম্ব হইল না। উত্তর আসিল, আমরা গো-ও-ও

তোমরা কারা গো-ও-ও, সঠিক ভাবে জানিবার জন্য নিরাপদ পুনরায় হাঁকে। এবার উত্তর আসে, ম-ল্-লি-ক-রা-গো-ও-ও···

বনমালী শুনিতে পায়। সে বলে, ওতো পাঁচু নিয়ে আস্‌ছে তা'হলে। বেরাদের গাড়ী, রায়েদের গাড়ী, সব কোথা গেল বল্‌দিকি ?

আগে গেছে বোধ হয়, বলিয়া নিরাপদ আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করে। পিছনে তাহা হইলে আসিতেছে সুশীলার বাবা! সুশীলাকে মনে পড়িয়া যায় নিরাপদের।

এমনি করিয়া হাটের আগের রাত্রে সারি সারি কলার গাড়ী চলে। এক শত দুই শত কি আরো কিছু গজ দূরে দূরে কিম্বা কাছে কাছে গরুর গাড়ী চলিতে থাকে। তাহাদের আলোগুলা অন্ধকার রাত্রির বুকে যেন জোনাকির মিছিল। সে মিছিলের শেষ নাই। কোন কোন গাড়ীর গরুদের গলায় বাঁধা থাকে ছোট ছোট ঘণ্টা। টিং টিং করিয়া সেগুলা বাজিতে থাকে। আগে চলে বর্ম্মণদের গাড়ী, মাঝে সিংহীদের, পিছনে আসে মল্লিকরা। বেরাদের গাড়ী আর রায়েদের গাড়ী হয়ত আগাইয়াই যায় নয়ত যায় পিছনে। কলার গাড়ীর শেষ নাই। বদ্দিবাটীর হাট কলার জন্যই বিখ্যাত।

কিন্তু এই বিখ্যাত হাটে গাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বিখ্যাত বর্ম্মণরা, সিংহীরা, মল্লিকরা বা বেরারা কিম্বা রায়েরা কাহারাও যায় না। বর্ম্মণ-দের হইয়া যায় আগের গাড়ীতে যে কালি সামন্ত গিয়াছে সে, সিংহীদের হইয়া যায় বনমালী ও নিরাপদ, মল্লিকদের হইয়া পাঁচু আর বেরাদের ঠিক নাই—কোনদিন গোপালও যায় আবার কোনদিন বিপিনও যায়, রায়েদের হইয়া যায় শশী। ইহারা অখ্যাত অজ্ঞাত ভূমিহীন কৃষক। জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্য ঐ সব বড় বড় উপাধিধারী, যে সব উপাধি শুনিলেই লোকগুলাকে বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের কলা-বাগানে ইহারা কাজ করে, পাহারা দেয়, এবং হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসে।

কলার কাজ চলে বারোমাস। তাই বারোমাসই এম্‌নি করিয়া হাটের আগের রাতে তাহাদিগকে যাইতে হয়। সপ্তাহে দু'দিন। মঙ্গল ও শনি দু'দিন হাট। খাটুনি পড়ে কিন্তু সপ্তাহে চার দিন। মঙ্গলবারের হাটের আগে সোমবার আর শনিবারের হাটের আগে শুক্রবার কলার কাঁধি কাটিয়া বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া গাড়ীতে বোঝাই করিতে হয়, রাত্রিটা যায় হাটে আসিতে, হাটে সারাদিন ধরিয়া করিতে হয় বিক্রয়। আবার গাড়ী করিয়া ফিরিতে হয় মাঝরাতে। গ্রীষ্ম নাই বর্ষা নাই, ঝড়বৃষ্টি নাই তাহাদিগকে একাজ করিতেই হইবে। তাহা না হইলে এই পৃথিবীতে তাহাদের টিকিয়া থাকা অসম্ভব। ইহাই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের একটি মাত্র পথ।

কখন ধীরে ধীরে অন্ধকারকে সরাইয়া দিয়া দেবতা সৃষ্টি করেন আলোর। চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে আলোর দীপ্তি। গরুর গাড়ীর মিছিল আসিয়া পড়ে শহরে। গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড দিয়া চলিতে থাকে শেওড়াফুলি ষ্টেশনের দিকে। কারণ সেই দিকেই হাট। যদিও লোকে হাটটাকে বৈদ্যবাটীর হাট বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বৈদ্যবাটীতে নয়। শেওড়াফুলিতেই এই হাট বসে। এরূপ বিখ্যাত হাট এ অঞ্চলে আর নাই। সব রকম জিনিষই এখানে পাওয়া যায়। পশ্চিম-বঙ্গের অনেক জায়গা হইতেই জলপথে এবং স্থলপথে বহু ব্যবসায়ীই হাটের দিন আসিয়া জোটে এবং কেনাবেচা করিয়া দিনান্তে গৃহাভিমুখে রওনা হয়। সুতরাং ভিড় কি রকম হয় সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ শনিবারের হাটগুলা একটা দেখিবার ব্যাপার। মারামারি, হাঁকাহাঁকি, ছুটাছুটি, খুনাখুনিতে হাটের দৃশ্য এক ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। শনিবার চটকলের ছুটী থাকে। চটকলের সর্দ্দারেরা ঐ দিনটা কিছু জিনিষপত্র সস্তায় খরিদ করিয়া লয়। পরদিন রবিবার পায়, কলবাজারে বেশ দরে বেচিয়া ছুটীর দিনেও কিছু কামাইয়া লয়।

আজ শনিবারের হাট। শনিবারের হাটের একটা সুবিধা এই যে তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র বিকাইয়া যায়। এই আশাতেই উৎসাহিত হইয়া সকলে আনন্দ করিতে করিতে চলে। তারকেশ্বর লাইনের উপর দিয়া মেন লাইনের লেব্‌ল্‌-ক্রসিং পার হইয়া আলুহাটের ভিতর দিয়া, বাঁহাতি যে রাস্তাটী কলাহাটের দিকে চলিয়া গিয়াছে, বনমালী ও নিরাপদ সেই পথে যায়। গাড়ী হইতে তাহারা নামিয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর সাম্‌নে সাম্‌নে তাহারা ভিড় ঠেলিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আসিতে থাকে। নিরাপদর মনে পড়িয়া যায় মর্ত্তমান কলার কাঁধিটার কথা। তাডাতাড়ি সেটাকে নামাইয়া পাশের একটা আড়তে তাহার পরিচিত সরকার মশাইয়ের জিম্মায় একটা তক্তপোষের নীচে রাখিয়া দিয়া যায়। হাট ফুরাইলে লইয়া যাইবে। সরকার মহাশয় অমায়িক লোক। জাহানাবাদে বাড়ী বলিয়া নিরাপদর সহিত তাঁহার আলাপ জমিয়াছে ভাল। স্বদেশের মানুষ বড়ই প্রিয় মানুষের। তিনি হাসিয়া বলেন, খাওয়াবে ত ?

নিরাপদ আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে। সরকার মহাশয় বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ দিন একদিন আস্‌বেই।

আপনাদের আশীর্ব্বাদে, বলিয়া নিরাপদ বাহির হইয়া যায়। গাড়ীটাকে যথাস্থানে পৌছাইয়া লইয়া নিরাপদ দেখে উত্তরপাড়া হইতে সিংহ মহাশয়ের ছেলে নিরঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে বনমালীর সাথে কথা বলিতেছে। নিরাপদ তাহার দিকে আগাইয়া গিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া যুক্তকরে প্রণাম করে। নিরঞ্জনও নমস্কার করিয়া বলে, কিরে কেমন আছিস্ ?

আর বাবু গেলেই হয়, বলিয়া বনমালীর দিকে সে তাকায়। নিরঞ্জন বলে, সে কিরে! কিন্তু তাহার কথা বড়ই আন্তরিকতাশূন্য। পরক্ষণেই সে বলিয়া উঠে, হ্যাঁরে নিরাপদ আজ বিক্রী হবে ত সব ?

হেঁ আজত শনিবারের হাট, নিরাপদ বলে। নিরঞ্জন বনমালীর দিকে তাকায়। বনমালী বলে, তা হবে বৈ কি বাবু। আজকের দরটা জানি আগে। তারপর বনমালী বর্ম্মণদের কালি সামন্তকে জিজ্ঞাসা করে, কিগো কালি দর কি আজ ?

কালি একটা কলার কাঁধির উপর পা তুলিয়া দিয়া বলে, ঐ তুটোর দর।

পঞ্চাশ, জিজ্ঞাসা করে বনমালী।

কালি উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

বনমালী নিরঞ্জনের দিকে তাকাইয়া বলে, আজ দরটাও ভাল আছে।

হ্যাঁ দেখছি ত তাই, বলিয়া নিরঞ্জন একদিকে একটু জায়গা করিয়া বসিয়া পড়ে।

বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে বনমালী ও নিরাপদর তুইটা গাড়ীর একশতটী কলার কাঁধি পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় হইয়া যায়। নিরঞ্জন টাকাগুলি লইয়া মণিব্যাগ হইতে তুইটী সিকি বাহির করিয়া তুইজনের হাতে দিয়া চলিয়া যায়। যাইবার সময় বলে, আস্‌চে হাটে এইরকম নিয়ে আসা চাই।

বনমালী ও নিরাপদ ঘাড় নাড়ে। কথা কহিবার মত শক্তি তাহাদের নাই। নিরাপদ বলে, বাবু নিজে এলে তবু আটগণ্ডা পয়সা দেয়।

বনমালী বলে, এ হাড়চশম্‌খোর।

তারপর গাড়ীর একদিক হইতে চাঙারীভরা কুঁচানো-খোড় ও খইলের গুঁড়া নামাইয়া আনিয়া, তাহাতে জল ঢালিয়া, গরুগুলাকে খাইতে দিয়া তাহারা স্নানের আয়োজন করে। শিশি হইতে তেল ঢালিয়া, মাখিয়া হাট পার হইয়া গঙ্গার ঘাটে নৌকার ভিড়ের একপাশে

কোন মতে স্নানটা সারিয়া লইয়া দুইজনে হোটেলের দিকে যাইতে থাকে।

নিরাপদ কি একটা কথা বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারে না। একবার জোর করিয়াই বলিয়া ফেলে, বনমালী চ' না রাধার বাড়ীতে যাই যত্ন করে খাওয়াবে।

বনমালী বলে, না।

নিরাপদ তাহার কণ্ঠস্বরে কোনরকম জটিলতার কিছু আভাস পায় নাই। সে পুনরায় বলে, চল্‌না—যেতে দোষ আছে ?

দোষ কি, বনমালী বলে।

তবে, বলিয়া নিরাপদ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

বনমালী কি ভাবে। তারপর বলে, কি জানিস্ নীরো—আমরা যদি যাই তাহ'লে সে হয়ত মুস্কিলে পড়্‌বে।

নিরাপদর নিকট এ সকল দুর্ব্বোধ্য কথা। বনমালী বলে, জীবনে সে যে অন্যায় করে ফেলেচে সেইটাই আবার তার নতুন করে মনে পড়ে যাবে। তার কষ্ট—

আরও সে কি বলিতে যায় কিন্তু কি ভাবিয়া চুপ করিয়াই থাকে। বাস্তবিক বনমালী ঠিক বলিয়াছে। নিরাপদ এ কথাটা ত কোনদিন ভাবিয়া দেখে নাই। একজন জীবনে যদি অন্যায় করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে বার বার সেই কথাটী স্মরণ করাইয়া দেওয়া মানুষের কাজ নয়। এই প্রসঙ্গে তাহার বাগ্দী পাড়ার দুর্গার মার কথা মনে পড়িয়া যায়। সবাই জানে সে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক। কিন্তু অঘোর সাউ তাহাকে বলে যা যা মাগী, তোর বয়েস কাট্‌ল পর পুরুষের সাথে তুই আবার বিধেন দিবি ? ব্যাপারটার কিছুই জানিত না নিরাপদ। যদিও পরে সে শুনিয়াছিল, বাবুদের পুকুরে দুর্গার মা যখন কাপড় কাচিতেছিল তখন অঘোর সাউ ঘাটে বসিয়া বসিয়া তাহার দিকে

তাকাইতেছিল ও ছোট ছোট মাটির ঢেলা ছুঁড়িয়া তাহার পিছনের জলে ফেলিতেছিল। এই দেখিয়া দুর্গার মা চটিয়া যায় এবং অঘোর সাউকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দেয়। তাহারই ফলে অঘোর সাউ দেয় পাল্টা জবাব। কিন্তু অপরাধ যাহার হউক, অঘোর সাউয়ের কথা যতই সত্য হউক, নিরাপদর কেন কি জানি মনটা দুর্গার মার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহার কারণ অবশ্য এ নয় যে অঘোরের সহিত তাহার ঝগড়া ছিল, অঘোর তাহার খুবই বন্ধু। তাহা ছাড়া ইহা অপরের প্রতি বিদ্বেষসঞ্জাত নয়—এই মন ঝুঁকিয়া পড়া যে দরদ বা সহানুভূতি, ইহা ব্যথিতের প্রতি সহজ সমবেদনা। এই সমবেদনাই তাহার অন্তরের কোন নিভৃতস্থল হইতে আজ বনমালীর কথার টানে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাই সে কথাটা চিন্তা করিতে করিতে বনমালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হয়। হোটেলের ভিতর দরজার পাশে বসিয়া থাকে সুভদ্রা। সুভদ্রাকে দেখিতে বেশ। পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া থাকে সে, পরণে একখানা চওড়া কালাপাড় শাড়ী, গায়ে সিল্কের ব্লাউজ, দেখিলে তরুণী বলিয়াই মনে হয় কিন্তু সে সাজসজ্জার কায়দায়। বয়স তাহার প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। বসিয়া বসিয়া হোটেলের চেনা ভোজনকারীদের সহিত হাসিয়া হাসিয়া আলাপ করে আর বলে, অন্নপূর্ণা ভোজনালয়ের মত কাহাকেও সস্তায় দিতে হইবে না।

ভোজনকারীর দল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, তা' বটে।

বনমালী বরাবরই এই অন্নপূর্ণা ভোজনালয়ে আহার করে। সুভদ্রাকে দেখিয়াছেও বহুবার কিন্তু কেন যে তাহাকে দেখিলেই ভয় করে তাহা বনমালী ভাবিয়া পায় না, অবশ্য সে ভয়ের মূলে যে আছে একটা ভীষণ সন্দেহ, তাহা সে বুঝিতে পারে। তাহার বিশ্বাস সুভদ্রা সাজিয়া

গুজিয়া ভোজনালয়ের দ্বারদেশে বসিয়া থাকে শুধু খরিদ্দার ডাকিবার জন্যই নহে, তাহার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে।

বনমালী ও নিরাপদকে দেখিয়াই সুভদ্রা বলিয়া উঠে, এই যে এদিকে ঠাঁই খালি আছে। সুভদ্রার মধুর কণ্ঠস্বর বনমালীকে আকর্ষণ করে। দুইটী খালি আসনে গিয়া তাহারা বসিলে সুভদ্রা একবার বনমালীর দিকে তাকায়। বনমালীও তাহার দিকে তাকায়। সুভদ্রা কণ্ঠস্বরে আরও অনেকখানি মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়া বলে, কি ব্যাপারি আজ বিক্রী কেমন হ'ল ?

বনমালী বলে, ঐ অমনিই আর কি।

আর যে দিনকাল পড়েছে ব্যাপারি, সহানুভূতির স্বরে সুভদ্রা বলে। বনমালী বলে, আর কথায় কাজ কি।

তারপর নিরাপদর দিকে তাকাইয়া সুভদ্রা বলে, তুমি ব্যাপারি ত একদিনও ভাল করে কথা বললে না। মেয়ে মানুষ বলে কি আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই করে যাবে ?

বড় জবর কথা। নিরাপদ বেচারা একেই কেমন একটু লাজুক প্রকৃতির। তারপর সুভদ্রার এই কথা তাহাকে আরও লজ্জা দিল। সে তাকায় বনমালীর দিকে। বনমালীই উত্তর দেয় তাহার হইয়া, ও এমনিই বড় কম কথা কয়।

ও, বলিয়া সুভদ্রা হাঁকে, ঠাকুর এখানে দু'টো ভাত, ডাল আর মাছের ঝোল দিয়ে যাও,—রান্না ঘরের খুন্তী নাড়ার শব্দ ভেদ করিয়া একটা আওয়াজ আসে, দিই।

পরক্ষণেই ভাত ডাল প্রভৃতি আসিয়া পড়ে। তাহারা খাইতে সুরু করিয়া দেয়। কে কি খায় না খায় আজ পাঁচ বছর ধরিয়া সুভদ্রা তাহা জানিয়া গিয়াছে। তবু সে এই পাঁচ বছরেরই অভ্যাসমত একবার করিয়া জিজ্ঞাসা করে, আর কিছু নেবে ব্যাপারি ?

যাহার দরকার হয় সে নেয়। বনমালী ঘাড় নাড়িয়া জানায়—না। নিরাপদর ত কথাই নাই। সুভদ্রার গণ্তিতে সে পড়েনা তবু আজ যেন সে একটু অকারণ প্রীতি দেখায় তাহাকে। জিজ্ঞাসা করে, কি গো ভুঁয়ের পো কিছু দোব ?

নিরাপদ ঘাড় নাড়ে। সুভদ্রা বলে, জোয়ান মানুষ না খেলে শরীর থাকবে কেন ?

নিরাপদর মুখ চোখ লাল হইয়া উঠে। বনমালী উঠিয়া যায় দেখিয়া সেও উঠিয়া পড়ে। বাহিরে বড় বড় পেট্রোলের পিপায় জল থাকে। তাহারা হাত মুখ ধোয়।

সুভদ্রা পান হাতে করিয়া আগাইয়া আসে। সাধারণতঃ একটা করিয়া পান দেওয়া অন্নপূর্ণা ভোজনালয়ের নিয়ম কিন্তু সুভদ্রা সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের দুইটা করিয়া পান দেয়। বনমালীর হাতেই চারিটা পান দিয়া সুভদ্রা একটু মুচকাইয়া হাসিয়া বলে ব্যাপারি চলে যেওনা তোমার সাথে কথা আছে।

বনমালী দুইটা পান নিরাপদর হাতে দিয়া বলে, নীরু দাঁড়া একটু, দিদি কি বলে শুনে যাই।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, দেরী হবে নাকি ?

এবার সুভদ্রা বলে, ব্যাপারির কি দরকার আছে নাকি ?

হ্যাঁ,-ঘাড় নাড়িয়া নিরাপদ জানায়।

সুভদ্রা বনমালীর দিকে তাকায়। বনমালী বলে, তার চেয়ে এক কাজ করনা নীরু, তুই ততক্ষণ ঘুরে আয়। আমি কথা বলে গিয়ে গাড়ী দু'টো ঠিক ক'রে রাখ্ব'খন।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, কোন দিক দিয়ে যাওয়া হবে ?

কেন রোজ যেমন যাই, ঐ নিমাই-তীর্থের ঘাটের ফটক দিয়ে, বলিয়া বনমালী সুভদ্রার দিকে তাকায়। নিরাপদ কোঁচার খুঁট হইতে

নিরঞ্জনের দেয়া সিকিটা বাহির করিয়া বনমালীর হাতে দেয়। বনমালী দেয় সুভদ্রার হাতে। সুভদ্রা একটা দুয়ানি আনিয়া দেয়। নিরাপদ হাত বাড়াইয়া লইয়া চলিয়া যায় বাহিরে।

* * * *

বৈশাখের মধ্যাহ্ন।

সারা আকাশ খাঁ খাঁ করিতেছে। কোথাও এতটুকু মায়ামমতা নাই—রুক্ষ কর্কশ। পৃথিবীর বুক হইতে সমস্ত স্নিগ্ধতাটুকু শুষিয়া লইবার জন্য সে-আকাশের দানবীয় প্রয়াস দেখিয়া ভীত হইবার কথা; কিন্তু গরুর গাড়ী চলার বিরাম নাই। মধ্যাহ্নের রৌদ্রতাপ উপেক্ষা করিয়া পথের ধূলাকে আকাশে উড়াইয়া দিয়া গরুর গাড়ীর মিছিল ছুটিয়াছে ত ছুটিয়াছেই। নির্ম্মেঘ আকাশের বুকে কোথায় উধাও হইয়া যাইতেছে চিলের দল। দূর প্রান্তরের কোন বনশীর্ষ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে ঘুঘুর ডাক। মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে ছোট ছোট গ্রাম।

আজ আগে চলিয়াছে রায়েদের গাড়ী, তার পিছনে মল্লিকদের। মল্লিকদের পিছনে বর্ম্মণদের, তারপর বেরাদের, বেরাদের পিছনে বনমালী, বনমালীর পিছনে নিরাপদ, নিরাপদের পরে বেণীহালদারের পাটের গাড়ী। আরও কত গাড়ী চলিয়াছে আগে ও পিছে। গাড়ীতে গাড়ীতে চীৎকার করিয়া চলে কথা। চীৎকার, গাড়ী ও পথের সজ্ঘর্ষরব কলার ব্যাপারিদের গৃহাভিমুখী পথটাকে তোলে মুখরিত করিয়া।

বনমালী নিরাপদর সম্মুখের গাড়ীতে ছিল বলিয়া পিছন ফিরিয়া সে নিরাপদর দিকে মুখ করিয়া গল্প করিতে করিতে যায়। গরু ঠিকই যাইবে। যখন লাইনবন্দী গাড়ী চলিতেছে তখন কোন ভাবনা নাই। নিরাপদ বিড়ি টানিতে টানিতে বলে, তুই গেলিনা ব'লে রাধি কত দুঃখ করলে। বললে তোকে একদিন নিয়ে যেতে।

ও, বলিয়া বনমালী বলে, কিন্তু সুভদ্রা রাধার কথা শুধোচ্ছিল কেন বল্ দিকি ?

কি জানি, বলিয়া নিরাপদ চাহিয়া থাকে বনমালীর দিকে। বনমালী বলে, সুভদ্রা কিন্তু লোক ভাল নয়।

কি রকম, নিরাপদ প্রশ্ন করে। বনমালী বলে, ও অন্নপূন্নো হোটেলে থাকে শুধু খদ্দের ডাক্‌বার জন্যেই নয়, আরও ব্যাপার আছে।

ব্যাপারের কথা শুনিয়া নিরাপদ কৌতূহলী হইয়া উঠে; বনমালী বলে, বড় বড় ব্যাপারিদের সর্ব্বনাশ করে বেড়ায় মাগী। ঐ যে অন্নপূন্নো ভোজনালয়ের পরেশ ঠাকুর, ওকে দিয়ে কম টাকাটা বাগিয়ে নেছে সে ?

পরেশ ঠাকুরের টাকা বাগাইয়া লওয়ার কাহিনীই বনমালী বলিতে থাকে। বছর তিনেক পূর্ব্বে মধুসূদন বলিয়া একজন লোক হালদারদের পাটের গাড়ী লইয়া যাইত। একদিন সে পাট বিক্রয় করে একশো' তেইশ টাকার। পরেশ ঠাকুর কি করিয়া সে সন্ধানটুকু জানিয়া লয়। তারপর সে অন্নপূন্নো ভোজনালয়ে খাইতে আসিলে সুভদ্রা তাহার দিকে এক প্রকারের কটাক্ষ করিয়া বলে, কিগো ব্যাপারি আজ খাওয়াবে ত ?

মধুসূদন হাসিয়া বলে, পয়সা কোথা পাব দিদি ?

আর ব্যাপারি, কণ্ঠে যেন অনেকখানি রস ঢালিয়া সুভদ্রা বলে, পাট বেচেচো মেলাই টাকার তবু বল পয়সা কোথায় পাব ? তারপর সে হাসে।

মধুসূদন বলে, ওযে মুনিবের টাকা।

মুনিবের টাকা আমি চাইব কেন ভাই, গম্ভীর হইয়া সুভদ্রা বলে, তোমার ত একটা মজুরী আছে ?

তা' আছে বৈ কি, মধুসূদন ঘাড় নাড়িয়া বলে।

সুভদ্রা বলে, আমি ত, তারই কথা বল্‌ছি।

সে একদিন হবে, বলিয়া মধুসূদন খাইতে বসে। সুভদ্রা তাহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলে, আর দাদা আজ আছি কাল নেই। তা' ছাড়া বড় মুখ করে আজ বল্‌ছি তোমায়।

কি করি দিদি, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে মধুসূদন বলে।

মানুষকে স্বমতে আনিতে সুভদ্রা জানে। সে একটু হাসে। তারপর বলে, তোমরা মানী-গুণীলোক তোমরা যদি একথা বল তাহ'লে আমরা যাই কোথা?

এই প্রকার আরও প্রশংসাত্মক কথা সুভদ্রা বলিয়া যায়। এক সময়ে ইহা যথাস্থানে গিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। মধুসূদনের খাওয়া হইয়া গেলে সুভদ্রা বলে, চলনা দাদা আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবে। গরীবগুর্ব্বো লোক ব'লে তোমরা ত কেউ গেলে না। কেবল মুখেই ভালবাসা দেখাও?

এতবড় অভিযোগ মধুসূদনের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। সে এই সময়ের মধ্যে অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছিল। সুভদ্রা বুঝিতে পারিয়া তাহার তূণের শেষ বাণটী ছুড়িয়া দেয়। বলে, এত রদ্দুর। দুটো পানই না হয় খাবে। আমরা নষ্টলোক ব'লে কি আমাদের বাড়ীতে যেতে নেই?

না, না তা' নয়, বলিয়া সহানুভূতির দৃষ্টিতে মধুসূদন সুভদ্রার দিকে তাকায়। সুভদ্রা বলে, তবে চলনা। চল চল। তারপর তাহাকে এক রকম ঠেলিয়া লইয়াই সে অন্নপূন্নো ভোজনালয়ের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

মধুসূদন বলে, দাঁড়াও হোটেলের পয়সা দিয়ে আসি।

সুভদ্রার চোখেমুখে তখন ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা তীব্র হিংস্রতা। বহুদিনকার ক্ষুধিত শার্দ্দুল সম্মুখে ভক্ষ্যবস্তুকে দেখিয়া স্বাভাবিকভাবে

তাহার চোয়াল নাড়িলে যে স্বভাব-সৌন্দর্য্য তাহার চোখ মুখ-দিয়া ঠিকরাইয়া পড়ে সেদিন সুভদ্রার চোখে-মুখেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেই দীপ্তি। এই দীপ্তির আড়াল হইতে একটুখানি হাসিয়া সে বলে, ওপয়সা তোমার দিতে হবে না, চল। মধুসূদনের মুক্তির আর কোন উপায় নাই। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলিতে থাকে সুভদ্রার সাথে সাথে।

তারপর সুভদ্রা তাকে লইয়া যায় পতিতা মেয়েদের পাড়ায়। তাহারই একান্তে তাহার বেশ একটা দোতালা বাড়ী। আদর যত্ন করিয়া মধুসূদনকে বসায়। নিজে হাতে পান সাজিয়া সুভদ্রা তাহাকে খাইতে দেয়। এক সময়ে বলে, ব্যাপারি মনটা আজ ভাল নেই একটু কিছু খেতে পারলে হ'ত!

'একটু কিছুর' অর্থ মধুসূদন জানে। মাঝে মাঝে সে এদিকে আসিয়াছে। সে হাসিয়া বলে, আনাও না।

সুভদ্রা বলে, পয়সা কড়ি নেই তা'ছাড়া তোমায়ও যে বলব তারও উপায় নেই! মুনিবের টাকা?

মধুসূদন বলে, হলেই বা। মুনিব ত আর দেখ্‌তে আস্‌ছে না? দশ টাকা কম বল্‌লেই মিটে যাবে ন্যাটা!

সে ভাই তুমি বোঝ, বলিয়া উদাসভঙ্গীতে সুভদ্রা জানালার সামনে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকায়।

আরে আনাও আনাও, বলিয়া মধুসূদন কোমরের গেঁজি খুলিয়া কাগজে জড়ানো নোটের তাড়া হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দেয়। সুভদ্রা নোটখানা তুলিয়া লইয়া করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলে, ব্যাপারি মানুষ না হ'লে কেউ কখনো ভালবাস্‌তে পারে না!

মধুসূদন গদ-গদ হইয়া ভালবাসার ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করে। সুভদ্রা শুনিতে শুনিতে এক ফাঁকে ডাকে, বলার-মা অ-বলার-মা?

নীচ হইতে সাড়া আসে, যাই।

বারান্দায় আসিয়া স্নভদ্রা বলে, আর আস্‌তে হবে না। তুমি উঠোনে এসো দিকি একবার ?

বলার-মা উঠানে আসিলে স্নভদ্রা দশ টাকার নোটখানা ফেলিয়া দিয়া বলে, দু'টো নিয়ে এসো দিকি ?

সেই দু'টা বোতলই শুধু আনে নাই, পর পর আরও অনেকগুলি আসিয়াছিল। এবং খালি বোতলে জল ভর্ত্তি করিয়াও বলার-মা প্রায় একশো তেইশ টাকা সেদিন মদের দাম বাবদ মধুসূদনের নিকট হইতে আদায় করিয়াছিল। এই বলার-মাও পরেশ ঠাকুরের আরেকটী আবিষ্কার। আশেপাশের দরিদ্রলোকদিগের দ্বারা পরেশ ঠাকুর মদ চোলাই করায়। পুলিশের হাতে ধরা পড়িলে ধরা পড়ে তাহারা, পরেশ ঠাকুর বাঁচিয়া যায়। অবশ্য পরেশ ঠাকুর অধার্ম্মিক নয়। তাহার মদ চোলাইয়ের কুটীর শিল্পীদিগের জেল হইয়া গেলে পরেশ ঠাকুর নিয়মিত-ভাবে তাহাদের পরিবারবর্গকে অর্থ সাহায্য করে। তাহার এই গুপ্ত ব্যবসা বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যায় এবং এই চলিয়া যাইবার জন্যই সে স্নভদ্রার মত কয়েকজন নিপুণা লোক রাখিয়া দিয়াছে। ইহারা খরিদ্দার ডাকে। বলার-মা তাহাদের মদ জোগাইয়া থাকে।

পরদিন প্রাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মধুসূদনকে বাড়ী ফিরিতে হয়। ইহারই কয়েকদিন পরে তাহাকে টাকা মারিয়া দিবার অপরাধে আড়াই বৎসর সশ্রম কারাবরণ করিয়া লইতে হয়।

বনমালীর নিকট হইতে এই কাহিনী শুনিয়া নিরাপদ আশ্চর্য্য হইয়া যায়। কি এক অজানা আশঙ্কায় তাহার হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া আসে। সে বলে, রাধাও স্নভদ্রার কথা বল্‌ছিল—

বনমালী এতক্ষণ কথা বলিতে বলিতে বেশ উত্তেজিত হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বত্র যেন সে কোন রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে ব্যস্ত

এমনি একটা চাঞ্চল্য তাহার চোখে-মুখে দেখা যায়। সে জিজ্ঞাসা করে, কি কি বলত ?

রাধা বল্‌ছিল সুভদ্রা বড় তার পেছনে লেগেছে বলিয়া নিরাপদ বনমালীর দিকে তাকাইয়া থাকে। বনমালী বলে, আয় তা'হলে ঠিকই হ'য়েছে। আমি যা ভাবছিলুম তাই।

নিরাপদ এই বনমালীটার তল পায় না। সে যে কত জানে এবং কি করিয়া জানে, তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ করে সে। ভিতরে কৌতূহলী মনটাকে না চাপিতে পারিয়া সে শুধু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া বনমালীর দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। বনমালী বলে, সুভদ্রা ঠিক রাধার কোন অনিষ্ট কর্‌বে দেখিস্‌!

নিরাপদ এমনিতরোই কি একটা আশঙ্কা করিতেছিল। সে তেমনি ভাবেই চাহিয়া থাকে বনমালীর দিকে। বনমালী বলে, ঐ জন্যেই আমায় জিজ্ঞেস কর্‌ছিল রাধার কথা।

কি সে অনিষ্ট, কি তাহার রূপ হইবে, নিরাপদ তাহা ভাবিয়া পায় না। তবু কি এক কল্পিত অনিষ্টের কথা মনে করিয়া সে চুপ করিয়া তাহার প্রতিকারের পথ খুঁজিতে চেষ্টা করে। বনমালী কিন্তু দৃঢ়স্বরেই বলে, আমি থাক্‌তে সুভদ্রার ও জারিজুরি খাট্‌ছে না। দেখিয়ে দোব তাহ'লে মজা !

গাড়ীর সারি চলিয়াছে ত চলিয়াছেই। নানা গল্পগুজবের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া গাড়োয়ানের দল পথের ক্লেশ ভুলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে বেলা গড়াইয়া আসে শেষের দিকে। সূর্য্যদেব যাই যাই করিয়াও যেন বিদায় লইতে পারেন না। দিক্‌চক্রবালের পশ্চিমপ্রান্তে বিশাল একটা অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যাইবার আসন্নবেদনায় যেন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই রশ্মিশিখা গ্রামের গাছপালার উপর পড়িয়া নবীন বৎসরের নব-কিশলয়দলকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। বাতাস নাই

বলিলেই চলে তবু আশেপাশের বাঁশবন কিসের দোলায় মাঝে মাঝে আপনা-আপনিই ফট্ ফট্ করিয়া উঠিতেছে। আর দূরগ্রামপ্রান্ত হইতে ভাসিয়া আসিতেছে এক একটা কোকিলের মাত্রাচড়ানোর স্বর। গাড়ীর মিছিল চলিতে থাকে একভাবেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামে নামে এমন সময়ে গ্রামের পথে আসিয়া পৌছায় গরুর গাড়ীর দল। যে যাহার পথ লয় চিনিয়া। কোথাও মাঠের অসমতল পথে, কোথাও সঙ্কীর্ণ পথের মাঝখানে গৃহাভিমুখী শ্রান্তপথিকের দলকে বিব্রত করিয়া গাড়ীগুলি ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে কেবলই চলিতে থাকে ঘরপানে।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বনমালী মুখে হা-হা শব্দ করিয়া গাড়ী থামায়। তারপর ডাকে, আরে ও খেঁদি আলোটা নিয়ে আয় ত।

খেঁদি সারাদিন ধূলা কাদা মাখিয়া খেলা করিয়া বেড়াইয়া কিছুক্ষণ আগে মায়ের নিকট মার খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া লইয়া আসে বনমালীর স্ত্রী কাঁদনবালা। হাতের আলোকশিখায় অর্দ্ধঅবগুণ্ঠনে ঢাকা তাহার মুখখানি সুন্দরই দেখায়। বনমালী এবার অনুভব করিতে পারে যে সে গৃহে ফিরিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া নিরাপদকে সে বলে, আয় নীরু গাড়ী-গুলোকে একেবারে আমতলায় তুলে রাখি।

চল্, বলিয়া নিরাপদ তাহার গাড়ীর সম্মুখভাগ ধরিয়া বনমালীর বাড়ীর সামনে যে আমগাছটা তাহার নীচে আনিয়া গাড়ীটাকে দাঁড় করায়। তারপর গরুদু'টাকে খুলিয়া দিয়া চ্যাঙারীগুলাকে লইয়া যায় বনমালীর ঘরের দাওয়ায়। বনমালীও তাহাই করে।

ঘরখানা বনমালীর ভাঙ্গা। কবে যে ঘরখানার মাথায় খড় চাপানো হইয়াছিল এবং তাহা কতদিনই যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা সঠিক বলা যায় না। কাঁদন বলে, আমি আসিয়া অবধিই দেখিতেছি, জল পড়িয়া

পড়িয়া মাটীর দেওয়াল গলিয়া গিয়াছে—শুধু চারিদিকে চারটী দেওয়ালের কঙ্কাল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। খড় পচিয়া পচিয়া চালের বাঁখারিগুলা গিয়াছে বাহির হইয়া। খুঁটী গুলায় ধরিয়াছে ঘুণ। দাওয়াটা

কাঁদন আসিয়া হাত ধুইবার জল দেয় তাহাদের। কাঁসি করিয়া আনিয়া দেয় গুড় ও মুড়ি আর আনিয়া দেয় খাবার জল। নিরাপদ হাসিয়া বলে, বৌঠাকৃরুণ যেন রাজরাণী। কোথায় যে পায় এসব ?

কাঁদন হাসিয়া বলে, তা' বৈ কি।

হাত-পা ধুইয়া আসিয়া তাহারা খাইতে বসে তালপাতার বিনুনী করা আসনে। কাঁদন বলে, মেয়েটাকে আজ বড় মেরেচি।

এতক্ষণ ইহারা যেন মেয়েটার কথা ভুলিয়াছিল। নিরাপদ বলিয়া উঠে, কেন ?

কাঁদন তাহার দিকে তাকাইয়া হাসে। বনমালী বলে, তা' মার্‌বে বৈ কি !

কাঁদন এবার বলে, যা করে মেয়েঃ তোমাদের সাম্‌লাতে হ'ত ত বুঝতে !

আর সাম্‌লানো। মেয়েকে সামলায় কাঁদন, কাঁদনকে সামলায় বনমালী। ইহাই ত নিয়ম। বনমালী হাসে—নিরাপদ বলে, সামলাবে বলে কি মার্‌তে হবে ?

তা' নয়ত কি, কাঁদন হাসিতে হাসিতে বলে। বনমালী বলে, নে নে তুই খা।

নিরাপদ খাইতেই মন দেয়।

জীবনের কোন্ মুহূর্ত্তে নিরাপদ ইহাদের সহিত পরিচিত হইয়াছে আজ মনে পড়ে না তাহার। না পড়ুক ইহাদের সহিত পরিচিত হইয়া সে যাহা পাইয়াছে এমন কয়টা লোক পায় ! জগতে অনেক কিছুই

দুষ্প্রাপ্য নয় তাহা নিরাপদ জানে কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা, এতটুকু দরদ, খাওয়ার সময় খাওয়া, ঘুমের সময় ঘুম, অসুখ করিলে তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে বিন্দু বিন্দু জল, প্রভৃতির দাবী তাহার ইহাদের কাছে যেমন আর কোথাও কি মিটিয়াছে না মিটিতে পারে? এতখানি মমতা, এতখানি সহানুভূতি পরের জন্য এতখানি ভালবাসা সত্যই জগতে বিরল। তাহার এই ছাব্বিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে মানুষের যে রূপ সে দেখিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে সে দেখিতে পায় বীভৎস নারকীয় তাণ্ডবের মধ্যে সে যেন এক নিভৃত স্বর্গের প্রশান্ত ছায়ার সন্ধান পাইয়াছে এবং সেই মধুময় আবেষ্টনীর মধ্যে একটী একটী করিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছে নিশ্চিন্ততায়, নির্ব্বিবাদে। দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া রাত্রির অন্ধকারময় আকাশখানার দিকে তাকাইয়া নিরাপদ প্রার্থনা জানায়, ভগবান তুমি এদের বাঁচিয়ে রেখ।

রতনপুর গ্রামখানা ছোট্ট নয়—বেশ বড় গ্রাম। কলাবাগানের চাষীরা যেদিকে থাকে সেইদিকটা গ্রামের দক্ষিণপাড়া। দক্ষিণপাড়ার একটুখানি পশ্চিম দিক ঘেঁসিয়া কৈবর্ত্তপাড়া। এপাড়ার সকলেই যে ভূমিহীন তাহা নহে, এখনও লোকের মাথাপিছু প্রায় তিন বিঘা সাড়ে তিন বিঘা করিয়া জমি আছে। বরং প্রতিবৎসরই দেখা যায় তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে ভয়ানকভাবে। ধান চাষ করিয়া ইহারাই খাইতে পায় না, চালে খড়ের অভাবে ভাঙ্গা চাল দিয়া বৃষ্টির জল ঝরিয়া ঘরগুলোকে করিয়া দেয় নষ্ট, তুলা বুনিয়া ইহারাই পরিতে পায় না বস্ত্র। অনাহারে অর্দ্ধাহারে বাসের অযোগ্য ঘরে রোগে ভুগিয়া মলিন কাঁথায় দেহ ঢাকিয়া ইহাদের কাটাইয়া দিতে হয় দিনের পর দিন। ইহাদেরই ঘরের মেয়েরা শতজীর্ণ বস্ত্রে নিজেদের লজ্জা নিবারণ করে। ইহারই পশ্চিম দিকে বাগ্দী-পাড়া। বাগ্দী-পাড়ার কথা একটু স্বতন্ত্র। কৈবর্ত্ত পাড়ার যে দুঃখ সে ত ইহাদের

আছেই, তাহা ছাড়া যাহা উহাদেরকে পঙ্গু অমানুষ করিয়া রাখিয়াছে তাহাও আছে। এতবড় বিরাট পৃথিবীতে জমি বলিয়া ইহাদের ভাগ্যে কোন কিছু জুটে নাই। মাথা গুঁজিবার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে ইহাদের ঠিকাপ্রজা হইয়া দিন কাটাইতে হয়। ইচ্ছা করিলে ভূস্বামী যখন তখন উঠাইয়া দিতে পারেন। চিরকাল পরের জমিতে দাসত্ব করিয়া, ভাগ-চাষের সর্ব্বনেশে-প্রথা নিজেদের পরিশ্রমকে আহুতি দিয়া ইহাদের দিন যাপন করিতে হয়। অনেকটা কলাবাগানের চাকুরেদের মত। এই অঞ্চলে এই বাগ্দীরাই একেবারে ছোটলোক বলিয়া পরিচিত। অবশ্য গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থের দল নিজেদের গণ্ডীছাড়া আর সকল জাতিকেই ছোট লোকের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আর ছোট লোকের দল নির্ব্বিবাদে ইহা সহ্য করিয়া চলিয়াছে দিনের পর দিন।

সন্ধ্যায় কাজকর্ম্ম সারিয়া গৃহে ফেরে রতনপুরের অধিবাসীরা। গৃহে পৌছিলে কোন্ আশার আলোক যে ইহাদের আনন্দ দিবে তাহা ইহারা খুঁজিয়া পায় না। ঘরে ঘরে ইহাদের হাহাকার—ক্ষুধা, রোগ ও শোকের অসহ্য গোঙানি। এমন ঘর নাই যে-ঘরে না নিরানন্দ বাসা বাঁধিয়াছে। দারিদ্র্য ইহাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দারিদ্র্য ইহাদের পশুতে পরিণত করিয়াছে। পয়সা নাই, লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই। লেখাপড়া শিখিতে না পাইয়া অল্পবয়সেই ছেলেগুলা বখিয়া যায়। অল্পবয়সে বখিলে, সে দোষ আরও অনেককে স্পর্শ করে। এমনি করিয়া যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তাহাতে ইহাদের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায় না—জন্মায় ধিক্কার। পৃথিবীতে আসিয়া যাহারা শুধু নিজেদের ঘৃণা করিতেই শিখিল তাহারা ভাল হইবে কি করিয়া ?

তাই সন্ধ্যায় ইহারা বাড়ী ফিরিলে চলিয়া যায় যে-যার মনোমত

আড্ডায়। সেখানে তাড়ি খায়, পচাই মদ খায়, হল্লা করে, লোকের বৌ-ঝিদের সম্বন্ধে নানা ইঙ্গিত করে। এমনও দেখা যায় সময় সময় গ্রামের মেয়েদের সর্ব্বনাশ করাই ইহাদের নিয়মিত একটা কাজ হইয়া দাঁড়ায়।

রতনপুর গ্রামে সন্ধ্যা হইলে ঘরে ঘরে শোনা যায় ক্রন্দনের রোল। সে ক্রন্দন ক্ষুধার জন্য, রোগের জন্য, শোকের জন্য আর মারামারি কলহের জন্য। মাতাল অবস্থায় পুরুষেরা বাড়ী ফিরিয়া বউ-ঝি-ছেলে-পিলেদের পিটিতে থাকে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে থাকে। ক্ষুধার জন্য ছেলেরা কাঁদিলে জননীরা প্রহার করে তাহাদের। রোগে ঔষধ না পাইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে হতভাগ্য রুগ্নের দল। শুধু হয়ত চিকিৎসার অভাবেই মৃত্যু ঘটিয়াছে পুত্রের, শোকাতুরা জননী কাঁদে সুর করিয়া।

গ্রামের পূবদিকটা জলা। উত্তরদিকে যাহারা আছে, সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থদের অবস্থা ভাল এবং ওদিকটাতেই শুধু হাহাকার নাই, কদর্য্যতা নাই, সবকিছুই ভরা পরিচ্ছন্নতায়।

তবু দুঃখের মাঝেও মানুষ ভুলিয়া যায় নাই মানুষের ধর্ম্ম। বনমালীর ঘরে আজও সে ধর্ম্ম অটুট রহিয়াছে, কাঁদন রান্নাঘর হইতে ডাকে, ঠাকুর-পো ঠাঁই হ'য়েছে তোমরা এস।

নিরাপদ বলে, যাই। তারপর পাশে চাহিয়া দেখে বনমালী নাই। সে ইতঃস্তত করে। কাঁদন পুনরায় ডাকে।

নিরাপদ বলে, বনমালীকে দেখতে পাচ্ছিনা যে!

গেল কোথায়, বলিয়া কাঁদন আলো লইয়া বাইরে আসে। এমন সময় বাড়ীর দরজার কাছে বনমালীকে দেখা যায়। কাঁদন বলিয়া উঠে, এই যে। বনমালী দরজার বাহিরে দৃষ্টি ফেলিয়া বলে, এস মাথাটা বাঁচিয়ে দরজাটা বড় নীচু।

কে যেন বনমালীর সাথে আসিতেছে। কাঁদন বুঝিতে পারিয়া আলোটাকে উঠানের উপর বসাইয়া দিয়া দৌড়িয়া পালাইয়া যায় রান্নাঘরের দিকে। নিরাপদ বলে, বনমালী তুই ত এই ছিলি, গেলি কখন ?

লোকটী ভিতরে আসে। কেরোসিনের ডিবার ম্লান আলোকেই নিরাপদ তাহাকে চিনিতে পারে। সে কৈবর্ত্ত পাড়ার ব্রজ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, মাথায় যাত্রাদলের মত ঝাকড়াঝাকড়া কোঁকড়ানো চুল। ব্রজকে দেখিয়া নিরাপদ বলে, কি ব্রজ ভাই হঠাৎ পথ ভুলে নাকি ?

পথভুলে কি ভাই—পথই আমাকে ভুলে ছিল, বলিয়া ব্রজ আগাইয়া আসে দুয়ারের দিকে। পল্লীগ্রামের তালপাতার বিমুনীকরা আসনটী সাম্‌নে ঠেলিয়া দিয়া নিরাপদ বলে, এস এস ব'স।

কি খবরটবর, আর আসনা এদিকে, নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে। ব্রজ তাহার বাবরীকাটা চুলে হাত বুলাইয়া লইয়া বলে, ঐ ত বল্‌লুম ভাই— পথই আমাকে ভুলে ছিল।

নিরাপদ ব্যাপারটা বুঝিতে পারে না। বনমালীর দিকে তাকাইয়া সে প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যায়। বলে, বনমালী তুই বাইরে গেলি কখন বল্‌দিকি ?

বনমালী উঠান হইতে আলোটা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলে, আরে তোর সাম্‌নে দিয়ে গেলুমত ?

হ্যাঁ, বলিয়া নিরাপদ বোকার মত তাহার দিকে তাকায়।

না ত না, বলিয়া দাওয়ার একদিকে আলোটাকে বসাইয়া রাখিয়া বনমালী ব্রজর পাশে বসিয়া পড়ে। নিরাপদ রান্নাঘরের দরজার সম্মুখে কাঁদনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলে, বনমালী খাবার ঠাঁই হয়েছে। বৌঠান ডাক্‌ছে।

তাই নাকি, বলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে তাকায়। সেখান হইতে ঐ রকমই নির্দ্দেশ আসে।

আচ্ছা ব্রজকে তামাক দিয়ে যাই তাহলে, বলিয়া দেয়ালের গায়ে ঠেসান দেওয়া হুঁকাটাকে টানিয়া লইয়া বনমালী তাহার মাথা হইতে কলিকাটা তুলিয়া লয়। তারপর কলিকাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ঠিক্‌রাটা বাছিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়ায়। দেয়ালের কুলুঙ্গীতে বাঁশের চোঙের ভিতর যে তামাক থাকে তাহার খানিকটা বাহির করিয়া লইয়া সে রান্নাঘরের দিকে যায়। জলন্ত কাঠের কয়েকটা টুকরা কলিকার ভিতর আঙুল দিয়া চাপিয়া চাপিয়া হুঁকার মাথায় সেটা বসাইয়া দিয়া কয়েকটা টান মারে। তারপর বাঁ হাতে করিয়া খোলের ছিদ্রটার চারদিক মুছিয়া দিয়া ব্রজকে আনিয়া দেয়।

নিরাপদ নামিয়া যায় উঠানে। বনমালী ব্রজকে জিজ্ঞাসা করে, ব্রজভাই শুধুশুধু ছুটো হবে নাকি ?

ইহা পল্লীগ্রামের রীতি। নিজে খাইতে যাইবার আগে আগন্তুক ইতরভদ্র যাহাই হউক না কেন তাহাকে একবার বলিতেই হইবে। বনমালী জানে, ব্রজ খাইবে না। খাওয়ার কথাও নয়। তবু একবার বলিতে হয়। উত্তরও চিরন্তন। ব্রজ বলে, না ভাই গিয়ে আমি খাব।

ওদিকে কাঁদন ফিস্‌ফিস্ করিয়া নিরাপদকে কি বলে। নিরাপদ বলে, ব্রজভাই তোমাদের বউ কি বলে শুনচো ?

কি মা, বলিয়া কাঁদনকে তাহার প্রশ্নটা জানাইয়া দেয়। কাঁদন উত্তর দেয় না, উত্তর দেয় নিরাপদ। বলে তোমাদের বউ বল্‌ছে, কেন বড় ঠাকুর কি মেয়ের রান্না পছন্দ করে না ?

ব্রজ তেমনিভাবেই বলে, ভাল লাগবেনা কেন মা ? তুমি ঐ যে বল্‌লে ঐতেই আমার খাওয়া হ'য়েছে,। এমন ক'জন বলে।

বনমালী হাসিয়া বলে, জান ত ওর ইচ্ছে। কি করব ভগবান আমায় দেয়নি। তা না হ'লে আমি ওর সাধ পূন্নো করতাম। ব্রজভাই মানুষকে দু'মুঠো খাওয়ালে কোনদিন কমেনা বরং বাড়েই। লোকের আশীর্ব্বাদে কারও অনিষ্ট হয় না।

সে ত নিশ্চয়ই ভাই কিন্তু ক'জন তা বোঝে? বলিয়া ব্রজ হাসে। বনমালী বলে, তাহলে বস ভাই। আমি যাই গর্ত্তটা বুঁজিয়ে আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলিয়া ব্রজ হুকায় টান লাগাইতে স্বরু করিয়া দেয়।

খানিকপরে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বনমালী ও নিরাপদ ব্রজর কাছে আসিয়া বসে। কাঁদন তাহাদের একপাশ দিয়া কেরোসিনের ডিবা হাতে যায় ঘরের মধ্যে পান সাজিতে। ব্রজ বলে, এত চেষ্টা করেও পারলুম না রাখতে। পায়ের সুতো ছিঁড়ে ফেললুম উত্তরপাড়া গিয়ে গিয়ে। বাবুর পা দু'টো ধরে বললুম—হুজুর আপনি মা বাপ অন্ততঃ এবছরটা রেহাই দেন। আসছে বছরে যেমন করে পারি সমস্ত বাকী খাজনা আপনাকে কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে দোব। তিনি শুধু বললেন—নালিশ যখন হয়ে গেছে তখন আর কোন পথ নেই। কোর্ট থেকে ঠিক হয়ে গেছে জমি-জমা মায় বসতবাটী সব নিলাম হবে। দিনও ধার্য্য হ'য়ে গেছে।

বনমালী তামাক সাজিতে সাজিতে বলে, এর কোন একটা ব্যবস্থা হ'ল না?

চেষ্টা কি কম করেছি রে ভাই, বলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া পুনরায় ব্রজ বলে, অদৃষ্টের যোড়রে ভাই! তা না হ'লে কত্তা ম'ল ঠিক এই সময়টাতেই ম'ল? বুড়ো থাকতে কখনো নালিশ মোকদ্দমা করেনি। গেলেই বুড়ো বলত, বাবা আমাকেও দিতে হয় সরকারকে। তোরা যদি না দিস্ ত আমি দোব কোত্থেকে, দিয়ে যাস্ কিছু কিছু ক'রে।

বনমালী কলিকাটীকে হুকার মাথায় বসাইয়া দিয়া বলে, আরে তাঁর কথা বল কেন। তিনি কি মানুষ ছিলেন—তিনি দেবতা। দেখলেই তাঁকে ভক্তি করতে ইচ্ছে যেত। যেম্‌নি মহাদেব-মহাদেব চেহারা তেমনি ভোলাভোলা মন। সিংহী-মশায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে আস্‌তেন —চলেই আস্‌তেন। পাল্কীর মুস্কো মুস্কো বেয়ারাগুলো বইতে পারত না ওনাকে।

নিরাপদ মন দিয়া সব শুনিয়া যায়। জমিদার, জমিদারী ব্যাপার, খাজনা নালিশ মোকদ্দমা এসব সে তেমন বোঝেনা। তবে নিলাম কি ব্যাপার তাহা সে জানে। বাল্যের এক তিক্ত-অভিজ্ঞতা আজও সে ভুলিতে পারে নাই। নিলাম মানে স্ত্রী পুত্র সকলের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়ানো।

ব্রজ বলে, আহা-আ বুড়ো পুণ্যবান্ লোক। ওনার অবর্ত্তমানেই আমার এই দুর্দ্দশা। তারপর ব্রজ তাহার ফতুয়ার পকেট হইতে কয়েকখানা কাগজ বাহির করে। তাহার মধ্যে দুইখানা লাল ও একখানা সাদা। সাদা কাগজখানি নিলামী ইস্তাহার। জেলার সমস্ত আদালতে যে সমস্ত সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি নিলাম হয় সেই কাগজখানিতে তাহা ছাপা হয়। কাগজের যেখানে তাহার নামটী ছাপা ছিল ব্রজ সেখানটীতে কালির দাগ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভাঁজ খুলিয়া সে বনমালীকে দেখাইয়া দিয়া বলে,—বাকী খাজনা মোট ৬৭৷৶১৭॥ তাহার জন্য চারকাঠা জমি তিনখানা কাহিঘর সমেত ও তিন বিঘা আবাদী জমি মূল্য ৬০৲। ঘর থেকে উল্টে আমায় ৭৷৶১৭॥ পয়সা দিতে হবে। কি করি বলত? ঘরে একটিও পয়সা নেই।

নিরাপদ পড়িতে জানে না। সে কেবল শুনিয়া যায়। সে ভাবে, এই জন্যই বোধ হয় ব্রজ বলিতেছিল, সে পথ ভুলে নাই, পথই ভুলিয়াছে তাহাকে। ঐসব ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই ব্যস্ত ছিল তাই আসিতে পারে

নাই এদিকে। আহা ব্রজর কি নিদারুণ অবস্থা। সহানুভূতিতে, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে প্রায়।

বনমালী বলে, কি করবে বল। একমাত্র উপায় হচ্ছে যদি চেনা লোক কিম্বা আত্মীয়বন্ধু কেউ নিলামটা ডাকে। তাহলে তাকে বলে কয়ে দু'দিন ঘরে বাস করতে পারবে আর সেই সময়ের মধ্যে চাই কি অন্য কোন জায়গায় মাথা গোঁজবার একটু জায়গাও যোগাড় করে নিতে পারবে।

ব্রজ বলে, কিন্তু আমার তিনকুলে মাগ ছেলে আর আমি ছাড়া কে আছে ?

বনমালী তাকাইয়া থাকে তাহার দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, নিলামের দিনটা হল কবে ?

তেইশ তারিখ, ব্রজ উত্তর দেয়।

একখানা ছোট রেকাবীতে চার খিলি পান রাখিয়া কাঁদন চলিয়া যায় রান্না ঘরে। নিরাপদ পানের রেকাবীটা ব্রজর দিকে ঠেলিয়া দিয়া এক খিলি তুলিয়া লইয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। তারপর বনমালী লয় এক খিলি এবং ব্রজকে লইতে সে অনুরোধ করে। ব্রজ পান তুলিয়া লয়।

পান চিবাইতে চিবাইতে বনমালী হুঁকা হাতে যায় রান্নাঘরে। একটা ভাঙা বেড়ী দিয়া উনুনের অঙ্গারগুলিকে খানিকটা নাড়িয়া দিয়া কয়েক খণ্ড জ্বলন্ত কাঠ হাতে করিয়াই তুলিয়া লইয়া সে কলিকায় তোলে। তারপর যথারীতি তামাকুতে হয় অগ্নি-সংযোগ। খোলের উপর মুখ রাখিয়া টানিতে টানিতে বনমালী দুয়ারের উপর উঠিয়া আসে। ব্রজর কোলের কাছে লাল রঙের কাগজ দুইখানি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ ব্রজ ওকাগজ দু'খানা কিসের ?

কৈ কি কাগজ, বলিয়া ব্রজ বনমালীর দিকে তাকায়। নিরাপদ অনেকক্ষণ হইতে কাগজগুলার দিকে তাকাইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি সে

হাঁটুতে ভর দিয়া বাঁ হাতটা মাটিতে রাখিয়া ডান হাতে লাল কাগজ দু'খানা তুলিয়া লয়। ব্রজ বলে, ওঃ—ও হচ্ছে সভার কাগজ। কাল সভা হবে।

সভা কোথায়, বনমালী জিজ্ঞাসা করে।

ব্রজ বলে, শোননি—বাগ্দী পাড়ার ওদিকে সেই মাঠটাতে?

কই না, বলিয়া বনমালী বিস্মিতভাবে ব্রজর দিকে তাকায়। ব্রজ বলে, ঐ যে রায়েদের সেই আশুবাবু সভা করবে।

কিসের সভা, বলিয়া বনমালী হুঁকাটা নিরাপদর হাতে দেয়। তারপর একখানা কাগজ তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করে।

ব্রজ বলে, ঐ কৃষি বিষয়ে হবে আর কি।

সুদটুদ কিছু কমবে, বলিয়া বনমালী হাসে। হাসিবার কারণ তাহার আছে। খেঁদীর জন্মের সময় তাহাকে কিছু টাকার ঋণ লইতে হয়। কাঁদন তখন যায় যায় আর কি। সিঙ্গুর হইতে হাঁসপাতালের ডাক্তারকে প্রায় সাত আট দিন লইয়া আসিতে হইয়াছিল এবং ডাক্তারের ভিজিটের প্রায় সমস্ত টাকাটাই অম্বিকা চাটুয্যের নিকট হইতে কর্জ্জ লইতে হইয়াছিল। এখন সুদে আসলে তাহা প্রায় সত্তরে দাঁড়াইয়াছে। তাহার মতে সভা-সমিতি করিয়া যদি নিজেদের কষ্টের প্রতিকার করিবার পথ বাহির না হয় তবে সে সভা করিয়া লাভ কি? এতদিন যাবৎ সে যে সমস্ত সভা সমিতি হইতে দেখিয়াছে সে শুধু খানিকটা আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাইবার জন্যই হইয়াছে, তাহাতে ফল কিছুই হয় নাই। তবু বার বার সে আশায় আশায় এই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছে এবং বারে বারেই নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ মনে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই সভা হইতেও হয়ত তাহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। তাই যাহারা বহু বড় বড় কথা বলিয়া সভায় লোক ডাকিয়া আনে, তাহাদের করিবার

বা করাইবার ক্ষমতা কিছুই নাই, শুধু মানুষের মনকে নিরাশ করিয়াই দিতে পারে। এ হাসি তাহারই প্রতি একটা তীব্র অবহেলার।

তাহার হাসিটা ব্রজর ভাল লাগে না। তাই বলিয়া সে অবশ্য ঝগড়াও করে না। সে বলে, না না সভাটা ভালই হবে।

কেন কি জানি ব্রজ ইতিমধ্যেই আশু রায়কে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একটা কারণ অবশ্য সত্য যে লোকটার নাকি দয়াধর্ম্ম আছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। সেই হিসাবে হয়ত ব্রজ তাঁহার নিকট হইতে কোন সুবিধা করিয়া লইতে চায়। কিম্বা ইহাও সত্য হইতে পারে যে ব্রজ আশু রায়ের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার লইয়া তাহার এই নিলামটীকে সে বাঁচাইবে নয়ত তাঁহাকে দিয়াই ডাকাইয়া লইয়া কিছুদিন বাস করিয়া লইবে। কে জানে ব্রজর মনের কথা। মানুষ যখন বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে চায় তখন সহজে সে সেই উদ্ধারের পথটি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহে না, কারণ তাহারই উপর নির্ভর করে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ।

বনমালী হঠাৎ হাসিয়া বলে, ঊষা দেবীটি কে? কলকাতার বুঝি?

ব্রজ বলে, না উনি আশুবাবুরই মেয়ে।

নিরাপদ ভাবিয়া পায় না সভায় মেয়ে কেন আসিবে। সে একবার বনমালীর মুখের দিকে একবার ব্রজর মুখের দিকে তাকায়! বনমালী বলে, গানও গাইবেন আবার বক্তৃতা করবেন? খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে তাহলে?

হ্যাঁ, ব্রজ বলে, তিন চারটে পাশ।

নিরাপদর কাছে স্বপ্ন। একে মেয়ে তার উপর আবার তিন চারিটা পাশ। এ রকম মেয়ে সে জীবনে কখনও দেখে নাই। একদিন গাড়ী লইয়া ফিরিবার সময় শেওড়াফুলি ষ্টেশনের ফটকের কাছে একটি মেয়েকে জুতা চশ্‌মা পরিয়া যাইতে সে দেখিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল, মেয়েটী

নিশ্চয়ই তিন চারিটা পাশ দিয়াছে। আজ সেই মেয়েটীই তাহার চোখের সম্মুখে উষা হইয়া দেখা দিল। উষারও চোখে চশমা আছে, পায়ে আছে জুতা, উষা তিন চারিটা পাশ।

বনমালী কাগজখানা আরও পড়ে। তারপর বলে, বিজ্ঞানাচার্য্য, সদ্য ইঁউরোপ-প্রত্যাগত এরা কারা ?

ইহারা ব্রজর নিকটও অজ্ঞাত। তবু সে বলে, ওঁরা মণিষীবৃন্দ।

মণিষীবৃন্দ কথাটা কাগজ খানাতে ওদেরই পাশে লেখা ছিল। বনমালী বলে, ও এই যে লেখা রয়েছে। এরা সবাই তাহলে কালকে কৃষি বিষয়ে লেক্‌চার দেবে ?

হ্যাঁ, বলিয়া ব্রজ দুই হাত দিয়া তাহার বাবরীকাটা চুলগুলিকে একবার নাড়া দেয়। নিরাপদকে তাহার চুলের দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্রজ হাসিয়া বলে, কি দেখচিস্ রে নীরো ? অনেক সখের চুল। কল্‌কাতায় শিশিরবাবুর থিয়েটার দেখে এসে আমি এমনি চুল রাখি। এই চুলেই প্রায় বড় বড় পনেরো কুড়িটা আসরে লক্ষ্মণের পার্ট বলে এসেচি।

বাস্তবিক লক্ষ্মণের মতই তাহার চেহারা। এমন সুপুরুষ পল্লীগ্রামে প্রায় দেখা যায় না। নিরাপদ হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কথায় কথায় গতকল্যকার যাত্রার কথা আসিয়া পড়ে। বনমালী জিজ্ঞাসা করে, কাল 'রামানুজ' পালা কেমন শুনলে ব্রজ ?

ব্রজ তাচ্ছিল্যভরে বলিয়া ওঠে, ও কি আবার যাত্রা হ'ল নাকি ? আর যে লোকটা লক্ষ্মণ করলে ঐ কি লক্ষ্মণের পার্ট বলা হল নাকি ? এ্যাক্টো শিখে আসুক কিছুদিন—

নিরাপদর কেমন কেমন ঠেকিল। কাল লক্ষ্মণের পার্ট শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে। অথচ ব্রজ এমন কথা বলিতেছে। মনে মনে সে কল্যকার লক্ষ্মণ ও আজিকার ব্রজর কথার তুলনামূলক সমালোচনা

করিতে থাকে। কি করিবে সে? ব্রজকেও যে সে ভালবাসে। উভয়ের সকল দোষত্রুটী মুছিয়া দিয়া নিরাপদ নিজেই দুঃখ বরণ করিয়া লয়। ব্রজর কথায় সে আঘাত পায় ত পাক্, ব্রজর কোন দোষ নাই।

কিন্তু ব্রজ কি তাহা বুঝে? সে অনর্গল আত্মপ্রশংসা করিয়া চলে আর গালাগালি দিয়া যায় কল্যকার লক্ষ্মণকে। বনমালী এবার ঘাড় তুলিয়া বলে, ব্রজ ভাই লক্ষ্মণ বর্জ্জনের লক্ষ্মণ তোমায় মানায় বলেই ভিটামাটীর কাছ থেকেও তোমায় বিদায় নিতে হ'চ্ছে।

সত্যি ভাই, সত্যি বলেচো তুমি। সেই সিনটা মনে আছে যখন লক্ষ্মণ বিদায় নিচ্ছে? ব্রজ বলে।

বনমালী ঘাড় নাড়ে, নিরাপদও নাড়ে; কারণ উভয়েরই মনে আছে সে সিনটা। ব্রজ বলে, অত প্রাণ দিয়ে বিদায়ের সিনটা ফুটিয়ে তুললুম ব'লেই আজ সত্যি হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

বনমালী সহানুভূতি জানায়। নিরাপদও যে জানায় না তাহা নহে, তবে পরে সে লক্ষ্মণের সেই বিদায় দৃশ্যটার কথাই ভাবে।

তারপর এক সময়ে ব্রজ উঠিয়া পড়ে। নিরাপদ বলে, আরে তামাক খাও। বলিয়াই সে হুঁকাটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দেয়।

না ভাই আর তামাক খাব না, বলিয়া ব্রজ নামিয়া পড়ে উঠানে। বনমালী বলিয়া উঠে, চল্‌লে ব্রজ! হ্যাঁ ভাই এদিকে আবার রাত হয়ে যাচ্ছে, বলিয়া সে একটু অগ্রসর হয়। তারপর বলে, নীরো ভাই আলোটা একটু ধর্ না দরজাটা পার হয়ে যাই।

নিরাপদ আলো ধরিলে ব্রজ চলিয়া যায়। আলোটা দুয়ারের উপর রাখিয়া এবার নিরাপদ বলে, তাহলে আমিও যাই শুইগে।

বনমালী বলে, আমি কি জানি ঐ ওকে জিজ্ঞেসা কর। সে রান্নাঘরের দিকে সঙ্কেত করে। রান্নাঘর হইতে সাড়া আসে, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও…

কিন্তু গরুগুলোর খাওয়া হয়নি বৌঠান ? বলিয়া নিরাপদ রান্নাঘরের দিকে কয়েক পা যায়।

ঐ দ্যাখ আমি একেবারে ভুলে গেছি, বলিয়া কাঁদন হায় হায় করিতে থাকে। বলে, অবলা জীব আহা কত কষ্ট হচ্ছে।

খড়কুঁচোনো আছে ? নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে।

কাঁদন বলে. আর থাক্‌লেই বা কি হবে তুমি যাও আমি খেয়ে উঠে দোব'খন।

তাহলে গইলে তুলে রেখ, বলিয়া নিরাপদ চলিতে থাকে তাহার নিজের ঘরের দিকে। আমতলা দিয়া, রাস্তা পার হইয়া সরু পায়েচলা পথ দিয়া তবে তাহার ঘরে পৌছাইতে হয়।

রাত্রির আকাশ। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের মাঝে সারা পৃথিবী যেন হারাইয়া গিয়াছে। উপরে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে অসংখ্য তারকাদল— মানুষের বুকের কম্পমান হৃৎপিণ্ডের মত।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে নিরাপদ আসিয়া উপস্থিত হয় ঘরের দাওয়ায়। তারপর তালা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করে। দিয়াশলাই জ্বালিয়া বিছানাটা একবার দেখিয়া লইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়ে।

পরদিন আবার কাজের অন্ত থাকিবে না !

ভোরে ডাকিয়া উঠে কোকিলের দল। গ্রামের চারিদিকে পড়িয়া যায় জাগরণের সাড়া। ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠে মানুষ। বনমালী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসে নিরাপদর ঘরের দাওয়ায়। হাতে তাহার হুঁকা। ডাকে, নীরো ও নীরো ?

নিরাপদ জাগিয়াই ছিল। সে সাড়া দিয়া ওঠে, এই যে।

ওঠ্ ওঠ্ শীগ্‌গির কাজ রয়েছে কত, বনমালী আরও সব কি বলিতে যায়। নিরাপদ বলে, হ্যাঁ আমি উঠেই আছি। তারপর নিরাপদ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে। পৃথিবীর বুক হইতে অন্ধকারের

আস্তরণ তখনও সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া যায় নাই। এখনও কয়েকটা নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করিয়া আকাশের এদিকে সেদিকে জ্বলিতেছে। সে বলে, তাড়াহুড়োর দরকার নেই, এখনও সময় রয়েছে। বলিয়া সে পুনরায় ঘরের মধ্যে যায়। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘটী করিয়া বালতী হইতে জল গড়াইয়া লয়। বাহিরে আসিয়া সেই জলে হাত মুখ ধোয়। কাপড়ের খুঁট দিয়া মুখমণ্ডলটা মুছিয়া নিয়া বলে, দেখি হুঁকোটা একবার।

বনমালী জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়া লইয়া হুঁকাটা নিরাপদর হাতে দেয়। নিরাপদ প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর জোরে একটা টান দিয়া ভুস্ করিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া বলে, লাঙ্গলখানা ঠিক আছে ত?

বনমালী বলে. তোরটা?

আমারটা ঠিকই আছে, নিরাপদ বলে। বনমালী বলে, আমারও তো ঠিক রয়েছে।

তবে আর কি দু'খানা লাঙ্গল দুদ্দাড় ক'রে চললে বেলা দশটা নাগাদ সব জমিটা হয়ে যাবে, নিরাপদ বলে। বনমালী দাওয়া হইতে নীচে নামিয়া যায়। নিরাপদ বলে, আজকে দশটা পর্য্যন্ত খাটলে ওবেলাটা একটু ফুরসুৎ পাব। তারপর কালকে চাঁপা তেউড়গুলো নেড়ে বসাব।

তাই যা হয় করা যাবে'খন, বলিয়া বনমালী বাহির হইয়া যায়। নিরাপদ কলিকাটাকে নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া পড়ে। হুঁকাটাকে দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া সেও বাহিরে যায়।

খানিক দূরে কিসের একটা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি হইতেছিল। নিরাপদ গেল বনমালীর বাড়ী। বনমালী উঠানে দাঁড়াইয়াছিল।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিরাপদ বলে, বনমালী ওখানে কিসের হৈ চৈ হচ্ছে বল্ দিকি ?

বনমালী কাণ পাতিয়া শোনে। কাঁদনও দাওয়ার উপর আসিয়া কাণ পাতিয়া থাকে।

হ্যাঁ সত্যিই ত, কাঁদন বলিয়া উঠে। বনমালী বলে, হয়ত মারামারি ঝগড়া হয়েছে টয়েছে।

কাঁদন বলে, হ্যাঁ তোমার এককথা। এই ভোর বেলা লোকে গেছে ঝগড়া মারামারি করতে ?

কথাটা ভাবিবার মত বটে। গোলমাল হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। নিরাপদ বলে, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। চল না বনমালী—

বনমালী গোলমাল শুনিয়া উৎসুক হইয়া পড়ে। কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া দরজার নিকট আসে। কাঁদন বলে, কেউ নিশ্চয়ই গলায় দড়ি দিয়েছে।

কাঁদন এই রতনপুরে আসিবার পর হইতে এইরকম হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচি অনেকবার শুনিয়াছে। এ গ্রামে অনেকগুলি আত্মহত্যা হইয়া গিয়াছে। এবং যখনই এইরকম ঘটে তখনই এইরূপ গোলমাল হয়। গলায় দড়ি দিয়া যে হতভাগা প্রাণ বিসর্জ্জন দেয় তাহাকে দেখিবার জন্য লোকের উৎসাহের অন্ত থাকে না। সমানে তাহারা আত্মহত্যাকারীটাকে দেখিতে যায়, এ যাওয়ার বিরাম নাই। কাহারও মনে বিতৃষ্ণা আসে না। কাঁদনের কিন্তু বড় ভয় করে। অঘোর সাউয়ের বউ পরাণী যখন গলায় দড়ি দিয়া মরে তখন আড়কাঠার বাঁশে দড়িবাঁধা অবস্থায় লাসটাকে সে ঝুলিতে দেখিয়াছিল। কি বীভৎস সে দৃশ্য। তাহা মনে পড়িলেই ভয়ে কাঁদনের চক্ষু বুজিয়া আসে। চুলগুলা এলোমেলো, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু, শুধু চোখের সাদা অংশটাই দেখা যায়;

জিবটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এক বিঘত্ত, নাক দিয়া ঝরিতেছে সিক্‌নী ; উলঙ্গ দেহটার বুকে স্তনগুলা হইয়া আছে শক্ত—কাপড়খানা পায়ের কাছে খানিকটা জড়াইয়া গিয়াছে, মেঝের উপর পড়িয়াছে অপর খানিকটা। কাঁদনের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে সেই রকম একটা দৃশ্য !

বনমালী কাহাকে যেন দেখিতে পাইয়া আমতলায় গিয়া দাঁড়ায় বৃদ্ধ অমৃত জানাকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া সে প্রশ্ন করে, খুড়ো কি ব্যাপার গা ?

আর বাবা আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, বলিয়া ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠে বৃদ্ধ। বনমালী জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে খুড়ো ?

বৃদ্ধ উত্তর দেয় না। কাঁদিতে কাঁদিতে সম্মুখ পথে কেবলই দৌড়াইতে থাকে।

নিরাপদ ও কাঁদন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বনমালী পিছন ফিরিয়া তাহাদের দিকে তাকায়। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার ? আয় না, বলিয়া বনমালী হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়।

গ্রামের সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্য, একটা উদ্বেগ। চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসে গোলমালের স্থানটাকে লক্ষ্য করিয়া। কৈবর্ত্ত-পাড়ার অমূল্য ধাড়া নাকি কি করিয়া বসিয়াছে। পথে যাইতে যাইতে লোকে এইটুকু মাত্র আভাষ পায়। সকলেই হন্তদন্ত হইয়া ছোটে অমূল্যর বাড়ীর দিকে। সেখানে গিয়া সবাই দেখে লোকে লোকারণ্য প্রকাণ্ড জনসমুদ্রের ভিতর হইতে যাহাদের স্পষ্ট দেখা যায় তাহারা হইতেছে পুলিশ কনেষ্টবল। লাল পাগ্‌ড়ী তাহাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বনমালী ও নিরাপদ ভিড়ের একদিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়ে। জনতা দাঁড়াইয়া আছে গোল হইয়া। মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। সেখানে একটা টুলে বসিয়া আছেন দারোগা বাবু। আশেপাশে কয়েকজন কনেষ্টবল। সামনে পড়িয়া অমূল্যর স্ত্রী

মালতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ। তারই পাশে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় অমূল্য বসিয়া আছে সন্ত্রস্ত জন্তুর মত। পাশে পড়িয়া খেজুর গাছ কাটা একখানা রক্তাক্ত হেঁসো।

এই দৃশ্যের সম্মুখে সমস্ত জনতা নিশ্চল, নিস্তব্ধ। আশপাশ হইতে শোনা যায় কেবল হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি। লোক আসে দলে দলে। এখানের নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় আসিয়া সকলেই যায় চুপ করিয়া।

বুড়া অমৃত জানা কোথায় পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল বোধ হয়। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভিড় ঠেলিয়া সে আগাইয়া আসে। মালতীর মৃতদেহটার কাছে গিয়া মুখখানাকে নাড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, ওরে আমার মাকে জল্লাদে কেটেচে রে···

মর্ম্মান্তিক সে দৃশ্য। মালতীর অর্দ্ধকর্ত্তিত গলাটার নীচে একটা হাত দিয়া, কোমরের নীচে অপর হাতটা দিয়া বুড়া নিজের কোলে মেয়েকে তুলিয়া লইয়া একহাতে বুক চাপড়ায় আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, ওরে মারে তোকে কি জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছিনু রে ··

দারোগা একজন কনেষ্টবলকে কি ইসারা করেন। সে বুড়ার কাছে আসিয়া বলে, তুমার মেয়ে আছে !

বুড়া শুনিতে পায় না। কনেষ্টবল পুনরায় তাহাকে বলে। কে শোনে তাহার কথা। বুড়া সমানে বুক চাপড়ায়। কনেষ্টবলটী ব্যথিত-ভাবে চারিদিকে তাকায়। তাহার দৃষ্টিতে ফুটিয়া ওঠে—যেন এ হইবার নয়। তারপর সে বুদ্ধি খরচ করিয়া বলে, দারোগাবাবু তুমাকে ডাক্‌ছেন।

এ্যাঁ, বলিয়া বুড়া কনেষ্টবলটীর দিকে তাকায়। কনেষ্টবলটী দারোগাবাবুর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দেয়। বুড়া মেয়েকে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া দারোগাবাবুর দিকে যায়। দারোগাবাবু বলেন, বসুন।

বুড়া দারোগাবাবুর পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া কপালে করাঘাত করে। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করেন, আপনার মেয়ে ?

হ্যাঁ বাবা, বলিয়া বুড়া দারোগাবাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরে। দারোগাবাবু 'না' 'না' করিয়া উঠেন। বুড়া বলে, ঐ আমার একটীমাত্র মেয়ে বাবা—জল্লাদে কেটেচে গো···

দারোগাবাবু বুড়ার দুই হাত ধরিয়া বলে, বসুন বসুন ওর শাস্তি হবে।

আর শাস্তি! একমাত্র কন্যা, তাহার আকস্মিক মৃত্যুতে বুড়া শোকে মুহ্যমান। অশ্রুর ধারা বারণ মানে না। বুকের ভিতর যে তাহার কি হইতেছে কে জানে! এখন কি তাহার ফাঁকা কথা শুনিবার সময়? মানুষ মরিলে আর ফিরে না। শাস্তির কথায় কি শান্তি পায় সে?

দারোগাবাবু আর বসিয়া থাকেন না। নোট বুক বাহির করিয়া কি সব লিখিতে সুরু করিয়া দেন। সমবেত জনমণ্ডলীর ভিতর হইতে কয়েকজনকে ডাকিয়া ডাকিয়া নাম লিখিয়া লইতে থাকেন। নিরাপদ ছিল সাম্‌নে দাঁড়াইয়া। তাহাকে দারোগাবাবু ইসারায় কাছে ডাকেন। কয়েকজন কনেষ্টবল ভিড় ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার আসিবার পথ করিয়া দেয়। পুলিশ টুলিশ দেখিলে নিরাপদর কেমন ভয় করে। সে ভয়ে ভয়ে দারোগাবাবুর সামনে গিয়া দাঁড়ায়। দারোগাবাবু তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, শ্রীনিরাপদ ভূঁইয়া।

পিতার নাম, লিখিতে লিখিতে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করেন। নিরাপদ বলে, ৺রামপদ ভূঁইয়া।

বেশ সাকিনটা বলত, বলিয়া দারোগাবাবু তাহার দিকে তাকান। সে বলে, রতনপুর দক্ষিণ পাড়া।

থানা হ'ল তাহলে সিঙ্গুর, বলিয়া দারোগাবাবু লিখিতে থাকেন। তারপর নোট বুক বন্ধ করিয়া হাঁকেন, তেওয়ারি?

ভিড়ের বাহির হইতে উত্তর আসে, হো গিয়া হুজুর···

মিশির তোল, বলিয়া দারোগাবাবু উঠিয়া দাঁড়ান। বুড়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে থাকে। তাহারই পাশ দিয়া মিশির ও অপর একজন কনেষ্টবল মালতীর মৃত দেহটী ধরাধরি করিয়া লইয়া ভিড়ের বাহিরে একটী গরুর গাড়ীর উপরে আনিয়া তোলে।

লাস চালান হইবে শ্রীরামপুরের হাঁসপাতালে। বুড়ার যেন হুঁস হয় যে তাহার কন্যাকে লইয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে দৌড়ায় গাড়ীর দিকে। গাড়ী তখন চলিতে স্বরু করিয়া দিয়াছে। পিছনে পিছনে চলিয়াছে তিন চারজন কনেষ্টবল অমূল্যকে বাঁধিয়া লইয়া। আর তার পিছনে চলিয়াছে বিশাল জনতা। দারোগাবাবু চলিয়া গিয়াছেন আগে।

পথের দুইপাশ ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছে লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ দেখা যায় গাড়ীর সম্মুখ দিক হইতে একটি স্ত্রীলোক ও তিন চারিটী ছোট ছোট ছেলে এদিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ তাহারা গাড়ীর কাছাকাছি আসে। সকলেই হাউ হাউ করিয়া কাঁদে। স্ত্রীলোকটী বুড়া অমৃত জানার স্ত্রী। ছেলেগুলা তাহাদেরই। ছেলেগুলা কাঁদে 'দিদি' 'দিদি' বলিয়া, তাহাদের মা কাঁদে 'মাগো-মা' বলিয়া। একবার তাহারা দৌড়াইয়া যায় গাড়ীর চাকার কাছে, আবার দৌড়াইয়া যায় গাড়ীর সম্মুখভাগে। বুড়া কাঁদে এদিকে, ওরা কাঁদে ওদিকে—গাড়ী চলিতে থাকে তাহারই মাঝে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে।

মালতীর মৃত্যু সম্বন্ধে গ্রামে নানা গুজব ওঠে। সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কেউ বলে, মালতীর মত মেয়ে হয় না। উহাকে হত্যা করিয়া অমূল্য যে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত।

কেউ বলে, অমূল্য কি সাধে মারিয়াছে, নিশ্চয়ই মালতীর চরিত্রদোষ ছিল। তাহা না হইলে জলজ্যান্ত একটা মানুষকে কেহ কখনও কাটিয়া ফেলিতে পারে? প্রাণদণ্ড হইলে বুঝিতে হইবে যে এ রাজত্বে বিচার বলিয়া কোন বস্তু নাই। এই রকমের নানা যুক্তি ও গুজবের মধ্যে, অমূল্যর পাশের বাড়ীর মহেন্দ্র বেরা যাহা বলে বেশীর ভাগ লোকে তাহাই বিশ্বাস করে। রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় মালতীর সহিত অমূল্যর বচসা হইতেছিল। সেই বচসা অবশ্য মাঝখানে থামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবার সেই বচসা বাড়িয়া যায়। চেঁচামেচিতে মহেন্দ্র উঠিয়া পড়ে। মালতী এমন সময় চীৎকার করিয়া উঠে। মহেন্দ্র ও তাহার বড় ছেলে শঙ্কর দৌড়িয়া আসে, অমূল্যর আগড় ঠেলিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখে মালতীর রক্তাক্ত দেহটা তখনও দুয়ারের উপর কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করিতেছে। ইহারা পিতা ও পুত্রে স্তম্ভিত হইয়া যায়। দুয়ারের একদিকে কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলিতেছিল। তাহারই ক্ষীণ আলোকে দেখা গেল ঘরের মধ্যে অমূল্য খেজুর গাছ কাটা হেঁসোটাকে হাতে লইয়া যাত্রাদলের তরোয়াল খেলার মত ঘুরাইতেছে এবং জড়ানো জড়ানো স্বরে কোন সেনাপতি কিম্বা দিগ্বিজয়ী বীরের মত 'এ্যাক্ট' করিতেছে। মহেন্দ্র ভয়ে কাঁপিতে থাকে। কিন্তু শঙ্কর দুঃসাহসী ছেলে। প্রথমটায় সে ভড়কাইয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই সে সজাগ হইয়া ভাবিয়া লইল—এখনও অমূল্য ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। এই অবস্থায় যদি সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শিকলটা তুলিয়া দিতে পারে ত অমূল্য আর কিছু করিতে পারিবে না। তাড়াতাড়ি শঙ্কর দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া গিয়া ঘরের কবাট দু'খানা টানিয়া শিকলটা তুলিয়া দেয়। তারপর মালতীর কাছে আসিয়া তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে বাঁচিবে কিনা। বাঁচিবার নয় তাহা সে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিয়াছিল। তবুও যদি বাঁচে, সেই আশায় ভাল করিয়া

আরেকবার দেখে। এতক্ষণে যেন মহেন্দ্রের জ্ঞান ফিরিয়া আসে, সে বলে, কেটে ফেলেছে একেবারে ?

ইহার পর অবশ্য সবই সোজা। শঙ্কর নিজেই যায় থানায়। থানায় গিয়া দারোগাবাবুকে খবর দেয়।

আজ মহেন্দ্র ও তাহার ছেলে শঙ্করের কথা সকলের মুখে। দারোগাবাবু তাহাদের সহিত বহু কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। গ্রামের এমন অনেক লোক যাহারা বহুদিন তাহাদের সাথে কথা বলে নাই, তাহারাও কহিয়াছে। কিন্তু ইহা ত হইল—হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বহু কথা রটিতেছে, আরও রটিবে, গ্রামবাসীদের মুখে মুখে নিত্যনূতন ভাবে এই কাহিনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে ; অনেকে হয়ত মহেন্দ্র ও শঙ্করের মুখের কথাতেই চুপ করিয়া যাইবে, কিন্তু যে ঘটনা ইহাদের কেহই জানে না, হত্যাকাণ্ডের সেই মূল রহস্যের উদ্ঘাটন করিবে কে ?

সেদিন আর কোন কাজকর্ম্ম হইল না। কোন কিছুতেই যেন আর কেহ মন লাগাইতে পারিতেছে না। গ্রামের বারোয়ারীতলা, ষষ্ঠীতলা প্রভৃতি জায়গাগুলিতে লোক জটলা করিয়া কত কি বলিতে থাকে। তারপর এদিকে ওদিকে কাহারও বাড়ীর সম্মুখে অনেকে দল বাঁধিয়া মালতীর নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের কথা আলোচনা করে। বনমালী অনেক আগেই বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল ; তাহারই খানিক পরে নিরাপদ আসিয়া পৌঁছায়। দাওয়ার একদিকে বসিয়া বসিয়া উভয়ে ঐ একই কথা আলোচনা করিতে থাকে। দিগম্বর অবস্থায় খেঁদি একদিকে কতকগুলো খুরী ও ভাঙ্গা নারিকেলের মালা লইয়া তাহার খেলাঘরের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে থাকে। মাঝে মাঝে পিতাকে আসিয়া জ্বালাতনও করিয়া যায়। বলে, বাবা কাবে ত তাল নিয়িতি ?

বনমালী বলে, খাব।

খেঁদি স্বভাবতই যেন খুব ব্যস্ত। সংসারে তাহার বহু কাজ।

সকলকে ডাকিয়া না খাওয়াইলে হয়ত কাহারও খাওয়া হইবে না। পাঁচ বছরের মেয়ে খেঁদি, মায়ের দেখাদেখিই বোধ করি এটুকু শিখিয়াছে। নিরাপদর কাছে আসিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে বলে, কাকা কাবে ত তোমাল্‌ও তাল নিয়িতি ?

আত্‌তা, খেঁদির কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া নিরাপদ বলে। খেঁদি হন্তদন্ত হইয়া চলিয়া যায়।

সিক্তবসনে কক্ষে একটা পিতলের ঘড়া লইয়া কাঁদন বাড়ীর ভিতরে আসে। সে স্নান করিতে গিয়াছিল। রান্নাঘরের আগর খুলিয়া ঘড়াটাকে ভিতরে রাখিয়া আসে। উঠানে আসিয়া গামছাটাকে বুকের উপর হইতে টানিয়া লইয়া, নীচু হইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া পায়ের উপর জল ফেলিয়া শয়ন-ঘরের দিকে চলিয়া যায়। ঘরে শিকল দেওয়া ছিল। শিকলটা খুলিয়া সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে।

নিরাপদ বলে, আজ কোনো কাজ-টাজ হবে নাকি বনমালী ?

কি করে আর হবে, বলিয়া বনমালী নিরাপদর মুখের দিকে তাকায়।

নিরাপদ বলে, তাই জিগ্যেস করছিলুম।

না আজ আর কাজ-টাজ করা সম্ভব নয়, বলিয়া বনমালী প্রকাণ্ড একটা হাই তোলে। এ হাই আর কিছুই নয় তামাক খাইবার পূর্ব্বাভাষ। নিরাপদ ইহা বুঝে। সে বলে, তবে খানিক তামাক সাজা যাক্।

বনমালী উৎসাহভরে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ছিলিমখানেক সাজ।

কাঁদন কাপড় ছাড়িয়া ভিজা কাপড়টাকে হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসে। আসিবার সময় বলে, বাবা পুরুষ মানুষকে আর বিশ্বাস নেই।

নিরাপদ তামাক সাজিবার জন্য উঠিয়াছিল। কাঁদনের কথা শুনিয়া সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। কাঁদন বনমালীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মুচকাইয়া হাসিয়া বলে, কোন দিন কেটে ফেলবে।

বনমালীও মুচকাইয়া হাসে। বোকা নিরাপদ শুধু বলিয়া উঠে বৌঠানের এক কথা। তারপর সে তামাক সাজিতে গিয়া দেখে হুঁকা নাই। তাহার মনে পড়িয়া যায় হুঁকা সকালে রাখিয়া আসিয়াছে সে তাহার ঘরে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যায় সে হুঁকা আনিতে।

স্নানকরা কাপড়টাকে ধুইয়া উঠানে বাঁশের আলনায় টাঙাইয়া দিয়া কাঁদন রান্নাঘরে চলিয়া যায়। নিরাপদ হুঁকা লইয়া আসিয়া তামাক সাজিতে বসে।

এদিকে খেঁদি আসিয়া বনমালী ও নিরাপদকে খাইতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। বনমালী ধমক দেয়। নিরাপদ বলে, আহা যা মুখটা কাঁদ কাঁদ হয়ে গেছে।

বনমালী খেঁদির কাঁদ কাঁদ ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া বলে, আচ্ছা এখানে নিয়ে এসো—খাব।

খেঁদি নাকি স্বরে বলে, খাবে ত ?

হ্যাঁ, বনমালী ঘাড় নাড়িয়া জানায়। নিরাপদ উঠানের একদিকে গিয়া খড়ের একটা নুটি করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া কলিকার উপর দিয়া হুঁকায় টান দিতে সুরু করিয়া দেয়।

খেঁদি তাহার কাদার ভাত, খোলামকুচির মাছভাজা ও বনপালমের ডাল্না মাটীর থালায় করিয়া আনিয়া দেয়। বনমালী ও নিরাপদ মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া খাওয়া শেষ করিয়া ফেলে। কাঁদন দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখে এই কাণ্ড। খেঁদি বলে, আবাল ওব্‌লা—এব্‌লা আল্ কিততু নেই।

বনমালী বলে, আত্‌তা।

কাঁদন রান্নাঘর হইতে বলে, পাকা মেয়ে।

খেঁদি চলিয়া যায়। আসে তার বদলে তার মা। বলে, বেলা হ'ল অনেকখানি, দুটো কিছু খেতে দিই তোমাদের।

বনমালী বলে, না চান্ ক'রে আসি, বরং খেতে দাও। ও বেলা মিটিং শুন্‌তে যেতে হবে।

হ্যা মিটিং, নিরাপদর মনেই ছিল না। সেও যাইবে। মিটিংএর কথায় বেশ একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয় নিরাপদর মধ্যে।

কাঁদন তেল আনিয়া দেয়। বনমালী ও নিরাপদ তেল মাখিয়া গামছা কাঁধে স্নান করিতে যায়।

দেখিতে দেখিতে হু হু করিয়া বেলা কখন বাড়িয়া আসিয়াছে। বৈশাখের রুদ্ররূপী আকাশ নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছে। বনমালী ও নিরাপদ পথের পাশ দিয়া ঘাসের উপরে উপরে চলিতে থাকে। পথের ধূলা বালি অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে, পা ফেলিবার জো নাই। গরমের আঁচে ঝলসিত তৃণলতাদির গাত্রোত্থিত আরেক রকমের উষ্ণতা অনুভব করিতে করিতে তাহাদের নাক জ্বালা করিয়া উঠে। পুষ্করিণীতে আসিয়া পৌছিলে দেখে উপরের জল গরম কিন্তু নীচে বেশ ঠাণ্ডা। জলে ডুব দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা স্নান করে। আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিবার খোরাকও পাওয়া গিয়াছে। ঘাটে আরও অনেকে স্নান করিতে আসিয়াছে। সকলেই আলোচনা করে মালতীর কথা। পল্লীগ্রামে ইহাই সম্বল। একটা কিছু অঘটনকে ঘটিতে দেখিলে মুখে মুখে কত রকম হইয়া তাহা কতদিন পর্য্যন্ত যে মানুষের অলোচ্য বিষয় থাকে, তা না দেখিলে বুঝা যায় না, আজ ত সবে ইহার স্থরু হইয়াছে।

একঘাট লোক যখন ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে থাকে শঙ্কর আসে স্নান করিতে। শঙ্করকে দেখিতে পাইয়া সকলে তাহাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। শঙ্কর অতঃপর যতটুকু জানিয়াছে ততটুকু ত বলেই এবং যাহা ঘটে নাই আর যাহা সে জানেও না, তাহাও নানা কল্পনার রঙে রাঙাইয়া সে বলিয়া যায়। কিন্তু বেচারা

ইহাতেই আরও বিপদে পড়িয়া যায়। সে বলে, মালতীর চরিত্র বিশেষ ভাল ছিল না, অমূল্য অনেকদিন হইতেই স্ত্রীকে সন্দেহ করিতেছিল। এমন কি অমূল্য অনেক সময় তাহাকে একথা বলিয়াছে পর্য্যন্ত। কিন্তু কি হইবে তাহাতে, ভাগ্যলিপি ত আর পরিবর্ত্তন করিবার নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কথাতেই লোকে সন্দেহ করিয়া বসে—হইবে মালতীর চরিত্র নষ্ট, এবং ঐ স্থলে অমূল্যর বাড়ীর পাশে যেখানে মহেন্দ্র বেরার বাড়ী ছাড়া আর কাহারও বাড়ী নাই তখন মালতীকে নষ্ট চরিত্র হইতে হইলে নিশ্চয়ই সে শঙ্করের সহিত জুটিয়া থাকিবে। তাই হয়ত স্ত্রীর এই কাহিনী জানিতে পারিয়া দুঃখে ও রাগে অমূল্য তাহাকে হত্যা করিয়াছে। অন্যান্য সকলে মুখ চাওয়া-চাওই করিতে থাকে।

শঙ্করের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না উহাদের মুখ চাওয়া-চাওই। সে বলিয়া উঠে, নেশার ঝোঁকে মেরেছে।

অন্যান্য সকলে চুপ করিয়া থাকে।

এক সময়ে স্নান সারিয়া যে-যার বাড়ীর দিকে চলিতে থাকে। বনমালী ও নিরাপদ বাড়ী পৌছায়। কাঁদন বলে, তোমরা কি পুকুর কেটে নাইছিলে নাকি ?

বনমালী কোন উত্তর দেয় না। নিরাপদ বলে, কেন দেরী হয়েছে নাকি ?

না, বলিয়া একরকমের বিরক্তি প্রকাশ করে কাঁদন। ইতিমধ্যেই কাঁদন খেঁদিকে স্নান করাইয়া দিয়া, খাওয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে। এখন বনমালী ও নিরাপদকে খাইতে দিয়া সে ঘরের অন্যান্য কাজ সারিয়া লইতে পারিলে বাঁচে। গরুগুলার জাব্ দেওয়া বাকী রহিয়াছে।

বনমালী ও নিরাপদ খাইতে বসে। কাঁদন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

আহারাদি সারিয়া উহারা কিন্তু ঘুমাইতে পারে না। সকালের ব্যাপার লইয়া গ্রামের কোন দিকে কিরূপ আন্দোলন হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। অবশ্য বনমালীরই সেদিক দিয়া গরজ একটু বেশী। সে কাঁদনকে ডাকিয়া বলে, ওগো শুন্‌চ শঙ্করের সঙ্গে অমূল্যর বোয়ের সব কেলেঙ্কারী বেরিয়ে পড়েচে।

তাই নাকি, কাঁদন বলে।

বনমালী বলে, হাঁ—তুমি বলছিলে যে পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস নেই! দেখচো মেয়েদের কাণ্ডকারখানা?

কাঁদন বলে, কাণ্ডকারখানাটা কি তাই ছাই আমি জান্‌তে পার্‌লুম না, তার আর দেখ্‌ব কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ্‌বে বৈ কি—আগে সব বেরুক্‌, বলিয়া সে নিরাপদকে ইঙ্গিত করিয়া বলে, চল নীরো।

উহারা চলিয়া যায়। দরজা হইতে বাহির হইবার পথে বনমালী বলে, দরজাটা দিয়ে যাও—আমরা চললুম।

কাঁদন উঠানে নামিয়া আসিয়া উহাদের বহির্গমনের পথের দিকে বিশেষ এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। কি যেন বলিয়া গেল তাহার স্বামী। পুরুষও সন্দেহ করিতে জানে তাহা হইলে! না বাপু, এবার সে ঘর বাঁধিয়া লইবে। সন্দেহ করিতে আর কতক্ষণ! আবার সে ভাবে, সন্দেহ আবার কি? যে ভালবাসিতে জানে তাহাকে সন্দেহ করিবে কে?

দুপুরের সেই রৌদ্রতপ্ত উঠানের মাঝে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদন আরও কত কি ভাবে। তাহার মনে পড়িয়া যায় শৈশবের রঙিন দিনগুলি। তাহার বিবাহ তখন হয় নাই। গ্রামের ছেলেদের সাথে শীতের সকালে গায়ে কাপড় বাঁধিয়া রৌদ্রে পিঠ্‌ দিয়া মুড়ি-খাওয়া, ফাল্গুনের প্রভাত-বেলায় বনে বনে ঘুরিয়া বাকস ফুলের মধু সংগ্রহ

করিয়া বেড়ানো, চৈত্র দুপুরে একরাশ কাঁইবিচি লইয়া টক্কা-ফক্কা খেলা, বৈশাখের ঘুমন্ত দুপুরে কাঁচাআমের সঙ্গে নুন ও লঙ্কা মিশাইয়া আচার করিয়া খাওয়া, ঝড়ের সময় ছুটাছুটি করিয়া আমকুড়ানো, বর্ষায় পুকুরে এক-পুকুর জল হইলে ঘড়া লইয়া পা' ছুড়িয়া ধুপ্‌ধাপ্‌ করিয়া সাঁতার কাটা—এমনি কত কি কথা মনে পড়িয়া আজ কাঁদনের দুই চক্ষুকে জলে ভাসাইয়া দেয়। সে বরাবরই খুব মিশুক। বিবাহ হইলে প্রথম প্রথম সে গ্রামের ছেলে মেয়েদের কথা ভাবিত, তাহাদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইবার জন্য মনটা আকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু কবে সে জানে না, কি এক বাতাস আসিয়া তাহার কানে কানে যেন কহিয়া গিয়াছিল—তোমার এখন অন্য কাজ। সে ভাবে, সেই অন্য কাজের জন্যই বোধ করি তাহাকে হইতে হইয়াছে জননী, হইতে হইয়াছে স্নেহ ও মমতায় মহীয়সী নারী। শৈশব হইতে যেখান অবধি আজ তাহার জীবনধারা বহিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার মধ্যে কি অঘটনই না ঘটিয়া গিয়াছে! অথচ তাহা কয়টা দিনেরই বা! এই সামান্য দিনের মধ্যে যে অসামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা যেন আজ স্পষ্ট করিয়া কাঁদন দেখিতে পায়। এতকাল তাহার চক্ষে পড়ে নাই। জলস্রোতের মত, প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্যের মত মানুষের জীবনেও যে এম্‌নি করিয়া পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কাঁদনের বুকের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠে। তাহা হইলে যাহা ঘটে নাই তাহাই বা ঘটিতে কতক্ষণ! সে মিশুক সত্য কিন্তু না মিশিয়া যে থাকিতে পারিবে না তাহা ত নহে। এম্‌নি করিয়াই ত সে একদিন তাহার শৈশব সাথীদের ভুলিয়াছে। তাহার যে বয়স সে-বয়সে মেলামেশা করাটা নেহাৎ কুৎসিত হইলেও মন ত শুনেনা! তবু মনকে শুনাইতে হইবে, কেননা সংসার-যাত্রার ইহাই রীতি, বিশেষ করিয়া এই পল্লীগ্রামে। তাহাই সে করিবে। ঘাড় নাড়িয়া কোন্‌ মহাশক্তির উদ্দেশ্যে সে যেন মনে মনে

বলিয়া উঠে—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। যে প্রয়োজনে একদিন জীবনের স্বপ্নমাখা দিনগুলি হইতে সরিয়া আসিয়া, মাটীর পৃথিবীর বুকে সংগ্রামময়ী জননীরূপে নিজেকে রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছে ঠিক সেই প্রয়োজনেই সে আজ নিজেকে বনমালীর যুবতী স্ত্রী না রাখিয়া. বনমালীর গৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ঘুচিয়া যাইবে সকল কিছুর সংশয়-সন্দেহ কাণাকাণি। নিরাপদকে ত তাহারা ফেলিতে পারিবেনা যে তাড়াইয়া দিবে, তাহাকে সংসারী করিয়া তাহার নিজস্ব দীপ্তিতে ফুটিতে দিবে। ব্যস তাহা হইলে অন্ততঃ কাঁদন বাঁচিবে।

কাঁদন কতক্ষণ যে তপ্ত উঠানের উপর দাঁড়াইয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। খেয়াল হইল তখন যখন সে দেখিতে পাইল, পায়ের নীচে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিয়া যায়। সে আগাইয়া যায় রান্নাঘরের দিকে। তারপর কি মনে হয়, গোয়াল ঘরের দিকে যায় গরুগুলাকে জাব্ দিয়া তবে রান্নাঘরে আসে।

নিরাপদ আসিয়া উঠে পাঁচুদাসের বাড়ী। দুপুরের আহারাদি শেষ করিয়া এঁটো বাসন লইয়া সুশীলা যাইতেছিল ঘাটে। উঠানে নিরাপদকে দেখিতে পাইয়া বলে, ব'স।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, পাঁচুখুড়ো কোথায় ?

বাবা এই বেরুল, বলিয়া সুশীলা ঘাটের দিকে চলিয়া যায়। রান্নাঘর হইতে সুশীলার মা বাহির হইয়া আসিয়া বলে, বাবা মাদুরটা টেনে নিয়ে ব'স দোরে—সক্‌ড়িহাত আমার।

বস্‌ছি, বলিয়া নিরাপদ দাওয়ার উপরে উঠিয়া আসে, নিজেই দুয়ারের এক কোণে জড়োকরা মাদুরটাকে টানিয়া লইয়া ভাল করিয়া পাতিয়া বসিয়া পড়ে।

সুশীলার মা জিজ্ঞাসা করে, খাওয়া দাওয়া হয়েছে গো ছেলে ?

হ্যাঁ খুড়ীমা, বলিয়া নিরাপদ রান্নাঘরের দিকে তাকায়। সুশীলার মা বলে, না হয় তো আমাদের শাক্-ভাত দুটো খাওনা ?

না খুড়ীমা। সুশীলার মা বলে, তাহলে চুপক'রে বসে থাকো—আমি দুমুঠো খেয়ে নিই।

নাও, নিরাপদ বসিয়া থাকে।

নিরাপদ কেন আসিল এখানে ? সে ত বনমালীর সাথে অন্যত্র কোথাও যাইতে পারিত ? বনমালীর সাথেই ত সে বাহির হইয়াছিল। কেন গেলনা সে ? বনমালী ও সে দুইজনে যখন [illegible] বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল তখন কি সে মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছিল যে সে পাঁচুদাসের বাড়ীতে আসিবে ? তাহা যদি স্থির না করিয়া থাকে তবে কে তাহাকে এখানে লইয়া আসিল ?

গ্রামের পথ যখন রৌদ্রালোকে খাঁ খাঁ করিতেছিল পথের পাশে বাব্‌লা গাছের সারিতে যখন দখিনা-বাতাসের দোলা লাগিতেছিল, গ্রামের বাঁশঝাড় গুলা যখন সির্ সির্ করিয়া হেলিতেছিল দুলিতেছিল, যখন কোকিল ডাকিতেছিল দিক্-দিগন্তের বনে বনে—তখন যে-মায়ার ইঙ্গিতে সে এখানে আসিল, তাহা কি ?

নিরাপদ বসিয়া থাকে চুপ করিয়া। সুশীলা সেই যে ঘাটে গিয়াছে বাসন মাজিতে, এখনও ফিরে নাই। সুশীলার মায়ের খাওয়া শেষ হয়। সেও বাসন লইয়া যায় পুকুরে। নিরাপদ একা একা বসিয়া চাহিয়া থাকে বাড়ীর পাশের কাঞ্চন গাছটার দিকে। লাল লাল ফুলগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। নিরাপদ কি ফুলেরই সৌন্দর্য্য দেখে ? আরও দূরে কয়েকটা বড় বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ প্রকাণ্ড একটা ছাতার মত সেখানটাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণচূড়া ফুল আজকাল আর তেমন ফোটেনা—সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন মাত্র দু'এক ঝাঁক ফুল মাঝে মাঝে গাছগুলার এ-কোণে

ও-ঝোপে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরকম কয়েকটা ঝাঁকের কল্পনা করিতে করিতে নিরাপদ কৃষ্ণচূড়া গাছগুলার দিকে তাকায়।

এমনি করিয়া কতক্ষণ কাটিয়া যায় সুশীলা তবুও পুকুর ঘাট হইতে ফিরেনা। নিরাপদ যেন মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠে। এরকম করিয়া দুপুরবেলা কোন গৃহস্থের বাড়ীতে একা একা বসিয়া থাকাটা যেন কেমন কেমন ঠেকে নিরাপদর। ইহারা যদি অন্য কিছু ভাবে! কি ভাবিবে ইহারা ?

নিরাপদর মন উঠি উঠি করে। আলস্যভরে হাত দুইটাকে আঙ্গুলে আঙ্গুলে জড়াইয়া মাথার উপরে লইয়া গিয়া হাই তুলিয়া নিরাপদ পা' দুটাকে ছড়াইয়া দেয়। তারপর চোখ রগড়াইয়া লইয়া ফতুয়ার পকেট হইতে বিড়ি-দিয়াশলাই বাহির করে। বিড়ি ধরাইয়া টান লাগাইতে লাগাইতে মনের চাঞ্চল্যকে চাপিয়া রাখে।

উহারা মায়ে-ঝিয়ে বাসন মাজিয়া ফিরিয়া আসে। নিরাপদ বলে, খুড়ীমা কখন তোমরা গেছ্‌লে গো ?

কেন আমাদের কি দেরী হয়েছে, সুশীলা বলিয়া উঠে। নিরাপদ তাহার দিকে তাকাইয়া বলে, না দেরী মোটেই হয়নি।

সুশীলার মা বলে, আমার আর দেরী কি বাবা—দেরী ক'রেছে সুশীলা।

সুশীলা বলিয়া উঠে, তেমনি কতগুলো বাসন মাজ্‌তে হ'য়েছে।

এ যেন সুশীলার কৈফিয়ৎ দেওয়া। নিরাপদ বলিয়া উঠে, আমি চলি খুড়ীমা—

খুড়ীমা বলে, সে কি বাবা এই ত এলে!

সুশীলা বাসনগুলা ঘরে তুলিয়া রাখিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলে, পান সাজি!

নিরাপদ বলে, আমাকে আবার যেতে হবে।

যেও'খন, বলিয়া সুশীলার মা ঘরে যায়। পান সাজিতে সাজিতে সুশীলা বলে, হ্যাঁগা লাস্‌তো চালান হ'ল হাঁসপাতালে—তার পর কি হবে আর ?

নিরাপদ বলে, কাদের ঐ অমূল্যের ব'য়ের ?

সুশীলা বলে, হ্যাঁ—এবার বোধহয় কাট্‌-ফোঁড় ক'র্‌বে ?

নিরাপদ বলে, হ্যাঁ ঐসব কর্‌বে আর কি !

সুশীলা ইহার পর আক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে, আহা ছুঁড়ীর কপালে শেষকালে এইরকম মিত্তু হ'ল ?

সুশীলার মা বলে, যার যা' কপালের লিখন !

সুশীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে যেদিন বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন মা তাহার এম্‌নি করিয়া ঐ একই কথা বলিয়াছিল। ভগবান ! কপালের লিখন কি বদ্‌লানো যায় না ? যদি না যায় ত এরকম লেখ কেন ? চোখদুটা জলে ভরিয়া আসিতে চায়। সুশীলার কিন্তু অনেকদিন এরকম হইয়াছে—আজকাল তাই জল আর আসেনা।

নিরাপদ উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারেনা। একবার মনে হয় উঠিয়া চলিয়া যায় আবার মনে হয় না বসিয়া থাকিতে বেশ ত লাগিতেছে। যাইবার তাহার প্রয়োজন রহিয়াছে—দল বাঁধিয়া সকলে মিলিয়া সভায় যাইবে। অথচ সে যাইতে পারেনা। কি এক অদৃশ্য শক্তি সুশীলাদের বাড়ীতে তাহাকে যেন বাঁধিয়া রাখিতে চায়। নিরাপদ কি পারেনা সেই বাঁধন ছিঁড়িয়া পলাইতে ?

নিরাপদ বলে, আমাকে যেতে হবে খুড়ীমা আমি চলি—

সুশীলা বলে, এই যে পান দিই।

পান সাজা হইলে ঘরের মেঝের একদিকে মাদুর-পাতিয়া তাহার উপর ধপাস্‌ করিয়া একটা বালিশ ফেলিয়া দিয়া, সুশীলা একটা রেকাবীতে করিয়া দুখিলি পান আনিয়া নিরাপদর সম্মুখে রাখিয়া যায়।

নিরাপদ পান দু'খিলি তুলিয়া লয়। সুশীলা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে। সুশীলার মা আরেকদিকে শোবার বন্দোবস্ত করে।

দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলার উপরে চার পাঁচটা শকুনি আসিয়া বসে। তাহাদের ডানার ঝাপ্‌টা শুনিয়া নিরাপদ সেদিকে তাকায়। পান চিবাইতে চিবাইতে ভাবে, এইবার সে যাইবে। কিন্তু সুশীলা যেন কি বলিবে বলিয়া বোধ হয়।

এম্‌নিই কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর নিরাপদ বলে, আমি চল্‌লুম খুড়ীমা—

এসো বাবা, বলিয়া সুশীলার মা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। নিরাপদ উঠানে নামিয়া পড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

সুশীলা ত তেমন করিয়া কথা বলিলনা নিরাপদর সাথে। অথচ সে যে অনেক কথাই বলিবে এইরকম একটা ধারণা ছিল নিরাপদর মনে মনে। পথে যাইতে যাইতে নিরাপদ ভাবে, কথা তেমন করিয়া না বলুক কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলিয়া কি কিছু নাই? পরশু রাত্রে সুশীলা যখন বাড়ী আসিতে পারিতেছিলনা তখন সে যদি না থাকিত তবে কে তাহাকে লইয়া আসিত? পরশুর পর তাহার সাথে এই প্রথম দেখা! অথচ সুশীলা সে সম্বন্ধে একটীও কথা কহিল না, এতটুকু কৃতজ্ঞতা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলনা। উপরন্তু যেন তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াই সে শুইয়া পড়িল।

নিরাপদ যেন তাহার ঘরের উদ্দেশ্যেই চলিতেছিল হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল আজ আশুরায়ের সভা। সে পা' চালাইয়া সেদিকেই চলিতে থাকে।

পল্লীগ্রামের সূর্য্যাস্তের মধ্যে বেশ একটা যেন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়া যায়। সারা আকাশ ও বিপুলা প্রকৃতিকে রাঙারঙে রঞ্জিত করিয়া দিয়া দিনমণি ডুবিয়া যান। ধীরে ধীরে সেই রঙ হইয়া আসে

ফিকা—তারপর এক সময় তাহা শুধু একটা বর্ণহীন দীপ্তিতে পরিণত হয় এবং তাহারই পটভূমিতে অঙ্কিত হয় রাত্রিজগতের চিত্র। আসে সন্ধ্যা, আসে অন্ধকার, অসংখ্য নক্ষত্র আর অসংখ্য জীব। বিস্মৃতি আসে দিনের পথিকের। পল্লীগ্রামের মাঠে বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখার সময় বেলা-শেষের গানই শুধু কানে বাজে আর এইটুকুই এখানকার বিশেষত্ব।

নিরাপদর মিটিং শুনিতে ভাল লাগে নাই। সে আসিয়া মাঠে বসিয়াছিল। আজ সে একটুখানি নিভৃতে বসিয়া জীবন যে কি তাহা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কে জানে সে কি দেখিতে পাইল!

কখন সন্ধ্যা আসিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করে। নিরাপদ মাঠ হইতে উঠিয়া গিয়া সভার একদিক দিয়া বনমালী যেখানে বসিয়াছিল সেইখানে উপস্থিত হয়। সদ্য ইউরোপ প্রত্যাগত, মনীষিবৃন্দ, উষাদেবী প্রভৃতির গান ও বক্তৃতার মধ্যদিয়া আশুরায়ের সভা শেষ হইয়া যায়। সভায় বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। সভান্তে সকলে কলরব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতে থাকে। সভা যখন হয় নাই তখন আলোচ্য বিষয় ছিল মালতী, অমূল্য ও শঙ্করের কাহিনী, সভা যখন শেষ হইল, তখন আলোচ্য বিষয় হইল আশুরায়, তাঁহার কন্যা উষা ও 'মনীষিবৃন্দ'দের বক্তৃতা।

পথে সেই সকল কথাবার্ত্তাই চলে। বর্ম্মণদের গাড়ী লইয়া যায় যে কালি সামন্ত সে বলে, হ্যাঁহে বনমালী ও মেয়ের এখনও বে' হয়নি?

বনমালী উত্তর দেয়, না।

কালি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। বলে, চার পাঁচ ছেলের মা হয়ে যেত যে হে?

আরে ভাই ওসব লেখাপড়া জানা মেয়ে—ওরা কি বিয়ে করে তাড়াতাড়ি: বনমালী পথ চলিতে চলিতে বলে। কালি বলে, আমাদের বড় বো'য়ের চেয়ে ও যে বড় হবে। বড় বউ অর্থে কালির বড়দাদা হারুর বউ। বড়দাদা তাহার জাঠ্‌তুতো ভাই, তাহার আপনদাদার

অপেক্ষা সে দশ বৎসরের বড়। তাহারই বউ স্বর্ণ—স্বর্ণের পাঁচটী ছেলেমেয়ে। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কালি একথাও বলে। ইহা শুনিয়া জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে।

জনতা ক্রমশঃ বাগ্দীপাড়ায় প্রবেশ করে। বাগ্দী পাড়া পার হইয়া, কৈবর্ত্তপাড়া দিয়া নিরাপদ ও বনমালীকে যাইতে হইবে দক্ষিণ পাড়ায়।

ব্রজ কোথায় ছিল, হন হন্ করিয়া জনতাকে ধরিয়া ফেলে। পিছন হইতে সে বলিয়া উঠে, কি হে সভা সব কেমন শুন্‌লে ?

ব্রজর কণ্ঠস্বর পাইয়া নিরাপদ পিছন ফিরিয়া তাকায়। বলে, কে ব্রজভাই নাকি ?

ব্রজ উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

ব্রজর পাশে ছিল বাগ্দীপাড়ার মোড়ল হীরু। হীরুকে দেখিতে পাইয়া ব্রজ বলে, কিগো জ্যাঠা মিটিং কি রকম শুন্‌লে ?

জনতার মধ্য হইতে কেউ কেউ দাঁড়াইয়া পড়ে। হীরু ঈষৎ হাসিয়া বলে, শুন্‌লে ত বাপু ভালমন্দ কিছু বুঝতে পারি না।

ব্রজ প্রশ্ন করে, কেন কেন জ্যাঠা ?

বুড়া হীরু বলে, যতই যা কর বাপু, ভাগে জমি দিয়ে ওদের মতন আর কেউ ঠকিয়ে নিতে পারে না।

কেন কি ঠকিয়েছে ওরা, ব্রজ বলে। বুড়া বলিবার উপক্রম করে। জনতার মধ্যে যাহারা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল তাহাদের বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতের কেউ কেউ আগাইয়া যাইতেছিল—পিছনের লোকগুলা হাঁকডাক করিয়া তাহাদের কাহাকে থামিতে বলে। হাঁকাহাঁকিতে সমস্ত জনতাটাই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে থামিয়া যায়। বুড়া বলিতে থাকে, ধান যতই ফলুক তাকে দু'ভাগ ওরা কিছুতেই কর্‌তে দেবে না, সবটা ঘরে নিয়ে তুল্‌বে।

কি রকম, অসহিষ্ণুভাবে ব্রজ প্রশ্ন করে।

হীরু উত্তর দেয়, শোন বাবা বেরজো—এই বছরের কথাই বলি। এবার পাঁচ বিঘে ভাগে দিয়েছিল মিত্তিররা। প্রায় পঞ্চাশ মণ ধান হয়েছিল। আধাআধি বক্‌রা হবার সময়ে ওরা বল্‌ল পাঁচ বিঘেতে পনরমণ ক'রে করলে পঁচাত্তর মণ হবে। তার অর্দ্ধেক সাড়ে সাঁইত্রিশ মণ ধান আমাদের প্রাপ্য বলে বাকী সাড়ে বার মণ ধান আমাকে দিয়ে সব নিয়ে চ'লে গেল। অথচ সারা বছরটা হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে আমিই ওগুলো ফলিয়েছিনু!

ব্রজ মিটিংএর আনন্দেই ভরপুর। কিসে কি হয় তখন তাহার জ্ঞান নাই। সে ঝোঁকের মাথায় বোকার মত জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, তাতে কি হয়েছে?

বুড়া হীরু, জীবনে সে অনেক ঠকিয়াছে, কথার জালে জড়াইয়া আজকাল তাহাকে ঠকানো শক্ত। সারাজীবনে সে অনেক দেখিয়াছে এবং তাহারই তিক্ত-অভিজ্ঞতার কথা আজ বুঝিবা তাহার মুখ দিয়া ব্যক্ত হইয়া পড়ে। বুড়া বলে, কি হয়েচে? জাননা! আমি বুকের রক্ত জল ক'রে খাটুনী করে যাব আর আমাকে চোর সাব্যস্ত করে চোখ রাঙিয়ে সব টেনে নিয়ে যাবে? শিক্ষিত লোকের কি এই ধর্ম্ম? নেই বা করলুম ওদের জমি। অত 'মাটী' 'মাটী' করে লোভ দেখাবার কি দরকার?

উপস্থিত জনতা শোনে সমস্ত কথা। আশুরায় তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—'মাটীই আমাদের জননী। এই মাটীকে যদি আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের কোনই অভাব অভিযোগ থাকিবে না। আমাদের দেশের অবনতি হইয়াছে এই মাটীকে ত্যাগ করিয়া। পল্লীমায়ের শ্যামলছায়া হইতে যে সকল শিক্ষিত লোক আজও দূরে সরিয়া আছে, তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে গ্রামে। গ্রামে আসিয়া শিক্ষিত শ্রেণীকে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে, তবেই আমাদের উন্নতি নতুবা দিন দিন আমাদের মরণের পথে অগ্রসর হইতে

হইবে।' সমস্ত জনতা আশুরায়ের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার দেশপ্রীতি, পল্লীপ্রীতির কথা শুনিয়া সকলে মনে মনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছিল কিন্তু এই বুড়া হীরু বাগ্দীই বোধ করি এক কথায় তাহা নষ্ট করিয়া দিবে ; সকলের মনে আশুরায়ের প্রতি একটা অপ্রীতিকর ধারণা জন্মাইয়া দিবে। তাই ব্রজ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠে, জ্যাঠা মিত্তিররা ও-রকম হতে পারে বটে কিন্তু এ আশুরায় অমনতরো লোক নয়। লোকটাকে দেখলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে।

বরাতে যা' আছে তা হবেই—লোক ভাল আর মন্দ, বলিতে বলিতে হীরু বাড়ীর দিকে যাইতে থাকে। হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া ওঠে, ওহে বেরজো চলে গেলে নাকি ? দাঁড়াও না একটু—

ব্রজ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছিল। সে বলে, ঐখান থেকেই বল আমি শুনছি।

আশুরায়ের কথা যদি বললে বাবা তবে শোন—এইত আমার দু'খানা ঘর পাশেই গোবিন্দর বাড়ী। গোবিন্দর হালটা কি করেছে দেখেছ ? বলিয়া বুড়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া উত্তরের আশায় থাকে।

ব্রজ বলে, কি ?

ঐ ভাগে চাষ করিয়ে নিয়ে সব নিজের পেট্টায় নমঃ, বলিয়া হীরু খিল খিল করিয়া হাসে। তারপর বলে, যাও তুমি যাও বেরজো। সন্ধ্যে হ'য়ে এল। ছোঁড়াটা সারাটা বছর এর তার দোরে মেগে পেতে কাটালো। আহা-আ দেখলে মায়া হয়।

হীরু চলিয়া যায়। জনতাও চলিতে থাকে। সারা পথ কে কেমন বক্তৃতা দিল তাহারই হয় সমালোচনা।

কৈবর্ত্ত পাড়ায় আসিলে কে একজন যেন কাহাকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ হে অমূল্যর কি ফাঁসী হবে ? সে বুঝি সভার খবর জানিত না, জানিলে সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিত।

ব্রজ লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠে, কে অতুলদা' নাকি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলিয়া অতুল কিছুদূর আসে। তারপর বলে, আমি ছিলুম না কিনা, এই আস্ছি কলকাতা থেকে। অমূল্যর কি খবর বলত ?

ব্রজ সংক্ষেপে জানাইয়া চলিতে থাকে বাড়ীর উদ্দেশ্যে। কৈবর্ত্ত পাড়াতেই তাহার বাড়ী।

বাড়ীর কাছে আসিয়া বনমালী বলে, নীরো তামাক কিনতে হবে রে তামাক নেই।

আচ্ছা আমি ঘোষেদের দোকান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি—তুমি যাও, বলিয়া নিরাপদ সোজা দোকানের উদ্দেশ্যে চলিতে থাকে।

ঘরে ঘরে তখন শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। গৃহবধূরা প্রদীপ লইয়া তুলসী তলায় আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। নীড়হারা পাখীর দল হয়ত বাসার উদ্দেশ্যে তখনও চীৎকার করিতেছে। সান্ধ্য বাতাস ধীরে ধীরে গাছের পাতাগুলিকে দোলা দিয়া কোন্ কর্ম্মশ্রান্ত কৃষাণের স্বেদোক্ত ললাটে জননীর মত কোমল হস্তে অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষা লেপিয়া দিতেছে। বনমালী এমন সময়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে।

কাঁদন সবেমাত্র তুলসী তলায় প্রণাম জানাইয়া আসিয়া গৃহের ভিতরে গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে নতি জানাইতেছিল। বনমালী আসিয়া দাঁড়ায় তাহার পিছনে। পশ্চাতে চাহিতেই কাঁদন বনমালীকে দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠে। প্রথমটায় তাহার মনে হইয়াছিল অন্য কেহ বুঝি ! তাই তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে, বনমালীকে সঠিকভাবে জানিতে পারিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠে, ওগো তুমি যা হয় একটা বিলি বন্দোবস্ত কর।

বেচারা বনমালী। স্ত্রীর এই আকস্মিক ও অদ্ভুত আচরণে ভড়কাইয়া

যায়। কি হইল কাঁদনের যে সে এমন করিতেছে? বনমালী কিছুই স্থির করিতে পারে না। কাঁদন স্বামীর পা জড়াইয়া কেবলই কাঁদিতে থাকে। এমন সে কান্না যে পাঁচ বছরের মেয়ে খেঁদিকেও অভিভূত করিয়া ফেলে। দুয়ারের একদিকে সে তাল পাতার বিনুনী করা চেটাইয়ের উপর বসিয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল, মুড়ি ফেলিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

কাঁদন বলে, ঠাকুরপোর একটা বিলি ব্যবস্থা কর।

কি বন্দোবস্ত, বনমালী জিজ্ঞাসা করে।

ওর বিয়ে দাও, বলিয়া কাঁদন উঠিয়া দাঁড়ায়।

একথা যে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন উঠে নাই তাহা নহে, তবে ইহার মধ্যে এমন কি আছে যে যাত্রার দলের রাণীদের মত পার্ট করিতে হইবে? কি আছে বা না আছে, তাহা বনমালী বুঝিতে পারিত যদি সে মেয়ে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিত। তাই সে না বুঝিয়া বলিয়া ফেলিতে যায়, কেন নীরো কি—

না না, কাঁদন কাঁদিয়া উঠে। বলে, পাড়াগাঁয়ে বাস করতে হয় লোকে কখন কি বলে—

এই কথা। বনমালী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। তাহাতে আর হইয়াছে কি! সে বলে, আচ্ছা তা হবে।

হবে নয় শিগ্‌গির, বলিয়া কাঁদন গাড়ুতে করিয়া জল আনিয়া স্বামীকে দেয়। তারপর বলে, তাড়াতাড়ি।

বনমালী এতক্ষণে কথাটা ভাবিতে সুরু করে। মালতীর মৃত্যুর পর গ্রামে এমন আবহাওয়ার স্বষ্টি হইয়াছে, যে-কোন কথা যাহার তাহার সম্বন্ধে উঠিলেই হইল। আর একবার এসব কথা উঠিলে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করা স্বয়ং ভগবানেরও অসাধ্য।

খেঁদি বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে, মা কাঁদছে কেন বাবা?

বনমালী সস্নেহে কন্যাকে কোলের দিকে টানিয়া বলে, অসুখ করেছে মা।

অসুখ!

নিরাপদ আসিয়া দাওয়ার নীচে দাঁড়ায়। সব কথা চাপা পড়িয়া যায়।

চাঁপা তেউড় আর নাড়িয়া বসানো হয়না। সকাল হইতেই কাঁধি নামানো, গাড়ী বোঝাই প্রভৃতি কাজকর্ম্ম সারিতেই বেলা হইয়া যায় অনেকখানি। পরদিন হাট, মঙ্গলবারের হাট।

যথানিয়মে নিরাপদ ও বনমালীকে সিংহীদের কলা লইয়া হাটে যাইতে হয়। সব কাঁধিগুলা বিক্রয় করিয়া নিরঞ্জনের হাতে পয়সাগুলি তুলিয়া দিয়া স্নানান্তে অন্নপূর্ণা ভোজনালয়ে আহার সারিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে হয়।

নিরাপদ বলে, আমি তাহলে রাধার ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি।

আয়, বলিয়া বনমালী হোটেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

নিরাপদ চলিয়া যায়। সুভদ্রা বনমালীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর বনমালী নীচে নামিতে গেলে সে বলিয়া উঠে, অ-ব্যাপারি শুনচো?

বনমালী ফিরিয়া দাঁড়ায়। সুভদ্রা বলে, তোমার স্যাঙাতের বোনটীর অবস্থা যে কাহিল হয়ে পড়েচে।

বনমালী ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। সুভদ্রা আবার বলে, রাধার গো রাধার!

রাধার—কেন কি হয়েছে, বনমালী এমনিই প্রশ্ন করে।

সুভদ্রা হাসিয়া বলে, তার মনের মানুষ যে তাকে ছেড়ে যেতে চায়।

বনমালী যেন জানে না। জিজ্ঞাসা করে, কে?

ঐ যে সেই মিন্‌সেটা—কি অমরবাবু না কি নাম, বলিয়া সুভদ্রা পা' ঘষিয়া ঘষিয়া হোটেলের দিকে যাইতে থাকে। বনমালী সুযোগ ছাড়েনা। চট্ করিয়া কয়েক পা' উপরে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, দিদি জান্‌লে কি ক'রে?

সুভদ্রা হাত উল্টাইয়া বলে, দিদি আর জান্‌বে কোত্থেকে ভাই—পাঁচজনে বলে তাই শুনি।

ও, বলিয়া বনমালী কি যেন ভাবে। তারপর বলে, দিদি বাঁচি তা'লে ছোঁড়ার বড্ড চোরপুষ্টি বেড়েছে! ওর জোরেই ত জোর নিরাপদর?

সুভদ্রার চোখেমুখে একটা হিংস্রদৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। তবু সে সন্দেহের দৃষ্টিতে বনমালীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে থাকে। বনমালী হাসিতে হাসিতে বলে, দিদি সাধ ক'রে কি তোমায় এত ভক্তি-ছেদ্দা করি!

কেন, বিস্ময়ান্বিতা সুভদ্রা প্রশ্ন করে। বনমালী বলে, এই যে মাঝে মাঝে তুমি ঠিক মনের মত খবরগুলি শোনাতে পার!

ও—এই, সুভদ্রা টানিয়া টানিয়া হাসে।

বনমালী যেন আত্মপ্রসাদের সুরে বলিতে থাকে, এইবার তোমায় দেখ্‌ব! জান দিদি ছোঁড়া আমায় কি জ্বালানই জ্বালিয়েচে?

ও লোক কেমন, জিজ্ঞাসা করিয়া সুভদ্রা চাহিয়া থাকে বনমালীর মুখের দিকে। বনমালী হাসে। বলে, নাও কথা—এতক্ষণ ধ'রে সেই কথাই তো বল্‌ছি!

বুঝ্‌তে পারিনি ভাই—মনটা তেমন ভাল নেই ব'লে একটু আন্‌মনা হ'য়ে প'ড়েছিলুম, বলিয়া সুভদ্রা নিজের সন্দেহসজাগ মনকে বনমালীর নিকট আড়াল করিয়া রাখে।

বনমালী পারিবে কেন সুভদ্রার কাছে। আজ বহুদিন ধরিয়া

চালাকি করিয়া যাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যাইতেছে তাহার কাছে পল্লীগ্রামের একজন সাধারণ চাষী পারিয়া উঠিবে কেন? লোকঠকানো সুভদ্রার পেশা। তাই সে ধরিয়া ফেলিতে পারে কোন্ লোক কি উদ্দেশ্য লইয়া ঘোরা ফেরা করিতেছে। বনমালীর কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে সে হাসিয়া লয়। তারপর কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিয়া বলে, ব্যাপারি তোমাদের ওদিকে একটু জায়গা-টায়গা দেখে আমাকে দিতে পার? আর ভাল লাগেনা এখানে!

বনমালী স্থির দৃষ্টিতে তাকায় সুভদ্রার মুখের উপর। সুভদ্রার এই প্রস্তাব একটা চালমাত্র। ইহা চাল তাহা কি বনমালী এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই? এই প্রস্তাবদ্বারাই সে যেন বনমালীকে বিশ্বাস করাইবে, রাধার নিকট হইতে অমরবাবু সরিয়া যাওয়ার মধ্যে সুভদ্রার কোন হাত নাই। বনমালী অত বোকা নয়। সে গত হাটে সুভদ্রার সহিত কথোপকথনেই বুঝিয়া লইয়াছে।

বনমালী যদি তাহাই বুঝিয়া থাকে তাহা হইলে সুভদ্রার সহিত লুকোচুরি খেলিয়া লাভ কি তাহার! ইহাতে ত তাহারই মনের কথা প্রকাশ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী।

ইহাই ঠিক। কিন্তু বনমালীর ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলিতে হইবে। যে কাজে সে হাত দেয়, তাহা সফল হইবার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বুড়া পরেশ ঠাকুর হন্ত-দন্ত হইয়া হোটেলের দিকেই আসিতেছিল। বনমালী ও সুভদ্রার দুই-জনেরই সেদিকে দৃষ্টি পড়িয়া যায়। লোকটাকে দেখিলেই ভয় করে। টাক পড়া, রোগা কদাকার চেহারা, যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় সামনের দাঁতগুলা পড়িয়া গিয়াছে! চোখে একটা কুৎসিত চাহনি, সবসময়েই যেন কোন দুরভিসন্ধি লইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। আদুল্ গা—পাঁজরা বাহির হইয়া পড়া বুকের উপর দিয়া একটা মলিন পৈতা ঝুলিতেছে। পরণের থান কাপড়খানার

কোঁচাটার অগ্রভাগটুকু পেটের দিকে গুজিয়া রাখিয়াছে। খালি পায়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হোটেলের সাম্‌নে দাঁড়ায়। বনমালীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সুভদ্রার দিকে চাহিয়া বলে, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল সুভদ্রা!

সুভদ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। বনমালী আগ্রহভরে কান পাতিয়া থাকে। পরেশঠাকুর বলিয়া উঠে, বলার মা আমার সব সর্ব্বনাশ করে দিলে!

হঠাৎ কি হইল যে পরেশঠাকুর এমন করিতেছে? বনমালী রহিয়াছে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। চোখ টিপিতেও পারেনা, বনমালী জানিলে আর রক্ষা রাখিবেনা। রাধাকে রক্ষা করিবার জন্য হয়ত এই অস্ত্রেই সে সুভদ্রাকে বধ করিবে। সুভদ্রা প্রমাদ গণে।

বনমালীর আগ্রহ বাড়িয়া যায়। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে শুনিতে চাহে। বলার মাকে সে জানে। সে যখন সর্ব্বনাশ করিয়াছে নিশ্চয় তাহা একটু ভয়ঙ্কর রকমের, কেননা বলার মা ইহাদের ভিতরের লোক।

পরেশঠাকুর বলিতে থাকে, আজ সকালে বলার-মা পুলিশ এনে ভাঁটিখানা দেখিয়ে দিয়েচে।

ভাঁটিখানা দেখাইয়া দিয়াছে! সর্ব্বনাশ! সেখানে যে বহু টাকার মাল রহিয়াছে! সুভদ্রা শিহরিয়া উঠিয়া বলে এখন উপায়।

উপায় আর কি, পরেশ বলে, আমাকে এখন স'রে পড়তে হয়।

তাই যাও ঠাকুর, বলিয়া সুভদ্রা ইঙ্গিত করে বনমালীর প্রতি। পরেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বনমালীর দিকে তাকায়।

তারপর তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়াই বলে, তুমি থাকো সুভদ্রা— হোটেল চালাও ভাল ক'রে। আর যা আয় হবে তোমার অর্দ্ধেক আমার অর্দ্ধেক কোন ভাব্‌না নেই। আমি সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে চল্‌লুম।

যদি কখনো টাকা দরকার হয় আমাকে জানাবে, পরে তোমাকে ঠিকানা দোব।

পরেশ ঠাকুর চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সুভদ্রা বলে, ঠাকুর বলার-মা যখন পুলিশ ডেকেছে তখন কি আমিও বাদ যাব?

পরেশ বলে, তোমাকে ত ধরবার কোন কারণ নেই।

এবার সুভদ্রার পালা। বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সুভদ্রা বলিতে থাকে, সে কি ঠাকুর! আমি এর মধ্যে থেকে এ্যাদ্দিন ধ'রে তোমার ভাঁটির মদ কাটিয়ে দিলুম আর এখন তুমি বল্‌ছ আমাকে ধর্‌বার কোন কারণ নেই?

আছে কিন্তু সে মামলায় টিঁকবেনা বলিয়া পরেশ কি ভাবে। তারপর আবার বলে, যদি মামলাই হয়, তাহ'লেও ত আমায় বাইরে থাকতে হবে সুভদ্রা! তা' না হ'লে মামলা চালাবে কে।

কথাটা সন্তোষজনক। সুভদ্রার আর কিছু বলিবার নাই। পরেশ বলে, বুঝ্‌তে পারলে ত কথাটা? এবার আমি চলি—দেরী ক'রে লাভ নেই।

সুভদ্রা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়। পরেশ চলিয়া যায়। বনমালী সুভদ্রার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

বাস্তবিক বলার মা পরেশঠাকুরের বহু টাকার ক্ষতি করিয়াছে। শেওড়াফুলির পশ্চিমদিকে গ্রামের কোল ঘেসিয়া কয়েকটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে কয়েকখানি চালা তুলিয়া মদের ভাঁটিখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ভাঁটিখানাটী-অতি-আধুনিক কায়দাতেই চলিতেছিল। পরেশঠাকুর যে কতখানি বুদ্ধিমান লোক তাহা ভাঁটীর কায়দা-করণ না দেখিলে বুঝা যায়না। একটা ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড পাঁচছয়টা জালার মধ্যে ভাত পচে। তাহার সহিত পরেশ আবার ভাল ভাল মর্ত্তমান কলা চট্‌কাইয়া ফেলিয়া দেয়, কোনটায় দেয় আঙুর, কোনটায় আদা—তারপর পচিয়া গন্ধ বাহির

হইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে ঢালে। সেই হাঁড়ির গায়ে পাইপ লাগানো থাকে, সে পাইপটা আবার আরেকটা হাঁড়ির সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। উনানে গন্‌গনে আঁচ দিয়া ফুটানো হইলে পাইপ দিয়া বাষ্প-আকারে পচাই জমিতে থাকে অন্য হাঁড়িটীতে। তারপর তাহাতে কিছু পরিমাণ এ্যাল্‌কোহল মিশাইয়া দিয়া বোতলে ভরিয়া কর্ক আঁটিয়া চালান দেওয়া হয় বাজারে। তাহার কোনটায় লেবেল মারা থাকে 'প্ল্যাণ্টেন' কোনটায় 'গ্রেপ্‌স্‌' কোনটায় বা 'জিঞ্জার'। পরেশের এই ভাঁটী গভর্ণমেণ্ট ডিষ্টিলারীকেও হার মানাইয়া দেয়। এম্‌নি করিয়া পরেশ ফরাসডাঙ্গার সস্তা দরের মদের সহিত পাল্লা দিয়াছে। সস্তাদরে সে যদি বিলাতীমদের মত জিনিষ সাপ্লাই করিতে পারে ত লোকে কিনিবেনা কেন? চটকলের সাহেব গুলা ত তাহার বাঁধা খরিদ্দার। এই ব্যবসায়ে পরেশের প্রায় পাঁচহাজার টাকা খাটিতেছিল। পাঁচবৎসর ধরিয়া এই ব্যবসায়ে সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে। বলার মা আজ পরেশের মূলধন পাঁচহাজার টাকা ত নষ্ট করিলই তাহা ছাড়া তাহার সাথে সাথে নষ্ট করিয়া দিল আরও কত পঞ্চাশ হাজারের স্বপ্ন! আজ পরেশের দুঃখ করিবার দিন বটে। তাহা ছাড়া ভয় রহিয়াছে আবার গ্রেপ্তার হইবার। গ্রেপ্তার হইলে যাহাকে বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা' তাহা ত ঘটিবারই সম্ভাবনা! তাই পরেশ পলাইল। সুভদ্রাকে আশ্বাস দেওয়া তাহার কতখানি সত্য তাহা সেই জানে।

বনমালী সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠে, দিদি সাবধান!

সুভদ্রা বলে, হ্যাঁ ব্যাপারি সময় বড়ই খারাপ!

সেইটুকু বুঝে চল্‌লেই ভাল হবে তা' না হ'লে আরও বেশী বিপদে পড়্‌বে, বলিয়া বনমালী চলিয়া যায়। সুভদ্রা সেইখানেই দাঁড়াইয়া

থাকে। কি যেন ভাবে, বনমালী কি তাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে শাসাইয়া গেল ?

গাড়ীগুলা ঠিক করিয়া বনমালী তাহার গাড়ীটার উপর চট্ বিছাইয়া শুইয়া থাকে। বেলা গড়াইয়া গিয়াছে অপরাহ্নের দিকে। সূর্য্য অস্ত যায় যায়। গাছের কচি কচি পাতাগুলি মৃদুবাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইতে থাকে।

সরকারমশায়ের সাথে গল্প করিতে করিতে নিরাপদ ফিরে। বনমালী নিরাপদর গলা পাইয়া উঠিয়া বসে। সামনে সরকারমশাইকে দেখিয়া যুক্তকরে নমস্কার করে ও বলে, সরকারমশাই ভাল আছেন ?

সরকারমশাই তাঁহার সদাহাস্যময় মুখখানি ঈষৎ নাড়িয়া বলেন, আর ভাই আমাদের আর থাকাথাকি ?

বনমালী হাসিয়া বলে, আপনারাও বলবেন ঐ কথা—তা'হলে আমরা যাই কোন্‌খেনে ?

সরকারমশাই হাসিয়া বলেন, তোমায় আমায় কোন প্রভেদ আছে নাকি ? তোমারও যা' অবস্থা আমারও তাই। দেশের যা' দিনকাল তাতে ভাই তোমার আমার মত লোককে ও একক্ষুরেই মাথা মুড়ুতে হবে।

তা' সত্যি কথা, বলিয়া বনমালী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে। তারপর বলে, যা'বেন কদ্দূর ?

না যা'বনা কোথাও—নিরাপদর সঙ্গে দেখা হ'ল তাই কথা কইতে কইতে এলুম, বলিয়া সরকারমশাই হাই তোলেন। তারপর আবার বলেন, নিরাপদকে বলছিলুম দেশে যাবার কথা !

যাবি নাকি নীরো, বনমালী জিজ্ঞাসা করে। নিরাপদ বলে, দূর পরামর্শ কর্‌ছিলুম মোটে—এখন কবে যাওয়া হবে !

যা' যা' একদিন ঘুরে আয়, বলিয়া বনমালী সরকার ম'শায়ের দিকে তাকায়। বলে, জন্মভূমি একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে বৈ কি !

তা' বৈ কি, সরকারমশাই বলেন।

বনমালী নিরাপদকে বলে, নীরো নে ওঠ্ তোর গাড়ীতে। তারপর নিজের গাড়ীখানার সম্মুখভাগটা ধরিয়া ঘুরাইয়া লইয়া একটু দাঁড়ায়। সরকারমশাইকে বলে, চলি তবে সরকারমশাই বেলা যাচ্ছে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, সরকারমশাই বলেন। নিরাপদও গাড়ীটাকে ঘুরাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়ে। সরকারমশাইকে যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বলে, চলি তবে—

হ্যাঁ ভাই এসো, বলিয়া সরকারমশাই যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই ফিরেন।

ফিরিবার পথে বহু গল্প হয়। তাহার বেশীর ভাগই রাধার সম্বন্ধে। নিরাপদ রাধার নিকট হইতে শুনিয়া আসা সুভদ্রার হিংসুটে স্বভাবের বর্ণনা করে। সে চেষ্টা করিতেছে অমরবাবু যাহাতে রাধাকে ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত বাস করে। নিরাপদর নিকট সব শুনিয়া বনমালী তাহাকে আশ্বাস দেয়। এবং সুভদ্রা ও পরেশঠাকুরের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু কিছু বলে। নিরাপদর মুখে হাসি দেখা দেয়।

কালি সামন্ত, শশী, পাঁচু, গোপাল প্রভৃতির সহিতও পথে দেখা হয়। আজ বেরাদের গাড়ী লইয়া আসিয়াছিল গোপাল। গোপালের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হয় বনমালীর।

আশুরায়েয় কন্যা উষা নাকি গোপালকে তা'দের ক্ষেতে কাজ করিয়া দিবে বলিয়াছে। গোপাল বলে, যদি মাতাঠাকরুণ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করে তাহা হইলে গাড়ী লইয়া আসিয়া তাহাকে আর কষ্ট করিতে হয় না। গোপাল আরও বলে, মেয়ে নয় ত যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী। কোথায় কি জায়গা জমি আছে, কোনখানের কিরূপ আয় তাহা সে কাগজ পত্র না খুলিয়াই মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারে।

বনমালী বলে, লেখা পড়া জানা মেয়ে।

কথায় কথায় সেদিনের সভার কথা আসিয়া পড়ে। কালি সম্মুখ হইতে চীৎকার করিয়া বলে, জান শশীদা' আমাদের বড় ব'য়ের চেয়েও বোধকরি বয়সে বড় হবে। সে মেয়ের এখনও বে' হয় নি।

শশী বুঝি সে দিন সভায় যাইতে পারে নাই। বলে, সে মেয়ে এখনও ঠিক আছে ?

কালি হো হো করিয়া হাসে। আর সকলেও হাসে। ভাল করিয়া হাসিতে পারে না কেবল গোপাল। গোপাল যে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং তাহার মতে তাহাকে মা-ঠাক্‌রুণ স্নেহও করে যথেষ্ট। কাজেই তাঁহার প্রতি এই রকমের হাসি হাসিয়া সে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে কি করিয়া ?

মল্লিকদের গাড়ী হইতে পাঁচু বলিয়া উঠে, ওহে ওসব কিছু হ'লেও ওদের বেলায় দোষ নেই, দোষ কেবল আমাদের বেলায়।

পাঁচুর কথাটার পিছনে খানিকটা দুঃখ জমা হইয়া আছে। তাহার মেয়ে সুশীলার বয়স এগারো পার হইলে সমাজ-ধুরন্ধরগণ বলিয়াছিল জাতে ঠেলা হইবে। ইহার জন্য পাঁচুকে তাড়াহুড়া করিয়া এক বুড়ার সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে হইয়াছিল এবং তাহার ফল যাহা হয় তাহাই হইয়াছে—বৎসর দুই বাদে মেয়েকে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। ইহারই বেদনাময় স্মৃতি আজ পাঁচুকে ঐ কথা বলিতে বাধ্য করিয়াছে।

রাত্রি প্রায় আটটা নাগাদ বনমালী ও নিরাপদ গৃহে ফিরে। কাঁদন আসিয়া আলো ধরে। গাড়ী দুইটাকে ঠিক করিয়া রাখিয়া হাত পা ধুইয়া দুইজনে দাওয়ায় গিয়া বসে। কাঁদন জলখাবার আনিয়া দেয়।

খাইতে খাইতে গল্প চলে। কাঁদন পানের বাটা লইয়া উহাদেরই একপাশে পান সাজিতে বসে।

এক সময়ে বলে, বৈচিপুতার মিহিলাল মাঝি এসেছিল।

বনমালী স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলে, হঠাৎ ?

আমি খবর দিয়েছিলুম, স্থপারী কুঁচাইতে কুঁচাইতে কাঁদন বলে, ওর মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে দোব !

বনমালী জিজ্ঞাসা করে, মেয়ে কত বড় হ'ল ?

তের পেরিয়ে চৌদ্দয় প'ড়েছে, বলিয়া কাঁদন স্বামীর দিকে তাকায়।

হুঁ তা'হলে ত বড় হয়েছে, বলিয়া বনমালী নিরাপদর দিকে তাকায়। নিরাপদ তখন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। বনমালী বলে, কিরে নীরো বিয়ে করবি ত ?

নিরাপদ রাগিয়া উঠিয়া বলে, খাওয়াব কি ?

বনমালী বলে, তুই যা খাস্ তাই খাওয়াবি ?

নিরাপদ বলিয়া উঠে, আমি ত খাই কলা !

কলাই খাওয়াবি বউকে, বলিয়া বনমালী হাসে। কাঁদন বলে, উটী হচ্ছেনা ঠাকুরপো এই আষাঢ়েই বন্দোবস্ত করছি ! মেয়েকে ত আগে থাকতেই দেখেচি আর ছেলেকেও তারা জানে—দ্যাখাদেখির হাঙ্গামা নেই এখন শুধু বিয়েটা হ'য়ে গেলেই হয়।

বিবাহ ! নিরাপদর এখন ভাবিতে বড় বিশ্রী লাগে। রাধার সহিত দেখা হইবার পর হইতেই তাহার কেমন কেমন ঠেকিতেছে। মনের মধ্যে ফেনাইয়া ফেনাইয়া কেবলই একটা আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে হয়ত বোনটীকে তাহার কত কষ্টের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে।

বিবাহ এমন একটা আনন্দের ব্যাপার তবু কাঁদনের নিকট হইতে শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দিত হইতে পারে না। মনে যেন তাহার জোর নাই। জলখাবার খাওয়া হইলে পান মুখে দিয়া তামাকের আয়োজন করে বনমালী। নিরাপদ তামাকের আশাতেই চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দেয়। বোধ করি সে বিবাহের কথাই ভাবে।

কিন্তু এ বিবাহে কি সত্যসত্যই তাহার মত থাকিবে?

কেমন করিয়া লোকের মুখে মুখে গ্রামের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—আগামী আষাঢ়ে নিরাপদর বিবাহ হইবে। কাঁদনের প্রস্তাবের প্রায় মাসখানেক পরে একদিন হাট হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া বৈকালের দিকে নিরাপদ পুকুরে যাইতেছিল গা ধুইবার জন্য। ঘাটে আসিতেই দেখে সুশীলা কলসী করিয়া জল লইয়া খেজুর গাছের তৈরী পৈটা দিয়া উপরে উঠিতেছে।

নিরাপদ ঘাটের এক দিকে সরিয়া দাঁড়ায়। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার ছায়া পড়ি-পড়ি করিতেছে—পুষ্করিণীর জলের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে কালো ছায়া। গাছে গাছে কলরব করিতেছে শালিক, ছাতার প্রভৃতি পাখীর দল। দিবসের তপ্ত আবহাওয়ায় দগ্ধ হইয়া প্রকৃতি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পুকুর ঘাটে তাহারা দুইটী প্রাণী ছাড়া আর কেহ নাই।

সুশীলা উঠিয়া আসে উপরে। চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইয়া কলসীটাকে সে মাটীতে নামাইয়া রাখে। নিরাপদ পাশ কাটাইয়া ঘাটে নামিবার চেষ্টা করে। সুশীলা বলে, শোনো!

নিরাপদর বুকটা ঢিপ্ করিয়া উঠে। সুশীলা আড়ালে পাইলে এমনি করিয়াই নিরাপদকে ডাকে। কি সে বলে—নিরাপদ তাহার কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গমও করে। নিরাপদ জানে তাহার প্রতি সুশীলার কেমন একটা টান আছে। আর নিরাপদর? নিরাপদরও কি সুশীলার প্রতি টান নাই? তাহা যদি না থাকিবে ত সে যখন তখন সুশীলাদের বাড়ী যায় কেন?

তবু সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করে! সুশীলাকে দেখিয়া কি তাহার মনে কোনও কথা জাগিয়া উঠে নাই? জাগিয়াছিল, কিন্তু সে কি করিবে, তাহার কেবলই মনে হয়—কেউ বুঝি দেখিয়া

ফেলিবে। এই দেখিয়া ফেলার ভয়ই ত সুশীলার নিকট হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখে। কেন সে কি কোন অসৎ অভিপ্রায় লইয়া চলা-ফেরা করে? তবু পথে-ঘাটে মেয়েদের সহিত, বিশেষ করিয়া সুশীলার মত বিধবা-যুবতীদের সহিত উপযাচক হইয়া কথা কহার দুঃসাহসকে নিরাপদ কোনদিন সমর্থন করে নাই। নিরাপদের বিশ্বাস এমনিতরো দুঃসাহসে ভর করিলে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। এ বিশ্বাস অবশ্য যুক্তি দিয়া সে কোনদিন তৈরী করে নাই, এমনিই যেন তার ওটা মজ্জাগত।

চলিয়া যাইতে নিরাপদ পারেনা—দাঁড়াইতেই হয় শেষ পর্য্যন্ত। সুশীলা প্রথমে নিরাপদর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত যেন কি দেখিয়া লয়। নিরাপদ তাকায় সুশীলার মুখের দিকে। উভয়ের হয় দৃষ্টি বিনিময়। সুশীলা কি বলিতে গিয়া যেন বলিতে পারেনা, বাধিয়া যায় মুখে। বলে, এই বুঝি আস্‌ছ হাট থেকে?

নিরাপদ ঘাড় নাড়িয়া বলে, হ্যাঁ!

সুশীলা দৃষ্টি নত করে। মাটীর দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবে। বোকা মেয়ে বলিতে পারেনা। ভুলিয়া গিয়াছে নিরাপদর কর্ম্মক্লান্ত অবস্থা দেখিয়া। ডানপায়ের বুড়ো-আঙ্গুল দিয়া ঘাটের উপরকার বেলে মাটীগুলাকে খুঁটিতে খুঁটিতে বলে, কই আমাদের বাড়ী আর যাওনা?

নিরাপদ কি করিয়া যেন বলিয়া ফেলে, গেলেই ত মাদুর পেতে শোবে আর আমি দোরে বসে থাকব একলা!

ও, হাসিয়া সুশীলা বলে, সেদিনের কথা ভোলনি দেখ্‌ছি। কিন্তু আমার মত মানুষ তার বেশী আর কি পারে?

না এমনিই বল্‌লুম কথাটা, বলিয়া সুশীলার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে নিরাপদ।

সুশীলার বুকের মধ্যে ফেনাইয়া ফেনাইয়া গর্জ্জিয়া উঠে কি সব অথচ

বলিতে পারে না মেয়েটা। মাটীর দিকে তাকাইয়া সে বলে, শুন্‌চি নাকি তোমার বিয়ে হবে?

নিরাপদ এবার হাসে—বলে, কে বল্‌লে?

মুখ তুলিয়া সুশীলা বলে, কাঁদন বৌদিদির কাছ থেকে শুনলুম।

না—না ও মিথ্যে কথা, বলিয়া নিরাপদ ঘাটে নামিতে থাকে। সুশীলা সেই দিকে তাকাইয়া ক্ষণেকের জন্য কি ভাবে। তারপর তাহার দুইচোখ ভরিয়া যায় জলে। কড়া কথা মুখ দিয়া বাহির হইতে যায় কিন্তু বলিতে গেলে বাহির হয় অন্য কথা। চোখ মুছিয়া কলসীটাকে উঠাইয়া লইয়া সুশীলা ফিরিয়া তাকায় নিরাপদর দিকে। নিরাপদ তখন জলে ডুব দিতে থাকে। ডুব দেওয়া বন্ধ হইলে সুশীলা বলিতে যায়—মনে থাকে যেন তোমার জন্য আমার সব কিছু যাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পারেনা বলিতে। পরিবর্ত্তে সে বলিয়া ফেলে, বে' হ'লে খাওয়াতে ভুলনা যেন!

নিরাপদ সুশীলার দিকে না তাকাইয়াই হাসে। সুশীলা বোধ হয় আশা করে নিরাপদ একবার তাকাইবে তাহার দিকে কিন্তু তাকায় না দেখিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিতে থাকে বাড়ীর দিকে।

নিরাপদ জানিতে পারেনা সুশীলার বেদনা কোথায়? সুশীলার এমনি অনেক দুঃখ ও বেদনা নিরাপদ জানে নাই, জানিতে চেষ্টাও করে নাই। কোন্ এক মুহূর্ত্তে যে নিরাপদ বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার প্রতি সুশীলার একটা টান আছে—শুধু সেইটুকু ভাবিতেই আশ্চর্য্যবোধ হয় নিরাপদর। লোকটা সাদা-সিধা সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক্‌গুলা কি সে কখনও খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিবে না? কি আছে সেখানে খুঁজিয়া দেখিলে অন্যায় নিশ্চয়ই হয় না! তবে ভয় কিসের নিরাপদর? ভয় ত সুশীলার!—সে বিধবা!

সুশীলাও ভাবিতে জানে। কেমন করিয়া ভাবনা যে আসে! পথ

চলিতে চলিতে সে সন্ধ্যার নিঃশব্দ আগমন উপলব্ধি করিতে পারে। পথের দু'পাশে বনফুলের সৌরভ, প্রকৃতির শ্যাম-সবুজরূপ, থাকিয়া থাকিয়া বনে বনে দখিনা বাতাসের অলস মাতামাতি! এমনিতরো সমারোহ লইয়া এই সন্ধ্যারই মত একদিন তাহার জীবনের চারিভিতে সুরু হইয়াছিল যৌবনের নিঃশব্দ সঞ্চরণ!···সন্ধ্যা আসিল বলিয়া! ঐ আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছে কয়েকটা নক্ষত্র, চাঁদ উঠিবে এখনই পূর্ব্বদিক আলো করিয়া। হায় ভগবান! ঐ নক্ষত্রগুলাকে আর চাঁদটাকে তুমি বারণ করিতে পারনা—আর উঠিয়া উহাদের কাজ নাই! পৃথিবীতে আসিয়া কাজ নাই সন্ধ্যার—শুধু বাঁচিয়া থাকুক রৌদ্রাগ্নির লেলিহান শিখায় জ্বলন্ত

কেন সুশীলা এ সকল কথা ভাবে—কি তাহার দুঃখ?

নিরাপদ জানে না এসব কথা। কিন্তু জগতের কোথাও মানুষের সহজবুদ্ধি দিয়া যে নিয়মতন্ত্র রচিত হয় না—যেখানে সেখানে ইচ্ছামত জগৎটাকে ঘোরালো করিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া এমন বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে যে সেই বাঁধনই অভিশাপ হইয়া দাঁড়ায়; আর সেই আঘাত মানুষের চোখের জলে নিত্যদিন কেবলই ঝরে, নিরাপদ ইহা জানে। এর প্রতিকারের পথ কি তার জানা নাই? কিন্তু যে জগতে সে ও সুশীলা বাস করে তাহা যে পল্লীগ্রামের জগৎ—সে জগৎ আশঙ্কায় আর অজ্ঞতায়, সঙ্কীর্ণতায় আর স্বার্থপরতায়, ভীরুতায় আর বিশ্বাসঘাতকতায়, অত্যাচারে আর অবিচারে পরিপূর্ণ।

ঠিক এই রূপটাই তাহার ধরা পড়িয়াছে সুশীলার কাছে। সুশীলা জানে, নিরাপদ কিছু ঠিক করিতে পারে না, সে প্রকৃতি নয় নিরাপদর।

সুশীলার মনে পড়ে প্রথম দিন হইতে আলাপের কথা। কলা বেচিয়া আসিয়া প্রায়ই সে তাহার বাবার সহিত গল্প করিত। সেই সময় কথার মধ্যেও সুশীলা লক্ষ্য করিয়াছে, নিরাপদর মাথায় কোন মতলব

আসিত না। তাহার বাবাই বরং সে সকল ক্ষেত্রে তাহাকে মতলব যোগাইয়াছে।

সুশীলা বাড়ী আসে জল লইয়া।

নিরাপদ পুকুর হইতে বাড়ী ফিরিলে বনমালী একখানি কাগজ লইয়া তাহাকে দেখাইয়া বলে, ওরে তোকে সাক্ষী দিতে হবে অমূল্যর খুনের মামলায়।

কাগজখানা কোর্টের সমন। নিরাপদ বলে, আমি কি জানি যে বল্‌ব।

তা' জানিনা, বলিয়া বনমালী হাসে।

কাপড় চোপড় ছাড়িয়া নিরাপদ ছুটাছুটি করে. কি সাক্ষ্য সে দিবে তাহারই পরামর্শের জন্য।

দেখিতে দেখিতে ইহারই মাঝে কবে একদিন গ্রীষ্মঋতুর অবসান ঘটিয়া যায়। রুদ্ররূপী আকাশের অঙ্গ ঘিরিয়া জমিতে থাকে জমাট কালো মেঘ। মানুষ বাঁচে হাঁপছাড়িয়া।

গ্রীষ্ম যায় প্রকৃতিকে নির্ম্মমভাবে শোষণ করিয়া, সকলকে চিন্তাকুল করিয়া দিয়া কিন্তু বর্ষা আসে সকলের বুকে আশার ঝঙ্কার তুলিয়া। বর্ষাকে সেই জন্য মানুষ এত ভালবাসে। ইহারই জন্য গ্রাম্য নরনারীর দল পথে ঘাটে চলিতে চলিতে কতবার আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখে—আকাশের দেবতার কাছে কতরকমের প্রার্থনা জানায়। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহাদের মনে পড়িয়া যায় কোন এক দুর্বৎসরের অনাবৃষ্টির জন্য তাহাদের সকলকার ক্ষেতগুলা শুধু জ্বলিয়া গিয়াছিল। তাহারাই আকাশের দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায় বেশী করিয়া।

আষাঢ়-গগনের দিকে দিকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে

গ্রামের গাছগুলা। শিরীষ, শাল, দেবদারু বড় বড় গাছগুলা ঝড়ের সময় কোথা হইতে যেন মেঘগুলাকে টানিয়া লইয়া আসে। মেঘ মেদুর আকাশ আশীর্ব্বাদের মত তাহাদের মস্তকে বর্ষণ করিতে সুরু করিয়া দেয়। ওদিকে হয়ত গ্রামের শেষে উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে কোথায় কোন্ একাকী দাঁড়াইয়া থাকা তালগাছের উপর বাজ পড়িয়া গাছটার মাথাটার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। তারপর হয়ত সে লীলাময়ের লীলার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের গন্তব্য স্থলে চলিয়া যায়।

বর্ষায় প্রকৃতির রূপ ফিরিয়া যায়। গ্রামের নদী-নালা কাঠ-ফাটা পুকুর ডোবা জলে টৈ-টুম্বুর হইয়া উঠে—প্রকৃতির সেই খাঁ খাঁ করা নগ্নমূর্ত্তি আর চোখকে পীড়িত করিয়া তোলেনা।

সেদিন ভোর হইতেই মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছিল। উপরের একটা ঘরে আশু রায় কন্যা উষার সহিত চাষবাস সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলিতেছিলেন।

উষা যেখানে বসিয়াছিল তাহার সম্মুখের দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল একটা আয়না। মাঝে মাঝে সে আয়নার মধ্যে নিজের মূর্ত্তিটার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছিল। কাণে তাহার দুইটী স্বর্ণদুল রাত্রির নক্ষত্রের মত জল্‌জল্ করিতেছিল। উষার মূর্ত্তির চারিদিকে ঘিরিয়া আছে যেন একটা অচঞ্চল নম্রতা। তাহার আসে পাশে থাকে প্রতিভার দীপ্তি। উষার সম্বন্ধে গোপাল যাহা বলে তাহা আদৌ অত্যুক্তি নয়।

আশুবাবুর চোখে চশমা—তাঁহার প্রকাণ্ড গুম্ফরাশির আড়ালে আছে যেন একটা দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা। ইতিহাসের কোনো স্বনামধন্য বীরের মত তাঁহার চেহারা এবং প্রকৃতি দুই-ই। গায়ে লম্বা একটা পাঞ্জাবী। কন্যাকে বলেন, বৃষ্টি নেমেছে এবার সব কিষেণ লাগিয়ে দেয়া যাক্—কি বল মা?

উষা বলে, কিন্তু কিষেণ ত লাগাবেন—ভাগ চাষের জন্য কি করছেন?

ভাগে ত দেয়া হয়ে গেছে—সেগুলো এবারও আমি আর অদ্বৈত দেখ্‌ব, বলিয়া আশুবাবু কন্যার মুখের দিকে তাকান।

উষা বলে, না ভাগে যা দেয়া হয়েছে সে গুলো বরং আমি দেখ্‌ব আপনারা কিষেণ খাটাবেন।

আশুবাবু কন্যাকে রীতিমতই চিনেন তবু তিনি প্রশ্ন করেন, কেন?

উষা বলে, গত বছরে ভাগে যাদের দেয়া হয়েছিল আমি শুনেচি তাদের ওপর অবিচার করা হয়েছে।

অবিচার, আশুবাবু বিস্মিত ভাবে বলেন, অবিচার ত কারো ওপর করা হয়নি মা—তা ছাড়া অদ্বৈত ত তেমন ছেলে নয়? জমিদারী সে বোঝে—

সেই জন্যই হ'য়েচে বাবা, বলিয়া উষা মৃদু মৃদু হাসে।

অদ্বৈত আশুবাবুর ম্যানেজার—বয়স ত্রিশ-একত্রিশ হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এ পাশ করিয়া কয়েক বৎসর সে পূর্ব্ববঙ্গের কোন একটা রাজ-ষ্টেটের চাকরী করে। তারপর আশুবাবু তাঁহার কোন এক বন্ধু মারফৎ তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে লইয়া আসেন। অদ্বৈত এসব ব্যাপারে খুব দক্ষ। সে পাঁচবৎসর যাবৎ আশুবাবুর নিকট চাকরী করিতেছে। এই পাঁচবৎসরে উষা তাকে বেশ ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছে। তাই তাহার কথা উঠিতে সে অমন করিয়া হাসিল।

আশুবাবু জানেন উষা অদ্বৈতকে দেখিতে পারেনা। তাই কথাটা তিনি তখনকার মত চাপা দিবার জন্য বলেন, তাহ'লে তুমি বলছ ভাগচাষ গুলো দেখবে?

হ্যাঁ, বলিয়া উষা উঠিয়া পড়ে।

আশুবাবু বলেন, বেশ তাহ'লে আমি কিষেণ খাটাবার বন্দোবস্ত করব—আর অদ্বৈত থাক্‌বে খাজনাপত্তর আদায়ের জন্য।

সেইভাল, বলিয়া ঊষা কার্য্যোপলক্ষে অন্যঘরে চলিয়া যায়।

এই আশুবাবুর জমিদারী ব্যাপারে লিপ্ত হইবার বেশ একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। যৌবনে লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া পিতার সুপারিশে তিনি সরকারী অরণ্য বিভাগে চাকুরী পান। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট—অরণ্যবিভাগের এক জন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহার বন্ধু। তাঁহাকে বলিয়া-কহিয়া তিনি পুত্রের চাকুরী জুটাইয়া দেন। সেই হইতে আশুবাবু আসাম, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান। আশীটাকার বেতনের সামান্য কেরাণীর পদ হইতে তিনি স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিভাবলে ক্রমশঃ অরণ্যবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত হন। কতদিক দিয়া তিনি তাঁহার কর্ম্ম-জীবনে কত অর্থ ও সম্মান যে পাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

সত্যকার জীবন তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছিল কর্ম্মজীবনে। বনে বনে ঘুরিবার সময় অরণ্যের সুবিস্তৃত শ্যাম শোভা ও মূক নির্জ্জনতা তাঁহার মনে কিসের যেন এক ছাপ দাগিয়া দেয়। কর্ম্মজীবন তাঁহাকে জীবনের চলার পথে উপযুক্ত ও দুঃসাহসী করিয়া তুলিয়াছিল। শ্বাপদসঙ্কুল, মৃত্যুভয় সমাচ্ছন্ন গভীর অরণ্যে ঘুরিবার সময় অদম্য কর্ম্মপ্রেরণা তাঁহাকে কেবলই ঠেলিয়া দিয়াছে আরও দুর্গমের দিকে। সেই দুর্গম পথে বিপুল বিক্রমে তিনি কেবলই চলিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনে কোন দিন দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই তাই অরণ্যকে দেখিয়া তিনি কখনও কবিত্ব করিতে পারেন নাই, তাঁহার মতে এসব দুর্ব্বলতারই নামান্তর। অরণ্যের কত বিচিত্র পত্র ও পুষ্পের কত মনোরম দৃশ্য, কত অজানা পাখী

পাখালির সুমধুর কণ্ঠস্বর, কোথায় কোন্ বহিয়া যাওয়া স্বচ্ছ-জলের ধারা তাঁহার মনে সৃষ্টি-রহস্যের কোন সংজ্ঞার কথা জাগাইয়া তোলে নাই। গভীর অরণ্যের মাঝে কোথায় হয়ত তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছে, ভৃত্যেরা তাঁহাকে বলিয়াছে—বাঘ আসিয়াছে, বন্দুক হস্তে তিনি একা বাহিরে থাকিয়া আর সবাইকে তাঁবুর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া বাঘটাকে বধ করিয়াছেন। গভীর রাতে আগুন জ্বালিয়া বাঘের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কত বিনিদ্র রজনী তিনি একা অতিবাহিত করিয়াছেন। হয়ত সরকারী হুকুম আসিয়াছে তাঁহাকে আসামের জঙ্গল হইতে ছোটনাগপুর যাইতে হইবে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে।

এসব দিনে তাহার একমাত্র সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী মঞ্জরী। যদিও তাহার সহিত আশুবাবুর জীবনের ধারা মিলিত না তবু দিন কাটিয়া গিয়াছে এক রকম করিয়া। মঞ্জরী দেবী অরণ্য জগৎকে ভালবাসিতে পারেন নাই—লোকালয়ের মানুষ অরণ্যকে ভালবাসিবেন কি করিয়া? তবু তাঁহাকে ভাল লাগাইতে হইল। তাঁহার জীবনে তিনি একটা সত্য বড় করিয়া মানিতেন—মানুষ অবস্থার দাস। যে অবস্থায় তিনি পড়িয়াছেন সেই অবস্থার সঙ্গে তাঁহাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে তাহা না হইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। অরণ্যের নীল বিস্তৃতিকে তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন। ভয়াল-নিবিড় জঙ্গলকে কেন্দ্র করিয়া তিনি জীবনের পরিধি অনেকখানি বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। মানুষের কর্ম্ম জগতের বাহিরে এমন আরেকটা জগৎ তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, যে জগতের প্রশান্ত গম্ভীর আবহাওয়ায় তিনি তাঁহার আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, জন্ম জন্মান্তরের ইতিহাস লক্ষ্য করিতে পারিতেন। বিশাল অরণ্যের ব্যাপ্তি যখন বসন্তের স্তব্ধ দুপুরে থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিত তখন তিনি সেদিকে তাকাইয়া থাকিতেন—দেখিতেন পুরাণো পাতার দল যেখানে ঝরিয়া গিয়াছে সেখানেই আবার জন্মলাভ

করিতেছে সজীব নবীন কিশলয়। যুগ যুগান্ত ধরিয়া সৃষ্টি-রহস্যকে ক্রম-বর্দ্ধমান রহস্য ধারায় টানিয়া লইয়া যায়, বোধহয় এমনিতরই প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তি হয়ত সম্মুখের বন জগতের মতই জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বাল্যকাল তাঁহার কাটিয়াছিল নদীতীরে। তাঁহার পিত্রালয় ছিল ঠিক নদীর উপরেই। ছাদে বসিয়া বসিয়া রাতদিন তিনি লক্ষ্য করিতেন—বিশাল জলরাশি কেবলই বহিয়া চলিয়াছে, বিরামহীন। জগতের প্রাণশক্তি যতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে সুন্দরতম হইতেছে মানুষের জীবন! ঐ নদীর অবিরাম স্রোতের মতই তাহা বহিয়া চলিয়াছে, আর সেই বিশাল জলরাশির মাঝে একটী বিন্দুবৎ তিনি স্রোতের ধারায় মিশাইয়া আছেন। এই তাঁহার আত্মোপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধি তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর জীবনের সহিত একান্ত করিয়া মিশিয়া যাইতে দেয় নাই।

মঞ্জরী দেবী স্বামীর জীবনের আড়ালে আড়ালে তাঁহার চাকর বাকরদের লইয়া, শিশু কন্যাকে লইয়া আরেকটী কল্যাণময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন! সেই জগতের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম ছিল মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্ষায় যখন অরণ্যের দিক্ দিগন্ত ছাইয়া আসিত বৃষ্টি তখন তিনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন সেই বৃষ্টিধারা আর ভাবিতেন ইহা কি করিয়া হয়? নদী সমুদ্র সরোবর পুষ্করিণী হইতে এই জলই বাষ্প হইয়া জমে আকাশে। আকাশের স্নিগ্ধতা তাহাকে রূপান্তরিত করে বৃষ্টিরূপে। মানুষও হয়ত তাহার কাজ ফুরাইলে বাষ্পের মত কোথায় যায় চলিয়া তারপর আবার ফিরিয়া আসে কাহার স্নিগ্ধ কোমল ভালবাসায়। সে কি তবে জননীরই?

তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে ভালবাসিতেন। সম্মুখে কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইত—এ আসিল কোথা হইতে? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি সে উত্তর পাইয়াছেন—ইচ্ছে হয়ে ছিলি বুকের মাঝারে!

জননীর এই ইচ্ছাতেই বোধহয় জগৎ চলিতেছে। তিনি নিজেকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেন। অবশ্য তাঁহার নারী জীবনে স্বামীকে ভালবাসিয়া তিনি কোনদিন সুখী হইতে পারেন নাই কিন্তু জগৎ চলার পথে জননীর দায়িত্বের মধ্যে তিনি নিখিলের নারী-জীবনের যে সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ছিলেন ভরপুর। কন্যাকে তিনি নিজের জীবনের আদর্শ অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই উষাকে বারো বছরেরটী রাখিয়া তাঁহাকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইল।

আশুবাবুও কন্যাকে কলিকাতার এক মেয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজের কর্ম্মস্থলে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে সুরু করিয়া দেন।

আশুবাবু বনে বনে ঘুরিয়া একটা জিনিষ পাইয়াছিলেন, নির্জ্জনতাকে তিনি ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। কখনও কখনও কর্ম্মস্থল বদল করিবার সময় পথে ঘাটে রেলে ষ্টীমারে তিনি লোকজনের হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি ভিড় দেখিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেন। সেই সময় মাঝে মাঝে তিনি ভাবিতেন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি কি করিবেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে বাংলা দেশের পল্লীগুলিতে এখনও অক্ষুণ্ণভাবে শান্তি বিরাজ করে। তিনি ভাবিতেন—পল্লীগ্রামে গিয়াই তিনি বাস করিবেন।

সেই ধারণাই তাঁহাকে গ্রামে লইয়া আসিয়াছে। গ্রামে আসিবার আগে তিনি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রবন্ধে প্রায়ই পড়িতেন—শিক্ষিত লোকদের গ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে তবেই দেশের উন্নতি। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি গ্রামে আসিয়াছেন এবং কৃষিকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। জমিদারী তাঁহার পিতা রাখিয়া যান নাই—পিতা রাখিয়া গিয়াছিলেন প্রায় লাখ খানেক টাকা। আশুবাবু নিজেও

কিছু কম উপার্জ্জন করেন নাই। নিজের স্বোপার্জ্জিত অর্থেই তিনি এই জমিদারী ক্রয় করেন এবং এই জমিদারীতেই লইয়া থাকেন।

এই দুর্দ্দিনেও আশুবাবুর জমিদারী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষকেরা জমিদারের খাজনা দিতে পারিতেছে না, প্রায়ই অনেক জমিদারের জমিদারী নিলামে উঠিতেছে। এসব দিক দিয়া অদ্বৈত অত্যন্ত বুদ্ধিমান—তাড়াতাড়ি সে সেইসব জমিদারী কিনিয়া লইতেছে। অদ্বৈত যে কতখানি চতুর তাহা তাহার মতলব বিশ্লেষণ না করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। আশুবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি অন্য জমিদারের যে সকল মহল আছে সেই সকল মহলের খাজনা আদায়কারী-দের সহিত সে ষড়যন্ত্র করে, সেই সকল জমিদারের জমিদারী সেরেস্তায় পরিচিত লোকদের চাকরী জোগাড় করিয়া দেয়। তাহারা সবাই একবাক্যে জমিদারকে বলে, হুজুর ওদিকটায় তেমন আদায় হয় না অথচ গবর্ণমেণ্টকে বছর বছর টাকা গুণ্‌তে হ'চ্ছে—

জমিদার প্রথমটায় হয়ত বলেন, দ্যাখনা যদি আরো কিছুদিন চলে তা' না হ'লে বিক্রী করে দেয়া যাবে।

জমিদারকে আবার ঐ একই কথা শোনানো হয়: বার বার শুনিতে শুনিতে জমিদার বিরক্ত হইয়া বিক্রয় করিবার কথাই বলেন। নিজস্ব-লোকমারফৎ অদ্বৈত সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আশুবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সেইসব মহলগুলি কিনিয়া লয়। এমনি করিয়া আজ প্রায় পাঁচ বছরে সে রতনপুর হইতে সমস্ত জমিদারকে হটাইয়া দিয়াছে। বাকী আছে শুধু দক্ষিণ পাড়াটা। দক্ষিণ পাড়াটা দখল করা অবশ্য ভয়ানক ব্যাপার। একটুখানি জায়গা তাহার উপর চার-পাঁচজন জমিদার।

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে যখন অন্যলোক জমিদারী ছাড়িয়া দিতেছে তখন অদ্বৈত যে কি করিয়া দিন দিন জমিদারী বাড়াইয়া চলিতেছে আশুবাবু

তাহা ভাবিয়া পান না। আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলে অদ্বৈত বলে, একহাত জমিও অনাবাদী রাখ্‌লে চলবে না। যদি আপনি ফেলে রাখেন তাহলে জমিদারী রাখ্‌তে পারবেন না। প্রজা বসিয়ে জমি বিলি করবেন না। সমস্ত জমি হবে আপনার, ভাগে দেবেন, ঠিকে প্রজা বসাবেন, আর যাদের কাছে নিয়মমত খাজনা পাওয়া যাবে এমন লোককে জমি দেবেন। তাহলেই ঠিক চল্‌বে।

আশুবাবু বলেন, তা' তুমি যা করবে তাই কর বাবা।

সেদিক দিয়া অদ্বৈত পাকা ওস্তাদ। সমস্ত রতনপুর গ্রামটায় সে এমন এক বেড়াজাল ফেলিয়া রাখিয়াছে যে তাহা হইতে কাহারও মুক্তি নাই। কৃষকের ঘরে ত হাহাকার লাগিয়াই আছে। কর্ম্মচারী রাখিয়া অদ্বৈত কৃষকদের দুঃসময়ে টাকা ধার দেওয়ায়। টাকা লইয়া কৃষক পড়ে ফাঁদে—দেনার দায়ে তাহার বসতবাটী চলিয়া আসে অদ্বৈতের হাতে। অদ্বৈত এমনি করিয়া রতনপুরের অর্দ্ধেকেরও উপর কৃষককে ভূমিহীন দিন-মজুরে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়। বেকার কৃষকদিগকে সে ভাগে জমি বিলি করে। ফসল ফলিলে অর্দ্ধেকের বেশী তাহার নিকট হইতে লইয়া চাষীকে বাকী অংশটা দিয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত গর্হিত ঠেকে উষার কাছে।

পাশের ঘরে গিয়া উষা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বর্ষার রূপ দেখিতে দেখিতে কি যেন ভাবে। সকাল বেলাতেই যেন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে —এমনি অন্ধকার করিয়া উঠিয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছে ঝম্ ঝম্। দূর আকাশের বুকে মেঘের রাশ যেন গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। বর্ষার এই রূপ দেখিয়া উষার কাঁদিতে ইচ্ছা করে। কি যেন এক বেদনা ফেনাইয়া ফেনাইয়া তাহার বুক ঠেলিয়া আসিতে চায় বাহিরে। উষার মনে পড়িয়া যায় মাকে। মনে পড়ে অরণ্যের মাঝে তাহাদের অস্থায়ী ছাউনি, মনে পড়ে তাহার মাঝে মায়ের স্মৃতি। সেই স্মৃতিপটে

মায়ের কত না কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। একে একে সে সকল কাহিনী তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে শরতের বর্ণ বৈচিত্র্যে ভরা মেঘের মত উদয় হইতে থাকে। সে কি স্বপ্ন! একদিন যে তাহার মা ছিল ইহা কি সত্য? বারো বৎসর বয়সে সে মা হারাইয়াছে আজ তাহার বয়স তেইশ বৎসর—এই এগারো বৎসর ধরিয়া সে মাতৃহারা। এগারো বৎসর ধরিয়া পলে পলে যে বেদনা তাহার বক্ষে সঞ্চিত হইয়াছে তাহাই যেন আজ মুহূর্ত্তের মধ্যে কি এক কাণ্ড করিবে বলিয়া অন্তরের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে। ভগবান তুমি যাহাকে টানিয়া লও তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পার না? যদি না ফিরাইয়া দিতে পার ত হে নিষ্ঠুর লইয়া যাও কেন? তুমি ত জান না মা হারাণোর কি কষ্ট!

এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে একসময় অন্তর তাহার খানিকটা লঘু হইয়া আসে। মায়ের কথার সহিত নিজের চিন্তা আসিয়া পড়ে। মা তাহাকে এক নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অভাগিনীর সেই ইচ্ছা কতখানি সফল হইয়াছে না হইয়াছে তাহা উষা হিসাব করিয়া বলিতে পারে না। উষা ভাবে, সে যা হয় একরকম গড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাহার এজীবন ভাল লাগে না। সে হোষ্টেলে আরও অনেক মেয়েদের সাথে মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া যে পিতার এখানে ভাল লাগেনা তাহা নহে। এখানে মানুষ যেন নিজেকে উপলব্ধি করিতে জানে না, দিনরাত্রি কেবল অর্থ অর্থ বিষয়-সম্পত্তি লইয়াই ব্যস্ত। কি করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে—এই ইহাদের জীবন-স্বপ্ন! এখানে সে হাঁপাইয়া উঠে। অথচ উষা ইহাদের যেন ছাড়িতে পারে না। আজ সে ভাবে যেমন করিয়াই হউক ইহাদের শৃঙ্খল তাহাকে ভাঙিতেই হইবে।

এমন সময় ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় অদ্বৈত। চুলগুলা উস্কো-খুস্কো, চোখে সোনার চশমা—গেঞ্জী গায়ে, দেশী জরীপাড় কাপড়খানার

কোঁচাটা গ্রীসিয়ান শ্লিপারের উপর পড়িয়া লুটাইতে থাকে। ডাকে, মিস্ রায় ?

উষা চমকাইয়া উঠে। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখে—অদ্বৈত। রাগতভাবে সে বলে, দেখুন ম্যানেজারবাবু আপনি আমায় মিস্ রায় বলে ডাকবেন না ? কতদিন আপনাকে বলেছি, ওসব বিলিতিয়ানা আমি পছন্দ করি না। হয় আমাকে নাম ধরে ডাকবেন না হয় দিদি বলবেন।

ঘাড় নীচু করিয়া পরক্ষণই মুখ-তুলিয়া অদ্বৈত বলে, আমি লজ্জিত—আমাকে ক্ষমা করবেন।

উষা চুপ করিয়া থাকে।

অদ্বৈত বলে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম কয়েকটা আলোচনা করতে।

একদিকের একটা চেয়ার দেখাইয়া নিজে জানালার দিকে সরিয়া গিয়া উষা বলে, বসুন !

অদ্বৈত বসিয়া পড়িয়া বলে, আপনি নাকি আপনার বাবাকে বলেছেন যে এবার ভাগচাষগুলো সব আপনি দেখবেন ?

হ্যাঁ, বলিয়া উষা অদ্বৈতের দিকে তাকায়।

ভাল, অদ্বৈত বলে, দেখুন আপনি সব কাজ করুন কেবল এই কাজটা বাদ। এমন ছেঁচড়া কাজ আর নাই।

কেন ? উষা সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করে।

অদ্বৈত বলে, যারা ভাগচাষ করে ধান খামারে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই তারা বেশ মোটা একটা অংশ বিক্রী করে খেয়ে ফেলে। ধান ভাগ করবার সময় সে কথা তারা কিছুতেই মানতে চায় না। আন্দাজ করে ধরে নিয়ে তবে তাকে দুভাগ ক'রে আমাদের নিয়ে আসতে হয়। আপনি কি পারবেন সে কাজ ?

না পারি আমি বুঝব কিন্তু তাই ব'লে যে সারাবছর পরিশ্রম করল

তার মুখের গ্রাস কেড়ে আনতে দোবনা, বলিয়া উষা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করে।

এটা আপত্তিজনক উষা দেবি, অদ্বৈত বলে, কেউ তাদের মুখের গ্রাস কাড়েনা।

উষা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলে, কেড়েছে তার প্রমাণ আছে।

যদি কেউ এমন খবর আপনাকে দিয়ে থাকে তা'লে সে ভুল খবরই দিয়েছে, বলিয়া অদ্বৈত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে।

উষা উত্তেজিতভাবে বলে, ভুল নয় ম্যানেজার বাবু! আমাকে যারা একথা বলেছে তারা ভুল বলবেনা আর মিথ্যেও বলবেনা। নাম মাত্র একটা অংশ দিয়ে সমস্ত ধান জোর করে তুলে আনতে আপনিই আদেশ দিয়েছেন!

নাম মাত্র নয় উষাদেবি—আগে থাকতে তারা তাদের অংশ নিয়ে নেয়, বেশ জোরের সহিতই অদ্বৈত বলে।

উষাও ঠিক তেমনিভাবে বলে, মিথ্যে কথা!

অদ্বৈত বলে, আপনি চাষীদের চেনেন না তাই একথা বলছেন।

উষা যেন জ্বলিয়া উঠিয়া বলে, চিনি না চিনি সে খোঁজে আপনার দরকার নেই। আমি যা' বুঝ্‌ব তাই ক'র্‌ব আপনি তাতে একটীও কথা কইবেন না।

অদ্বৈত দৃঢ় কণ্ঠে বলে, মনিবের হুকুম—আপনাকে আপনার ইচ্ছামত চলতে দেয়া হবেনা।

প্রত্যুত্তরের ভঙ্গিতে উষা উত্তর দেয়, আর আমারও হুকুম আছে আপনার মনিবের ওপর যে তিনি তাঁর চাকরকে যা' তা হুকুম দিতে পারবেন না—

বেশ দেখা যাবে, বলিয়া অদ্বৈত বাহির হইয়া যায়।

উষা আশুবাবুর অবাধ্য মেয়ে। পিতার কথা কোনদিন মানিয়া

চলিতে পারে নাই। তাই বলিয়া যে সে পিতাকে শ্রদ্ধা করেনা তাহা নহে। সে বলে—পিতা যদি তাহার জীবন-যাত্রার আদর্শ না মানিয়া লন তবে সে কি করিয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতার সকল কথা মানিয়া চলিবে? প্রথম যখন সে কলেজ ছাড়ে তখন তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ করিতে বলেন। কিন্তু উষা পিতার এই আদেশ মানিয়া লয় নাই। তাহার মতে বিবাহ মানুষের করা উচিত, তবে নিজের জীবনকে ব্যক্তিগতভাবে সে যদি একটু স্বতন্ত্রপথে চালিত করিতে চায় তাহা হইলে আপত্তি উঠিবে কেন? ইচ্ছা হইলে সে বিবাহ করিবে, ইচ্ছা হইলে সে করিবেনা। পিতার সহিত তাহার বিরোধ বাধিল এইখানে। এ বিরোধ আদর্শের, অন্তরের নয়। কিন্তু ইহা একদিন অন্তরের বিরোধ হইয়া দেখা দিল যখন উষা জানিতে পারিল অদ্বৈতের সহিতই তাহার বিবাহ দিবার জন্য পিতা উৎসুক। পিতার উদ্দেশ্য যে অদ্বৈত বেশ ভাল ছেলে, কন্যাও বুদ্ধিমতী—মিলিবে ভাল আর তাঁহার অবর্ত্তমানে জমিদারিটাও রক্ষা পাইবে। উষা চিরদিন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে অদ্বৈতের মত লোকগুলাকে। যাহারা লেখাপড়া শিখিয়া দেশের দশজনের একজন হইয়া তুচ্ছ বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া মাতিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? যদি সেই গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতাই তাহাদের জীবনের আদর্শ হইবে ত তাহারা লেখাপড়া শিখিতে যায় কেন? লেখাপড়া শিখিয়া এ জগতে ভাবিবার মত বিষয় করিবার মত বহু কাজ রহিয়াছে—সেই সকল দিকে যাইবার মত যাহাদের উদার মনোভাব নাই, তাহাদের সংস্পর্শে আসিতেও ঘৃণা বোধ করে উষা! আর পিতা দিতে চান এমন লোকের সহিত তাহার বিবাহ! এই ঘটনার পর হইতেই পিতাকে সে তেমন করিয়া দেখিতে পারে না। তাহার কলেজ জীবনে পিতার নিকট হইতে যখন সে দূরে ছিল তখন পিতাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কত কি কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু

কাছে আসিতেই তাহার সে কল্পনা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া অস্তিত্বহীন অবাস্তবে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

খানিক পরে আশুবাবু উষার কাছে আসিয়া বলেন, হ্যাঁ মা তুমি অদ্বৈতকে গালাগালি দিয়েচ ?

হ্যাঁ, ঘাড় নীচু করিয়া উষা বলে।

আশুবাবু বলেন, ছিঃ মা! সেই আমাদের সব তাকে কি অমন ক'রে বলতে আছে ?

উষা মুখ তুলিয়া বলে, তিনি আমার ওপর আদেশ জারী করতে এসেছিলেন যে।—

আমিই তো সে আদেশ দিয়েছি মা, বলিয়া তিনি সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। উষা বলে, তা' আমি জানি বাবা কিন্তু আমিও তো ছেলেমানুষ নই! সে হিসেবে তাঁরও তো একটা বোঝা উচিত ছিল ?

আশুবাবু বলেন, সে পরের কথা মা। অদ্বৈত দুঃখ করবে, তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিও।

উষা এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমি চাইব বাবা। ঔদ্ধত্যই আমার স্বরূপ নয় কিন্তু আমার অপমান যে বাড়ীতে প্রতিদিনই হচ্ছে এবং হবার আরও সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে আমি আর একমুহূর্ত্তও থাকতে চাইনা। আপনি ভাল চানতো আমায় ক'লকাতা পাঠিয়ে দিন নয়ত বলুন আমি নিজেই চ'লে যাচ্ছি।

কেন কন্যার এই অসহ্য পাগলামি ? কি অভাব তাহার, জীবনে সে কি চায় ? আশুবাবু মুহূর্ত্তমধ্যে কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলেন, আচ্ছা সে যা হয় হবে, তুমি চল আমার সঙ্গে অদ্বৈতর কাছে।

উষা নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। অভিমানে দুঃখে ও ব্যথায় কণ্ঠ তাহার যেন রুদ্ধ হইয়া যায়।

এসো, বলিয়া আশুবাবু আগে আগে চলিতে থাকেন।

অদ্বৈত নীচের ঘরে নায়েব মশাইকে কি বুঝাইয়া দিতেছিল। আশুবাবুর পায়ের শব্দ পাইয়াই সে চকিত হইয়া উঠে। পিছনদিকে তাকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে দালানে চলিয়া আসে। পিছনে উষাকে দেখিতে পাইয়া সে আশ্চর্য্য হয়। আরও আশ্চর্য্য হয় যখন উষা আসিয়া বলে, ম্যানেজারবাবু আপনাকে তখন যা' বলেছি আশা করি আপনি তা' ভুলে যাবেন আর আমায় ক্ষমা করবেন।

অদ্বৈত কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া উষার দুইখানা হাত ধরিয়া বলে, এ কি বল্‌ছেন! আপনি চাইবেন আমার কাছ থেকে ক্ষমা?

উষা বলে, দোষ করেছি যে আমি!

দোষ ত আমিও করেছি, অদ্বৈত উষার হাত দুই খানাকে নাড়া দিয়া বলে।

দোষ করলে ক্ষমা চাইতে হবে আমার মা যে আমাকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন ম্যানেজার বাবু, বলিয়া উষা পিতার দিকে তাকায়। আশুবাবু বলেন, সকলের মা-ই এই শিক্ষাই দিয়ে যান কিন্তু অবাধ্য সন্তানেরা যে শোনে না মা।

আশুবাবু কাহাকে আঘাত দিলেন কে জানে! অদ্বৈত কিন্তু হাসে। আশুবাবু বলেন, আর গ্যাখো বাবা অদ্বৈত, আজকে উষাকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে!

আজকে কখন? অদ্বৈত ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে।

উষা বলে, দুপুরে—

অদ্বৈত মাথায় হাত বুলাইয়া বলে, আজ যে আমায় কোর্টে যেতে হবে।

কোর্টে কেন, আশুবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

আজকে সেই যে বাগ্দীপাড়ার যে দলটার দশধারায় বিচার চলেছিল

তাদের রায়ের দিন, সাজা হয়ে গেলে জামিন দাঁড়িয়ে খালাস করে আনতে হবে, বলিয়া অদ্বৈত আশুবাবুর মুখের দিকে তাকায়।

আশুবাবু বলেন, ও, তাহলে না হয় নায়েব মশাই-ই যাবেন।

হঁ্যা সেই ভাল, বলিয়া অদ্বৈত ঘরের দিকে তাকায়।

তাই-তাই, বলিয়া আশুবাবু উপরে চলিয়া যান। উষাও যায় পিছন পিছন।

দুপুরে পাল্কী চড়িয়া নায়েব বাবুর সাথে উষা ষ্টেশনে যায়! ষ্টেশন হইতে রেলে চড়িয়া যায় কলিকাতায়। কলিকাতায় তাহার মাসীমার বাড়ী।

* * * *

আজ কয়েকদিন হইল নিরাপদ সরকার মশায়ের সাথে চলিয়া গিয়াছে জাহানাবাদে। অমূল্যর স্ত্রীর লাস যে গাড়ী করিয়া হাঁসপাতালে চালান দেওয়া হইয়াছিল তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য দায়রা জজের নিকট সাক্ষ্য দিবার পর নিরাপদ চুঁচুড়ার কি একটা ছবিঘরে গ্রামস্থ আরও কয়েকজনের সাথে বায়স্কোপ দেখিতে যায়। সেদিন দুর্গেশ-নন্দিনী ছবিটা দেখানো হইতেছিল। নিরাপদ লেখাপড়া জানে না, লেখাগুলি পড়িতে না পারিয়া সে শুধু ছবিই দেখিতেছিল। পাশে কয়েকটী স্কুলের ছাত্র আরামবাগ, জাহানাবাদ প্রভৃতির কথা বলিতে-ছিল। ঘটনাটা নাকি সেখানকারই। একজনকে সে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিতে পারে ঐ শৈলেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি সবই আরামবাগে আছে। বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বড় লেখক জাহানাবাদে ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলে ঐ সকল পুরাতন কাহিনীর চিহ্ন দেখিতে পান এবং ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া যেমন যাত্রার বই লেখা হয় ঠিক তেমনি করিয়া তিনি এই দুর্গেশনন্দিনী গল্পটী লিখেন। জাহানাবাদ পুরাতন নাম—আধুনিক নাম হইতেছে

আরামবাগ। নিজের জন্মস্থানের এক পুরাতন কাহিনী ছবির পর্দায় দেখিয়া নিরাপদর বড় কৌতূহল জাগে, জাহানাবাদে যাইবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। পরের হাটে আসিয়াই সে সরকার মশাইকে রাজী করাইয়া ফেলে এবং তাহারই পরের দিন সরকার মশাই ও নিরাপদ জাহানাবাদ অভিমুখে রওনা হয়।

শনিবারের হাট। আকাশ বেশ পরিষ্কার, বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কয়েক হাট বৃষ্টির জন্য বনমালী হাটে যায় নাই—বিশেষতঃ সে একাকী বলিয়া যাইতে মন সরে নাই। পরিষ্কার আকাশ দেখিয়া বনমালী একাকীই সেদিন হাটে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে একটা সস্তাদরের পাঁচন কিনিয়া লইয়া সে বাড়ী ফিরিতে থাকে।

পথে পাঁচু আসিয়া তাহার নাগাল ধরে। সে জিজ্ঞাসা করে, বনমালী তোর মেয়ে কেমন আছেরে?

বনমালী বিমর্ষভাবে বলে, সুবিধের নয় খুড়ো।

সে কি রে, বলিয়া পাঁচু কি ভাবে। তারপর বলে, কাকে দেখাচ্চিস্?

দেখাবো আর কাকে, বনমালী গরুর লাঙ্গুল মলিয়া দিতে দিতে বলে, এই একটা পাঁচন নিয়ে যাচ্ছি দেখি কি হয়।

আজ কদিন হল জ্বর হয়েছে? পাঁচু প্রশ্ন করে। বনমালী উত্তর দেয়, আজ প্রায় তের দিন হল।

পাঁচু বলে, একবার হাঁসপাতালে নিয়ে যা না?

বনমালী বলে, ছোট মেয়ে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই কি করে খুড়ো—মা ছাড়া একদণ্ড মেয়ে থাকতে পারে না।

তা বটে, পাঁচু বলে, তবে না হয় বামনদাস কব্‌রেজকে দেখা। দিন এলে পরে পয়সা দিবি—এখন ত মেয়েকে বাঁচাতে হবে?

তাই যা হয় করা যাবে, বলিয়া বনমালী জোরে জোরে গাড়ী হাঁকাইতে থাকে।

আকাশটা পরিষ্কার ছিল বলিয়া অন্য দিনের মত কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা। কিন্তু সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই সারা প্রকৃতি থম্‌থমে হইয়া উঠে। পশ্চিম আকাশে ঘনাইয়া আসে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের মেঘ। গাছ পালাকে আর নড়িতে দেখা যায় না। সমস্ত জগৎ যেন একটা যায়গায় আসিয়া থামিয়া যায়—অচল অনড় স্পন্দনহীন জগতের চারিদিক ঘিরিয়া কি যেন একটা অশরীরী দৈত্য মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রলয়ের স্থচনা করিবে, সেইজন্য চুপ করিয়া দম লয়। একপ্রকার ফিকা কৃষ্ণবর্ণের দ্যুতিতে সারা আকাশ ভরিয়া যায়।

বনমালী আরও জোরে জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিয়া বলে, খুড়ো ঝড় উঠবে দেখচো?

পাঁচু বলে, আর কি এসে গেচি তো!

এখনও অনেকখানি পথ, বলিয়া বনমালী কেবলই গরুগুলাকে তাড়া দিতে থাকে। তার পথ যেন আর ফুরায় না। ঘরে মেয়ে কেমন আছে কে জানে।

পথের মাঝেই সমস্ত জগৎ কাঁপাইয়া আসে ঝড়। বড় বড় শিরীষ অশ্বত্থ, শাল, নারিকেল, তাল গাছগুলা উন্মত্তের মত আকাশের সাথে যেন লড়াই করিতে থাকে কিন্তু বারে বারে বিপর্য্যস্ত হয় তাহাদের শাখা প্রশাখাগুলি। কোথায় হয়ত কোন দুর্ব্বল শাখা বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় গাছের অঙ্গ হইতে, সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস করিতে থাকে গর্জ্জন। তাহার দুর্জ্জয় ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া পথের ধূলা বালি, আশে পাশে বাঁশঝাড় হইতে পাতা, কত লোকের ভাঙা ঘরের জীর্ণ চালের খড়, ঘুরিতে ঘুরিতে উড়িতে থাকে আকাশে। কর্ম্মব্যস্ত কৃষাণের দল যে যার কাজ ফেলিয়া রাখিয়া মাঠ হইতে পলাইয়া যায় আপন আপন ঘরে। গৃহবধূরা স্মরণ করে তাহাদের মধুসূদনকে।

বনমালী ও পাঁচুর চোখ মুখ ভরিয়া যায় ধূলায়। দূর আকাশের কোন্‌ প্রান্ত হইতে কক্কড়্‌ কড়্‌ করিয়া আকাশের দেবতা যেন পৃথিবীর

মানুষকে একবার শাসাইয়া দেন। আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ। উহাদের গাড়ী চলিতেছিল সেই পথে। গরুগুলা ভয়ে আর অগ্রসর হইতে চাহেনা। উভয়েই গরুগুলাকে কেবল পিটিতে থাকে। যতই পিটে ততই নির্ব্বোধ জীবগুলা ভয় পাইয়া মাঠের দিক ছাড়িয়া এদিক ওদিক করে। বনমালী ও পাঁচু বিরক্ত হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে।

দিগন্ত জোড়া উন্মুক্ত মাঠের মাঝে অসহায় অবস্থায় ঝড়ের দুর্দ্দান্ত দাপাদাপির মধ্যে তাহারা দুইটী প্রাণী কি যে করিবে ভাবিয়া পায়না। ওদিকে পশ্চিম আকাশের কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলা অসংখ্য দৈত্য দলের মত নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল যেন সারা ধরণীকে গ্রাস করিবে। ঝড়ের বেগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে। আশে পাশের অরণ্যের গর্জ্জন, আকাশের গর্জ্জন মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন সমস্ত সৃষ্টিকে তচনচ করিয়া দিবে বলিয়া ফুঁসিতেছে।

ঝড়ের উগ্রমূর্ত্তি সাধারণতঃ এদিকে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়না। তবে অসহায়ের মত ফাঁকা মাঠের মধ্যে পড়িয়া ঝড়কে ভয় করিবে না এমন কে আছে? বনমালী সভয়ে বলে, খুড়ো গরু দুটোকে খুলে দিয়ে এসো আমরা দৌড়ুই—কাছের কোন বাড়ীটাড়িতে গিয়ে দাঁড়াইগে!

পাঁচু আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলে, এখানে আর ঘর কোথায়? তার চেয়ে বরং এইখানেই থাকি—কোথায় গাছ ভেঙে মাথায় পড়্‌বে কি না পড়্‌বে—

কিন্তু ঝড় একাকীই আসে নাই, দলবল লইয়াই আসিয়াছে। সহসা আকাশের একপ্রান্ত যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। কক্কড়-কড়াৎ করিয়া কোথায় যেন বজ্রপাত হয়, দু'-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে। কিন্তু শুধু বৃষ্টিই নয়—শিলা বৃষ্টি! কামানের গোলার মত সজোরে চাপচাপ তুষার মাঠের চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়ে।

বনমালী বলে, খুড়ো শিল পড়্‌ছে—শীগ্‌গির গাড়ীর নীচে ঢোকো!

হামাগুড়ি দিয়া যে-যাহার গাড়ীর নীচে চলিয়া যায়। গাড়ীর উপর ঠক্ ঠক্ করিয়া বরফের চাঙ্গড় পড়িতে থাকে। গরুগুলা অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাইতে থাকে। বনমালী তাকায় পাঁচুর দিকে।

সমস্ত মাঠটায় পেঁজাতুলার মত তুষার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যতদূরে তাকানো যায় শুধু সাদা আর সাদা। পাঁচু বলে, এ তো বড় গেরোরে···

বনমালী বলে, এমন অসময়ে যে শীল পড়ে জীবনে এই পের্‌থম দেখলুম!

হ্যাঁ—চোৎ-বোশেখেই শিল হয় এইত জানি, পাঁচু বলে, এখন যাই কি ক'রে বল্‌দিকি?

শিল না থামলে আর আমাদের যাওয়া হচ্ছেনা, বলিয়া বনমালী হাতের কাছের কয়েকটা শিল কুড়াইয়া লইয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। তাহার দেখা দেখি পাঁচুও কয়েকটা শিল কুড়াইয়া লয়।

খানিক পরে শিল পড়া বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হয় না। আকাশের দিকে তাকাইয়া বনমালী বলে, চল খুড়ো এবার চলতে আরম্ভ করা যাক··

পাঁচু বলে, চল···

গাড়ী লইয়া উভয়ে চলিতে থাকে। পথের কাদায় কোথাও চাকা বসিয়া যায়—গাড়ী হইতে নামিয়া উহারা ঠেলে, কখনও চাকায় হাত লাগাইয়া চাকা ঘুরাইয়া দেয়।

অশ্রান্ত বারিপতনের মাঝে অসহায় চারিটা গরু ও উহারা ভিজিতে ভিজিতে চলে।···

কাঁদন কন্যাকে লইয়া থাকে ঘরে। ভাঙ্গা ঘর বনমালীর, চালে খড় নাই। দেয়ালের গায়ে বৃষ্টি পড়িয়া পড়িয়া ভিজা দাগ পড়িয়াছে।

কিছুক্ষণ আগে ঝড়ের সময় ঘরের উত্তরদিকের খানিকটা অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। জল ঝরিয়া মেঝেটা ভাসাইয়া দিয়াছে, কোথাও সৃষ্টি হইয়াছে গর্ত্ত। ইহারই এক কোণে কোনমতে বিছানা-মাদুরকে বাঁচাইয়া রুগ্না কন্যাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে কাঁদন। মলিন একটা কাঁথায় মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। মেঝের গর্ত্তের উপর জল পড়িয়া পড়িয়া ছিট্‌কাইয়া লাগে কাঁথায়, জলের বিন্দুর সহিত কাদার বিন্দু আসিয়া কাঁথাটার একদিকটা ভরাইয়া দেয়।

বাহিরে বৃষ্টির ধারা থামেনা, অবিশ্রান্ত ঝম্ ঝম্ করিয়া একটানা স্বরে কেবলই বৃষ্টি পড়িতে থাকে। সন্ধ্যা হইয়া আসে, কাঁদন পা টিপিয়া টিপিয়া পিছল মেঝের উপর দিয়া বাহিরে আসে। কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া ফিরিয়া আসে ঘরে। খেঁদির কপালে হাত রাখিয়া ঘন ঘন দেখে জ্বর কতখানি উঠিয়াছে। বেহুঁস হইয়া খেঁদি পড়িয়া আছে, ধুক্ ধুক্ করিয়া কেবল বুকটা এখনও নড়ে। পাশে পাথর বাটীতে কাঁদন জল রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই ভিজানো ছিল এক টুকরা ন্যাক্‌ড়া। সেটা তুলিয়া কাঁদন মেয়ের কপালে লাগাইয়া দেয়। জ্বরে জলপটীই দরিদ্রের একমাত্র ঔষধ।

কাঁদন মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকায়। সজাগ ভাবে কাণ পাতিয়া থাকে। একে মেয়ের জন্য মন তাহার ভাল নাই তাহার উপর প্রকৃতির দুর্য্যোগে স্বামী কোথায় রহিল, কোন বিপদ আপদ হইল কিনা কে জানে। দুর্ভাবনায় মাথা তাহার খারাপ হইয়া যাইবার যোগাড় হয়; যে ঝড়, যে শিলাবৃষ্টি।

খানিক পরে কাঁদনের দুর্ভাবনা দূর করিয়া দিয়া ভিজিয়া জাব্ হইয়া বনমালী ফিরিয়া আসে। প্রতিদিনকার মত গাড়ী গরু তুলিয়া রাখিয়া ঘরে আসে। পাঁচনের বোতলটা কাঁদনের হাতে দিয়া বলে, খুকী কেমন আছে?

কাঁদন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলে, বাঁচবে না !

বনমালী কাপড় ছাড়িয়া বসিবার যোগাড় করে কিন্তু বসে কোথায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছে জলে ? কন্যারই বিছানার একদিকে অবশেষে সে বসিয়া পড়ে। ঝড়-বৃষ্টি-শিলাপাতের সময় বনমালী কোথায় ছিল কাঁদন জিজ্ঞাসা করে। উত্তর শুনিয়া কাঁদন শিহরিয়া উঠে—মাগো এমন অবস্থায় শত্রুও যেন কখন না পড়ে। মনে মনে সে ভগবানের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইয়া বলে, তুমি ততক্ষণ একটু জল পটী দাও—আমি দুধটা গরম করিগে' ··

অনেকক্ষণ ধরিয়া জলে ভিজিয়া ভিজিয়া বনমালীর দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল—তাহার শীত করিতেছিল। একটু যেন তামাক খাইতে পারিলে হইত। সে বলে, যখন যাচ্ছো এক কল্‌কে তামাক যদি নিয়ে আসো !

তা' আন্‌ছি—তুমি জল পটী দাও বলিয়া কাঁদন আলোটা লইতে যায়।

বনমালী বলে, আর আলো কোথায় ?

কাঁদন বলে, তেল নেই··

হায় ভগবান ! বনমালী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলে, যাও শীগ্‌গির এসো।

দুয়ারের কুলুঙ্গী হইতে বাঁশের চোঙে-ভরা খানিকটা তামাক লইয়া কলিকায় দিয়া এবং এককোণ হইতে তালপাতার টোকাটা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া কাঁদন রান্নাঘরে চলিয়া যায়। রান্নাঘরেরও ঐ একই অবস্থা ! জলে জলময় হইয়া গিয়াছে। উনুনের ভিতর জমিয়াছে এক-উনুন জল। জলটাকে সেঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া কাঁদন ঘরের বেড়ার একদিকে আঁটী আঁটী করিয়া বাঁধিয়া রাখা নারিকেল পাতা টানিয়া লয়। এগুলি তাহার দুর্দ্দিনের সম্বল ! বহুদিন আগে এগুলি সে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কয়েকটি পাতা ভাঙ্গিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে

দিতে টোকা মাথায় আলো লইয়া আসে সে বনমালীর কাছে। কলিকাটা তাহার হাতে দিয়া বাহির হইতে হুঁকাটা আনিয়া দেয় কাঁদন। তারপর আবার যায় রান্নাঘরে। কাঁসিঢাকা দুধের বাটী বাহির করিয়া সাঁড়াশী করিয়া ধরিয়া নারিকেল পাতা জ্বালাইয়া দুধ গরম করে, তারপর দুধের বাটীও ঝিনুক লইয়া ফিরিয়া আসে ঘরে।

বনমালী হুঁকা টানিতে টানিতে বলে, জলপটী আর দোবনা। গা' ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

কাঁদন দুধের বাটী নামাইয়া বলে, তবে আর দিওনা বরং একটু দুধ খাইয়ে দিই···

মেয়ের কোন সাড়াশব্দ নাই। কোলে লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়ানো যাইবে না। মুখের ভিতর আঙুল দিয়া জোর করিয়া তাহাকে দুধ খাওয়ায় কাঁদন।

হায়রে, হায়! গরম দুধেও শরীর গরম হয় না মেয়ের। ক্রমশঃই যেন আরও ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে খেঁদির দেহ।

একি তবে মৃত্যুর নিঃশব্দ পদবিক্ষেপ! বনমালী ও কাঁদন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাহিরে বর্ষারাতের বর্ষণের বিরাম নাই, ঝিম্ ঝিমে একটানা বিরক্তিকর সুর। যেন এ বৃষ্টি সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে সুরু হইয়াছে আর অনন্তকাল ধরিয়া এমনি করিয়া কেবলই পড়িতে থাকিবে! বিপদের রাত্রি ভয়ের রাত্রি যাহাদের সম্মুখে হিংস্র বন্য জন্তুর মত ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, আজিকার বর্ষণমুখর আকাশ যেন সেই হিংস্র জানোয়ারের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কেবলই বৃষ্টি ঝরাইয়া তাহাদের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে। মাঝে মাঝে আকাশের এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে মেঘে মেঘে হয় ঠোকাঠুকি। হয়ত হইবে তাহা অনেক দূরে, তাই শুধু তাহার সহসাভাসা আলোটুকুই চোখে পড়ে, শব্দ পাওয়া যায় না! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কেবলই রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে।

সমস্ত পল্লীগ্রাম অবচেতনার জগতে বাস করিতেছে, স্বপ্ন জগতের মত বিচ্ছিন্ন কাহিনীর অর্থহীন সংযোজনায় তাহার প্রকাশ, তাহা চোখে পড়েনা, উপলব্ধি করাও যায়না, কেবল মানুষ নিজের আত্মার স্বরূপ জানিতে গিয়া যেমন বিশ্বের মানবাত্মার সন্ধান পায় তেমনি পল্লীবাসীরাও কেউ কেউ নিজ গৃহের স্বরূপ দেখিয়া পল্লীর সমস্ত গৃহগুলির কথা চিন্তা করিতে পারে। যে পারে সে ভাবে অন্যঘরেও তাহার মত জীবন-স্রোত বহিয়া চলিতেছে। বনমালী সাধারণ মানুষ। এতখানি ঠিক ভাবিতে পারেনা, তাই সে মনে করে তাহার মত দুঃখী জগতে আর কে আছে ?

স্তিমিত আলোকশিখায় ঘরখানার চেহারা হইয়া উঠিয়াছে অত্যন্ত করুণ! মৃত্যু যেন সে ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে! কাঁদন জিজ্ঞাসা করে, পাঁচনটা কখন খাওয়াতে হবে ?

বনমালী বলে, জর বন্ধ না হলে খাওয়ানো চলবেনা!

কাঁদন মেয়ের বুকে মুখে হাত বুলাইয়া বলে, এ যে খালি ঠাণ্ডা হয়েই আসছে।

বনমালী কি যেন ভাবে। কাঁদন বলে, ওগো তুমি আর ব'সে থেকনা একবার ডাক্তারবাড়ী যাও··

বনমালী বলে, আগুন কর—খুব ক'সে সেক দাও···

তা' না হয় আমি দিচ্ছি, বলিয়া কাঁদন উদ্বেগপূর্ণস্বরে পুনরায় বলে, তুমি যাও ডাক্তার বাড়ী যাও—

বনমালী উঠিয়া দাঁড়ায়। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন কি ভাবে। অভয় সিংহের কলাবাগানে চাকরী করিয়া সে মাসে আট টাকা বেতন পায়—হাটের দিন পায় শুধু খোরাকী! তাহাতে তিনটী প্রাণীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কি-ই বা তাহার থাকে যে সে ডাক্তার ডাকিবে ? ঘরে একটীও পয়সা নাই—শেষ পয়সাটী পর্য্যন্ত তাহার

গিয়াছে পাঁচন কিনিতে! তবু তাহাকে যাইতে হয়। যেমন হউক ডাক্তার তাহাকে আনিতেই হইবে—কাঁদনের এই আদেশ।

অন্ধকার পথ, অবিশ্রান্ত বর্ষণ—টোকা মাথায় বনমালী চলিতে থাকে হাঁসপাতালের দিকে। পথ ঘাট সব ভাসিয়া গিয়াছে। জলে জলময়, অন্ধকারে ছপ ছপ করিয়া সে চলে। পথের কোথাও খানা ডোবা, কোথাও বা পিছল কাদায় ভর্ত্তি। বনমালী আছাড় খাইয়া, আঘাত খাইয়া কেবলই চলিতে থাকে। বুকের মধ্যে তাহার কত কি কথা তোলপাড় করিয়া উঠে। খেঁদি কি তাহার বাঁচিবে না? খেঁদি কি তাহার মরিবেই, এতটুকু ঔষধের অভাবে, বিনা চিকিৎসায়? ভগবান, তাহাকে তুমি দিয়াছ যেমন, তেমনি বাঁচাইয়া রাখ—কাড়িয়া লইও না!

বনমালী যেন ছুটিতেছে, হয়ত দেরী হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে তাহার! পৃথিবী যেন অচেতন, সচেতন শুধু এই বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি! যেন দূরাগত একটা বুক ফাটা কান্নার সুর আসিয়া বনমালীর কাণে লাগে। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। কেবলই সেই সুর! কোন্ বেদনার উৎস হইতে সেই বুকফাটা আর্ত্তনাদ উঠিয়া আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে অন্ধকার রাত্রির শিলাকঠিন বুকের উপর? সে কি তবে···কল্পনা করিতেও বনমালীর হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে।

মরণকে কেন্দ্র করিয়া অনেক ঔপন্যাসিক, অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু দরিদ্রের গৃহের মৃত্যুর মত এমন আড়ম্বরহীন মৃত্যু আর কোথায় ঘটিয়াছে? অনুজ্জ্বল আলোকের দীপ্তি-ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে বসিয়া মৃত-সন্তানের বুকে মাথা রাখিয়া জননী কোথায় এমন বুকফাটা আর্ত্তনাদ করে? তুহিন-শীতল কি যেন একটা অশরীরী দৈত্য আসিয়া কাঁদনের খেঁদিকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে! তাই তো কাঁদন খেঁদির বুকে মাথা রাখিয়া ক্ষণে ক্ষণে অমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে।

আর বনমালী? ঐ-ঐ সেই আৰ্ত্তনাদ…বার বার, তাহার কাণে আসিয়া লাগে! বর্ষার অন্ধকার রাত্রির পৃথিবীকে চমকিত করিয়া দিয়া চীৎকার করিতে করিতে সে ছুটে, ডাক্তার…ডাক্তার…ডাক্তার!

কে জানে তাহাদের সেই মর্ম্ম-ভাঙ্গা ক্রন্দনরব কেউ শুনিতে পায় কিনা!

* * * *

উষার চলিয়া যাইবার দিনে অদ্বৈত বাগ্দীপাড়ার যে দশধারার মামলাটীর কথা উল্লেখ করিয়াছিল তাহাতে বুড়া হিরুবাগ্দীর দেড় বৎসর জেল হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আরও দশজনের ঐ একই রকমের দণ্ডাদেশ হয় কিন্তু সেছাড়া আর সকলেই অদ্বৈতর জামিনে খালাস পাইয়াছে। তাহারা সকলেই এক একটা মুচলেকা দিল আর চলিয়া গেল। হায়রে বুড়া হীরুরই কেবল কেহ নাই।

দশধারাটী হইতেছে ফৌজদারী কার্য্যবিধির একশো দশ ধারা। পল্লীগ্রামে ইহাকে বলে গ্রামবাদী মামলা। গ্রামের সমস্ত লোক হয় ফরিয়াদী—আর মামলা যাহাদের নামে আনয়ন করা হয় তাহারা হয় আসামী। এ মামলায় একবার আসামী হইলে জীবন তাহার জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইবে। গ্রামস্থ সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া এই মামলা করে। আদালতে মামলা উঠিবার পূর্ব্বেই ধরিতে গেলে এ মামলার রায় দেওয়া হইয়া যায়। কেননা, পূর্ব্ব হইতেই সাক্ষী-সাবুদ এমনভাবে সাজাইয়া রাখা হয় যাহার ফলে আদালতে কদাচিৎ তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। কারণ আসামীপক্ষ প্রায়ই হয় দরিদ্র শ্রেণীর, উকিল দিয়া লড়িবার মত পয়সা তাহাদের থাকেনা। গ্রামের দুর্দ্দান্ত, ভয়ঙ্কর, চোর, ডাকাত প্রকৃতির লোককে শাসনে রাখিবার জন্যই এই আইন। কিন্তু অনেকস্থলেই দেখা যায় গ্রামের প্রতিপত্তিশালী লোকেরা প্রায়ই তাহাদের শত্রুপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য এই সকল আইনের সুযোগ গ্রহণ করে!

কেমন করিয়া যে অদ্বৈত এই আইনটীর সুযোগ গ্রহণ করিল তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ করে বুড়া হীরু। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবার পর যখন আদালতের কনেষ্টবলরা তাহার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া জেলের দরজায় লইয়া আসিল, হীরু তখন নিতান্ত অসহায়ের মত দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, কি করিয়াছে সে! উত্তর সে পায় না। চোখের সম্মুখে তাহার বন্ধ হইয়া যায় কারাগারের লৌহদ্বার, বাহিরের পৃথিবী হইতে সে হইয়া পড়ে বিচ্ছিন্ন!

কারাগারের উদয়-অস্ত খাটুনীর মাঝে কখনও একটু যদি অবসর পায় ত ঐ একই কথা ভাবে, কি করিয়াছে সে যে তাহার এই শাস্তি?

ঠিক এই একই প্রশ্ন করে বাহিরের লোকগুলাও। ইহারাও উদয়াস্ত খাটে। বিনা পয়সার চাকুরী করে আশুবাবুর ক্ষেতে। বর্ষা শেষ হইয়া যায়, ধানের ক্ষেতগুলায় একহাঁটু জলে বসিয়া ধান নিড়াইতে হয়, রোপণের কাজ করিতে হয়। মাঝে মাঝে অদ্বৈত এদিকে বেড়াইতে আসে। ক্ষেতের আলের উপর দাঁড়াইয়া সে হাসিয়া বলে, হ্যাঁরে গোবিন্দ তুই যে বলেছিলি ভাগে কাজ আর করবিনি?

গোবিন্দ ঘাড় নীচু করিয়া কাজ করিতে থাকে। অদ্বৈত বলে, কেন বাপু হীরুর সঙ্গে সব পরামর্শ ক'রে তখন ভাগচাষ করবনা বল্লি। এখন মিছামিছি ত একটা ফাঁদে প'ড়ে রইলি? এখন আমি যদি বলি আর তোর জামিন থাকবনা এক্ষুনি পুলিশ এসে তোকে জেলে চালান ক'রে দেবে।

তাহা গোবিন্দ জানে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। এখন তিন বৎসরের জন্য তাহার মুক্তি নাই, তিন বৎসরের জন্য সে জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ। তাহা ছাড়া যখন একবার দাগী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে তখন সারাজীবনেও যে তাহার মুক্তি মিলিবে তাহার

আশা দুরাশারই নামান্তর। কোথাকার কোন চুরী ডাকাতিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে কতক্ষণ।

আশুবাবুর নূতন জমীদারী। এখন জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত নানারকম কাজই জমিদারীর অঙ্গ করিয়া লইতে হইয়াছে। যেমন করিয়া হউক প্রভূত ধনের অধিকারী হইতে হইবে, প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হইতে হইবে। কোনখানে একতিলও জমি থাকিবে না যাহা তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। জমিদারী সম্পর্কে আসিয়া তাঁহার জাগিয়াছে দুর্নিবার ক্ষুধা, সম্পত্তির ক্ষুধা, প্রভুত্বের ক্ষুধা। যেমন করিয়া হউক ছোট বড়, বিদ্বান-সজ্জন, মূর্খ-ইতর, ধনী-নির্ধন সকলকেই আনিতে হইবে তাঁহার মুঠার মধ্যে এবং শাসন করিয়া তাহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে হইবে—তিনি হইবেন এ অঞ্চলের একচ্ছত্র-অধিপতি। তাঁহার এই স্বপ্নকে সার্থক করিবার পথে, অদ্বৈতকে তিনি পাইয়াছেন উপযুক্ত সেনাপতিরূপে।

অদ্বৈতরই মতলবে তিনি গ্রামে সভা করেন। লোককে কৃষি-কার্য্যের উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। গ্রামের লোকে ভাবে—বাবু ঠিকই বলিতেছেন। আসল কথা তাহারা শুনিতে পায়না, আশুবাবুর ওজস্বিনী ভাষার মধ্য হইতে তাহারা যে নির্দ্দেশ পায়—তাহাকেই ভাবে তাহাদের জীবনযাত্রার সত্যকারের পথ, দুঃখাবসানের সত্যকার ইঙ্গিত। ইহাতে একটা সুবিধা হয় আশুবাবুর বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ জাগিতে পারেনা। যদিও অসন্তোষ কিছু থাকে, সব শেষ হইয়া যায় সভায় আসিয়া বক্তৃতা শুনিয়া! অদ্বৈত আশুবাবুকে বলে, দেখুন যাই করবেন তার পিছনে যেন একটা দার্শনিকতত্ত্ব থাকে। তা' ছাড়া আজকালকার দিনে জমিদারী রাখতে গেলে এসব চাই······

অদ্বৈত ঠিকই বলিয়াছে এবং তাঁহার জীবন যাত্রার আদর্শের সহিত অদ্বৈতর এই কথা খাপ খাইয়াছে! যেভাবে তিনি সারাজীবন

অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন তাহার গতিবেগকে বজায় রাখিতে হইলে তাঁহাকে ইহা করিতেই হইবে। জীবনযাত্রার পথে কত লোকের কত আদর্শ থাকে, তাহা সফল করিবার জন্য তাহাদের অসম্ভব প্রয়াসও চোখে পড়ে—তবে আশুবাবুর জীবনেই বা থাকিবে না কেন সেই প্রয়াস ?

প্রতিদিনকার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আশুবাবুর চোখের সুমুখে খুলিয়া যাইতেছে নব-নব জগৎ। অর্থাগমের নূতন নূতন পথ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া যাইতেছেন। এসব দেখিয়া সময় সময় তিনি ভাবেন, বৃথাই সরকারী চাকুরীর মোহে তাঁহাকে দিনের পর দিন জঙ্গলে জঙ্গলে কাটাইতে হইয়াছে। তাঁহার জীবনের চাকুরীর কালটুকু কাটিয়া গিয়াছে নিষ্ফলে। যদি তিনি কোনও রকমে সন্ধান পাইতেন যে পল্লীর মাঠে মাঠে ছড়ানো এত ধন-রত্ন, পল্লীর মাটিতে এত তেজস্কর রসধারা, পল্লীর প্রান্তরে জীবন এত স্বপ্নময় তাহা হইলে কবে দস্যুর মত এসবকে তিনি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া পলাইতেন। তিনি আসিয়াছেন বড় শেষ সময়ে! যাহা হউক তবু পল্লী-প্রকৃতিকে নির্ম্মমভাবে দোহন করিতে হইবে, কোথায় কোন অন্ধকার গুপ্ত-গহ্বরে পল্লীর ঐশ্বর্য্য লুকাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে তাঁহার ধনভাণ্ডারে। এখনও সময় আছে, তাঁহার জীবনের মত পল্লী-গ্রাম এখনও ধ্বংসের প্রান্তদেশে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। এখনও ইহার বুক হইতে প্রভূত ধনৈশ্বর্য্য ছিনাইয়া লওয়া যায়। ইহারই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আজকাল তাঁহাকে একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে দেয় না। কাজ—কাজ—কাজ! সমস্ত কর্ম্মচারীদের উপর তাঁর কড়া হুকুম এক মুহূর্ত্তও যেন কেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকে। চাই অফুরন্ত উৎসাহ, অসীম ধৈর্য্য আর বিপুল কর্ম্মক্ষমতা। কোন রকম দুর্ব্বলতা থাকিলে চলিবে না, এপথে আছে বহু চোখের জল, বহু মর্ম্মভেদী

আর্ত্তনাদ, কাতর আবেদন, অব্যর্থ অভিশাপ—এসবে ভুলিলে চলিবেনা, ভয় পাইলে চলিবেনা। হৃদয়াবেগের যাহারা দাস তাহাদের দ্বারা একাজ হইবে না!

জমিদারী ব্যাপারে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে আশুবাবু ছিলেন, উপন্যাসের কোন অসম্পূর্ণ চরিত্রের মত। সে চরিত্রের সম্বন্ধে যেন আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়া গিয়াছিল। নদীর একগুঁয়ে স্রোত ছিল, কিন্তু জলের অল্পতাহেতু সে স্রোতের উদ্দামতা ছিলনা। হঠাৎ অদ্বৈত আসিয়া আশুবাবুর জীবন-নদীতে বাণ ডাকাইয়া দিয়াছে, আজ তাহা দুইকূল প্লাবিত করিয়া অপ্রতিহতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে! যে কোন কাজ যতই শক্ত হউক না কেন, যতই অসুন্দর ও অশোভন হউক না কেন, আজকাল সে সকল করিতে আশুবাবুর আটকায় না। পূর্ব্বেও যে আটকাইয়াছে এমন নয়, তখন এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, তিনি জানিতেন না বলিয়াই আটকাইয়া যাইত।

এই দশধারার মামলায় আশুবাবুর কৃতিত্ব দেখা যায়।

দশধারার মামলা অবশ্য তাঁহার মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। সেদিক দিয়া রহিয়া গিয়াছে অদ্বৈতর হাত। আশুবাবু একাই সমস্ত কর্ম্মচারী ও গ্রামস্থ কয়েকজন কৃষককে ডাকাইয়া হীরু ও তাহার বাগ্দীপাড়ার দলটীর কথা বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। ওরা ছোটলোক ওরা যদি মাথায় উঠে তবে ভদ্রলোকের গ্রামে বাস করা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিবে, বিশেষতঃ যখন সকলকেই বউ-ঝি লইয়া বাস করিতে হয়।

অপরাধ বাগ্দীপাড়ার লোকের যতখানিই থাকুক বা না-ই থাকুক, আশুবাবু তাহাদের নামে মামলা আনিবেই কারণ বাগ্দীপাড়ার লোকেরা ভাগচাষের বিরুদ্ধে গ্রামের মধ্যে যাহা তাহা রটাইয়া বেড়াইতেছিল, বিদ্রোহের ধূমায়িত অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এ বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরেই যদি তিনি বিনষ্ট না করিতে পারেন তাহা

হইলে সমূহ ক্ষতি হইবে। অথচ তিনি মনে মনে জানেন বাগ্দীপাড়ার লোকেদের এ দাবী ন্যায়সঙ্গত এবং আইনের চক্ষেও ইহা বে-আইনী নয়। উহারা ত অন্যায় অসঙ্গত দাবী করে না, যাহা প্রাপ্য শুধু সেইটুকুতেই উহাদের দাবী। কেন আশুবাবু কি জানেন না যে বাগ্দীপাড়ার লোকেরা ভাগচাষে গত বছর অর্দ্ধেক ধান পায় নাই, নামমাত্র একটা অংশ পাইয়াছে? তাহা জানেন তিনি কিন্তু জমিদারী করিতে গেলে এ সব চাই, অদ্বৈত বলিয়াছে। তাই ইহাকে দমন করা তাঁহার দিক হইতে প্রয়োজন। এবং শুধু তাই নয়, দশধারার মামলায় যাহাদের শাস্তি হইবে তাহাদের জামিন দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে করায়ত্ত করিয়া শুধু দু'টি খাইতে দিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে জেলের ভয় দেখাইয়া তিনি তাহাদের ইচ্ছামত খাটাইয়া লইতে পারিবেন এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাইবে, সুতরাং এত বড় সুযোগ আশুবাবুর মত লোক ছাড়িয়া দেন কি করিয়া? উপস্থিত কর্ম্মচারীবৃন্দ ও গ্রামবাসিগণকে তিনি তাই নানারকম যুক্তি দিয়া, ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আশঙ্কান্বিত করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—জুড়িয়া দাও গ্রামবাদী মামলা। আদেশ মাত্র অনুযায়ী কাজ হইয়া গেল। যাহারা বুঝিল এ কাজটা আশুবাবুর অন্যায় হইতেছে, ভয়ে তাহারা কেহ কথা কহিতে পারিল না। আশুবাবুর বিরুদ্ধে বলিবে কে?

বলিবার কেহ নাই বলিয়াই আজ বুড়া হীরুকে খাটিতে হইতেছে জেলে, আর তাহার দলটীকে খাটিতে হইতেছে আশুবাবুর ক্ষেত খামারে।

আশুবাবুর জীবনের অন্য কোন স্বপ্ন নাই। কি করিয়া পৃথিবীর বেশীর ভাগ ভূমি তাঁহার করায়ত্ত হইবে এই স্বপ্নেই তিনি বিভোর…

প্রতিদিন তিনি সাফল্যলাভ করিতেছেন। মানুষের শরীরের বিষাক্ত ঘায়ের মত তাঁহার হস্ত পৃথিবীর বুকে, দিন দিনই প্রসারিত হইতেছে। তবু, তবু চারিদিকে বেড়াজাল ফেলিতে হইবে, আরও

অগ্রসর হইতে হইবে, দ্রুত অতি দ্রুততালে। সংসার দুর্ব্বলতার স্থল নয়, মানুষের হৃদয়ের কোন মূল্য নাই তাঁহার কাছে। কন্যা উষার আবেদন নিবেদনেও তিনি কোনদিন এতটুকু টলেন নাই। হয়ত কন্যাকে তিনি এই জন্যই একদিন হারাইবেন, সে রকম ধারণাও তাঁহার আছে কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? আজকালকার ছেলে-মেয়েরা পিতা মাতার বন্ধনে থাকিতে চাহে না। কন্যা যদি তাঁহার মতে চলাটাকে বন্ধন বলিয়া মনে করে এবং যদি সে এরূপ বন্ধন হইতে দূরে থাকিতেই চায় ত তিনি তাহার এই আকাঙ্খার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবেন কেন? কন্যার ছিচকাঁদুনে স্বভাবের হৃদয়াবেগ সহ্য করিবার জন্য? অতখানি কাপুরুষ হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। সে কলিকাতায় গিয়াছে তিনি বাঁচিয়াছেন!

তখন বেলা প্রায় দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। আহারাদির পর আশুবাবু নিজের ঘরে বসিয়া সেদিনকার সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে তাঁহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে অদ্বৈত। আশুবাবু তাহাকে দেখিয়াই প্রশ্ন করেন, কি অদ্বৈত খবর কি?

খবর খুব ভাল, বলিয়া অদ্বৈত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে থাকে।

কিরকম, আশুবাবু যেন নূতন কিছু শুনিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন।

অদ্বৈত হাসিয়া বলে, দক্ষিণ পাড়া আমাদের হাতে আস্‌তে আর সাত দিন মাত্র।

তাই নাকি, বিস্ময়ান্বিত ভাবে আশুবাবু প্রশ্ন করেন। অদ্বৈত বলে, হ্যাঁ—সেই যে অম্বিকাবাবুকে দিয়ে বনমালী বলে লোকটাকে টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল এইবার তাকে ঠিক বাগে পাওয়া গেছে। দেনার দায়ে সে বাড়ী বিক্রী করতে চায়। দক্ষিণ পাড়ার মধ্যে ঐ লোকটাই সবচেয়ে শক্ত লোক।

ও, বলিয়া আশুবাবু পুনরায় বলেন, কিন্তু তাতে দক্ষিণ পাড়া আমাদের হাতে আস্‌বে কি করে ?

এসম্বন্ধে আমার একটা প্ল্যান আছে, অদ্বৈত বলে।

আশুবাবু বলেন, কি রকম শুনি ?

যথাসময়ে আপনাকে বলব—এখনও সেটা এক্সপেরিমেণ্টাল, বলিয়া হাসিতে হাসিতে অদ্বৈত ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়। আশুবাবু অদ্বৈতের বুদ্ধির গভীরতার কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ এইরকম ছেলেরই দরকার তাঁহার।

* * * *

প্রায় মাস তিনেক হইল নিরাপদ সরকার মশায়ের সাথে এই অমরপুর গ্রামে আসিয়াছে। এখানে তাহার ভালই লাগিয়াছে। সরকার মশায়ের স্ত্রী করুণাময়ী বেশ চমৎকার। দুইটী ছেলে একটী মেয়েকে লইয়া বেশ সুন্দর একটী সুখনীড় বাঁধিয়াছে করুণাময়ী। দুঃখের সংসার বটে, কিন্তু নারীর কল্যাণ হাতের স্পর্শে তাহা যে কত কমনীয় এবং সুখকর হইয়া উঠিয়াছে তাহা সরকার মহাশয়ের সংসারে মুহূর্ত্তের অতিথি হইয়া আসিলেও বুঝা যায়।

নিরাপদ এই রকমই ভালবাসে। জীবনে সে এইরকম দুইটী নারীর সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং বুঝিয়াছে জগতে নারীর হস্ত যেখানে পড়ে নাই সেখানে সুখ বলিয়া কোন জিনিষই নাই। সে দেখিয়াছে কাঁদনের সংসার আর দেখিল করুণাময়ীর সংসার। দুঃখের অসহ্য ক্ষত-যন্ত্রণার উপর শীতল প্রলেপ লাগাইতে হইলে চাই এমনিতরো সংসার।

বর্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। মনটা নিরাপদর কেবলই যাই যাই করিতেছে। যেন সে কতদিন আসিয়াছে এখানে। এখানে আসিয়া প্রথমেই সে গিয়াছিল তাহার স্বগ্রামে, তাহাদের ঘর যেখানে ছিল আন্দাজ করিয়া সে সরকার মশায়ের সাথে সেখানে যায়। তাহাদের

ঘর কোনখানে ছিল সে বুঝিতে পারে না। গ্রামের একজন বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারে, রামপদ ভুঁইয়ার বাড়ী যেখানে ছিল সেখানে আজ গোঁসাইদের পাকা বাড়ী উঠিয়াছে। কোন চিহ্ন নাই তাহাদের বাড়ীর।

অমরপুর গ্রামখানি বেশ। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ—তাহারই ছোট্ট একটু যায়গায় খানিকটা ঘন-বসতি। অমরপুরের পাশেই কামারপুকুর গ্রাম। এইখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকার মশায় নিরাপদকে পরমহংসদেবের বাড়ী দেখাইয়া লইয়া আসে। সেই আমবাগান ঘেরা ছোট গ্রামখানির মাঝে ছোট্ট একখানি কুড়ে ঘর। নিরাপদ দেখিয়া ভাবে, এত ছোট ঘরে এত বড় লোক জন্মায় কি করিয়া। বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই বাঁ দিকে ঢেঁকিশাল পড়ে—ঐখানেই ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হন। সুমুখেই ঠাকুরের পূজার ঘর। বাড়ীর পাশে ছবির সেই তাল গাছটা রহিয়াছে দাঁড়াইয়া, তাহার পাশেই পুষ্করিণী, উত্তর দিকে আমতলায় ভাঙা মন্দিরটা, মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে সরু পথ।

নিরাপদ ঠাকুরের পূজার ঘরের সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করে। সরকার মশাই বলেন, জান নিরাপদ খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে দেশ-বিদেশে ঠাকুরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা। সকলের মতে ইনি হচ্ছেন জগতের এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক।

নিরাপদ তাহা সঠিক না জানিলেও রামকৃষ্ণ দেব যে ভগবানের অবতার তাহা সে জানে এবং ইঁহারই শিষ্য বিবেকানন্দ যে জগৎ আলো করিয়া গিয়াছেন তাহাও তাহার অজানা নাই। তবু নিরাপদ যেন এক নূতন জায়গা দেখিল এবং মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিল এই ভাবিয়া যে এমন একজন মহাপুরুষ তাহারই জন্মভূমির অত্যন্ত নিকটে প্রায় ক্রোশ দুয়েকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ দেবের বাড়ীর কিছু পূর্ব্বদিক দিয়া গিয়াছে কটক রোড। বাঙলা দেশে যখন রেলপথের সৃষ্টি হয় নাই তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই লোক এই পথে যাতায়াত করিত; বিশেষ করিয়া রথযাত্রার সময় এই পথ দিয়া দিনরাত্রি লোক চলাচল করিত। পুরীতে রথযাত্রার মেলা তখনকার দিনের এক ভয়ানক ব্যাপার! পুরাতন দিনের স্মৃতিস্বরূপ কটক রোডের উপর এখনও কামারপুকুর চটীটির চিহ্ন রহিয়াছে। এই পথেরই দক্ষিণ দিকে পড়ে গড়মান্দারণ।

এই গড়মান্দারণ দেখিয়াই নিরাপদর মন খারাপ হইয়া যায়। ফিরিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কামারপুকুর হইতে প্রায় মাইল চারেক উত্তরে কটক রোড ও অহল্যাবাঈ রোড যেখানে পরস্পর পরস্পারের সাথে মিশিয়াছে সেখানটার নাম ব্যাঙাই চৌমাথা। অমরপুর আসিবার দিন ঐ পথ দিয়াই নিরাপদদের আসিতে হইয়াছিল। গড়-মান্দারণ দেখিতে যাইবার সময় সরকার মশাই ব্যাঙাই চৌমাথার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, নিরাপদ বাইস্কোপে তুমি যে জগৎসিংহকে দেখেছিলে না ঐ পথ দিয়েই তিনি গড়মান্দারণে আসেন। ঐ চৌমাথার সোজা পশ্চিম দিকে অহল্যাবাঈ রোড চলে গেছে কোতলপুর। কোতলপুর থেকে আবার পথ গেছে বিষ্ণুপুর। সেই বিষ্ণুপুর পার হয়ে কোতলপুরের ভেতর দিয়ে, ব্যাঙাই চৌমাথা পার হয়ে তবে জগৎসিংহকে আসতে হয়।

ব্যাঙাই চৌমাথার কথা উঠিতেই নিরাপদর গা'টা কি রকম যেন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠে। ব্যাঙাই চৌমাথা হইতে কটক রোড দিয়া দক্ষিণে আসিতে প্রায় চারিশত গজ দূরে অধুনালুপ্ত হরিশপুর গ্রামের সেই বিরাট পুষ্করিণীটা আজিও হাজিয়া মজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আর তাহারই চারিপাশের উঁচুপাড়ের মাটীর ঢিবির নীচে কত হাজার হাজার মানুষের মাথার খুলি পুঁতিয়াছে। সরকার মশায়ের নিকট হইতে আসিবার

সময় সে একথা শোনে। তখনকার দিনে লোকজনকে যাতায়াত করিতে হইলে, ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে হইলে ঐ ব্যাঙাই চৌমাথা ছাড়া আর উপায় ছিলনা। যাহারা দল বাঁধিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দিনের বেলায় পথ চলিত তাহারা হয়ত বাঁচিয়া যাইত কিন্তু সন্ধ্যার পর যে কেহই এপথে পা বাড়াইত সেদিন আর তাহাদের প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইত না। ডাকাতের দল তাহাদের মারিয়া ফেলিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া হতভাগাদের মৃত দেহটাকে ঐ পুকুর পাড়ের মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলিত। আজকাল আর সেদিন নাই, লোকে নির্ভয়ে চলাফেরা করিয়া থাকে। কিন্তু নিরাপদ নবাগত তাই তাহার চোখে অতীত দিনের ভয়াল ছবি অতীতদিনের মতই ভয়ঙ্কর হইয়া ফুটিয়া উঠে।

গড়মান্দারণ যেদিকে ব্যাঙাই চৌমাথা ঠিক তাহার উল্টো দিকে। গড়মান্দারণ হইতে উত্তর দিকে প্রায় সাত আট মাইল গেলে তবে ব্যাঙাই চৌমাথা পাওয়া যায়। কামারপুকুর পড়ে মাঝখানে। সরকার মশায়ের সাথে নিরাপদ চলিতে থাকে। অজানা অচেনা জায়গা, সব কিছুই আশ্চর্য্যজনক, রহস্যময়। নিরাপদ শিশুর মত কেবলই সরকার মশাইকে প্রশ্ন করিতে থাকে, এটা কি ওটা কি ?

বর্ষাশেষের পল্লীগ্রামের কর্দ্দমাক্ত পথ। আঠার মত কাদায় পা' বাধিয়া যায়, দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না, তাহার তবুও দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গড়মান্দারণের কাছে আসিতে তাহাদের বেলা দশটা বাজিয়া যায়। মান্দারণের ভিতর যাইবার কোন পথ নাই, ভ্রাম্যমান পথিকের পথ-চলায় কোথাও কোথাও যদিও চিহ্ন দেখা যায় ত তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। হয়ত কোন কাঁটা ঝোপে কিম্বা হোগ্‌লাবনে লইয়া গিয়া তুলিবে। গড়মান্দারণের চারিদিক কণ্টকাকীর্ণ, নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ। তাহারই ভিতর কোথাও দেখা যায় বীরেন্দ্রসিংহের প্রাসাদের শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ। যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই জঙ্গল ভীষণ হইয়া উঠে।

পথের চিহ্ন কোনখানে নাই, পাহাড়ের চড়াই-উৎরাইয়ের মত গড়ের ঢেউ খেলানো দুর্গ-প্রাকার কোথাও ভীষণ উঁচু, কোথাও নামিয়া গিয়াছে পাতাল পুরীতে। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এইরকম করিয়া প্রাসাদের চারিদিকে গড় নির্ম্মাণ করা তখনকার দিনের একটী অপরিহার্য্য রীতি ছিল। উঁচু উঁচু ঢিবিগুলার উপর বড় বড় শাল, সেগুণ, শিরীষ, শিশু, ঘোড়ানিম প্রভৃতি বৃক্ষরাজি সহস্র সহস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া চারিদিকের আবহাওয়াটাকে ভয়াবহ করিয়া রাখিয়াছে। ঘন অরণ্যের বিস্তৃতি দেখিলে যেমন ভয় করে আবার তেমনি মন শান্ত-সমাহিত হইয়া উঠে। এই নিবিড় অরণ্য-জগতেই ভারতবর্ষের সভ্যতার জন্ম। এসব কথা অবশ্য নিরাপদ জানে না, জানেন সরকার মশাই।

নীচে লজ্জাবতী, কুলেখাড়া আকর, বাব্‌লাচারা প্রভৃতি কাঁটা গাছে ভর্ত্তি। সাবধানে নামিতে হয়। একবার পা' পিছ্‌লাইয়া গেলে আর রক্ষা নাই—ঢালু পথে কাঁটা ঝোপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িতে হইবে একেবারে নীচে। তাহার পর মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে কিনা তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বর্ষার জল গড়াইয়া গড়াইয়া নীচে জমিয়াছে—মজিয়া যাওয়া বিরাট সরোবরের মত তাহার দৃশ্য। সমস্ত জলাশয়টা ভরিয়া গিয়াছে পদ্ম-পাতায়, কলমীলতায় আর জলজ-কাঁটা-লতায়। কত জল সেখানে কে জানে। ঢালু পথে নামিয়া জলাশয়ের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া অন্য কোন ঢিবিতে উঠিতে হয়। সেখান হইতে আশে-পাশের সমস্ত গ্রামগুলি দেখা যায়। ঐ পূর্ব্বদিকে শৈলেশ্বরের মন্দির! ঐ মন্দিরেই ঝড়ের সময় জগৎসিংহ আসিয়া তিলোত্তমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে। বীরেন্দ্রসিংহ যখন বাঁচিয়াছিল তখন মন্দিরের রূপ কিরকম ছিল তা কে জানে। নিরাপদ বায়স্কোপে দেখিয়াছে বেশ ভালই। সরকার মশাই বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে যাহা

পড়িয়াছেন তাহাতে মন্দিরের বর্ণনা ভালই লাগিয়াছে। এখন শুধু জীর্ণ ঘরের মধ্যে শৈলেশ্বর দেবের বিগ্রহ রক্ষা করিয়া রাখা হইয়াছে। উত্তরে গোঘাট, দক্ষিণে নকুন্দা, আমোদর চলিয়াছে আঁকিয়া বাঁকিয়া—বর্ষায় সঙ্কীর্ণ রেখা ফুলিয়া-ফাঁপিয়া মাঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

নিরাপদর মনে কত কথা উঠিতেছে। এই বিস্তীর্ণ বন প্রান্তর একদিন জনপদবহুল রাজপুরী ছিল—কত সৈন্য সামন্ত, রাজকর্ম্মচারী, ভৃত্যাতে পূর্ণ ছিল। দাসদাসী পরিবেষ্টিতা রাণী আর তিলোত্তমার মধুর ব্যবহারে অন্তঃপুর থাকিত মুখর হইয়া, মধুময় হইয়া। আজ সকলই স্বপ্ন! অতীতের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে কি যেন এক হাহাকারের ইঙ্গিত লুকাইয়া থাকে। নিরাপদর বুকখানা তাহারই দোলায় দুলিয়া উঠে।

ছবির পর্দ্দায় দুর্গেশনন্দিনীর যে কাহিনী সে দেখিয়াছে তাহা হইতে এ যেন সম্পূর্ণ নূতন। হউক ইহা ধ্বংসস্তূপ তবু ইহাই সত্য। এই রকম কালের কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত স্তূপের মধ্যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বিশেষ করিয়া এই জনমানবশূন্য ভীষণ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সে যেন উপলব্ধি করিতে পারে মহাকালের গতি, তাহার সাথে মানুষের জীবনের স্থায়িত্ব ও তাহার পরিণতি। নিজের জীবনের ফেলিয়া আসা দিনগুলির দিকে সে তাকায়, অনেককিছুই স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে। জগতের পরিবর্ত্তনশীল রূপটা যেন আরও বেশী করিয়া তাহার চোখে ধরা পড়ে।

একদিনে গড়মান্দারণ দেখা অসম্ভব। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি জিনিষ দেখিতে গেলে অমন কয়েকটা দিনের প্রয়োজন। সকাল বেলায় করুণাময়ীর রাত্রে প্রস্তুত করিয়া রাখা রুটী খাইয়া তাহারা পথে বাহির হইয়াছিল বটে কিন্তু পথের ক্লেশে তাহাদের জঠরে ক্ষুধার অগ্নি সংযোগ হইতে বেশী দেরী লাগে নাই। বৈকালে নকুন্দার ওদিক দিয়া মাইল চারেক ঘুরিয়া গোঘাটার উপর দিয়া অহল্যাবাঈ রোড অভিমুখে তাহারা চলিতে থাকে। পথে গড়মান্দারণের অন্যতম প্রবেশদ্বারের ভগ্নাবশেষ

চোখে পড়ে। কি বিশাল দ্বার—যেমনি উঁচু তেমনি চওড়া। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইয়া আসে, আকাশে উঠে চাঁদ। জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি হইয়া উঠে ঐশ্বর্য্যময়ী। পল্লীগ্রামের আম কাঁঠালের গাছে-ঘেরা পথে জ্যোৎস্না পড়ে ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া। অহল্যাবাঈ রোডে উঠিয়া তাহারা বিদায় লয় জগৎসিংহ ও ওসমান বীরদ্বয়ের দ্বন্দ্বভূমি গড়মান্দারণ হইতে।

পথে যাইতে যাইতে নিরাপদর মনটা কেন কি জানি খারাপ হইয়া যায়। পথের দুইদিকে দিগন্তজোড়া সবুজ মাঠ জ্যোৎস্নার বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। দূরের জঙ্গলগুলিকে মনে হয় কোন রহস্যময় মায়ালোক। সে দিকে তাকাইলে বুকটা বেদনায় ভরিয়া উঠে, চোখে জল আসে। অহল্যাবাঈ রোডের কর্দ্দমময় বুকের উপর দিয়া তাহারা চলে, পায়ে পায়ে নরম কাদার শব্দ হয়—নিপীড়িত মানবাত্মার অস্ফুট গোঙানীর মত। সে শব্দ যেন আকাশের জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রাতপে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে মাটীরই বুকে। কে জানে জ্যোৎস্নার নিগূঢ়তত্ত্ব ইহাই কি না?

নিরাপদ সরকারমশাইকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বলুন ত আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন?

বড় কঠিন প্রশ্ন নিরাপদ। এই দুঃখময় জগতে দুঃখের উৎস কোথায় তাহা যদি মানুষ জানিবে ত এত দুঃখ পৃথিবীতে থাকিবে কেন? যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানুষের সভ্যতা ছুটিয়া চলিতেছে—সেই পথে যতকিছু অসুন্দর, যতকিছু অপ্রীতিকর, যতকিছু অন্যায় তাহা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তবু কেন এত দুঃখ, জীবন এত কষ্টকর—একথা মানুষ কোনদিন খুঁজিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাই মানুষের ইতিহাসে তাহার সঠিক কোন অভিজ্ঞতা নাই, নির্দ্দেশও নাই, আছে শুধু অবাস্তব স্বপ্নের কাহিনী। মানুষ সেই সকল মিথ্যা

কথায় ভুলিয়াছে, ভুলাইয়াছে। সরকারমশাই সাধারণ মানুষ। তত্ত্বকথা মুখস্থ করিয়া জীবনের জ্বালা ভুলিয়া থাকাটাই ঐ জাতীয় মানুষের কাজ! তবু নিরাপদর কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সরকারমশাই প্রশ্ন করেন, কিসের দুঃখ নিরাপদ?

দুঃখ যে কি নিরাপদই কি তাহা বলিতে পারে? অগুছানো জীবনের অসংলগ্ন কাহিনীর সমালোচনা করিবার মত শক্তি তাহার নাই। যখন বুকের ভিতর মর্ম্মান্তিক দুঃখের ঢেউ আসিয়া চক্ষুদুটাকে জলে ভরাইয়া দেয় তখনই সে নিজেকে দুঃখী বলিয়া ভাবিতে পারে তাহা ছাড়া সব কিছু ভুলিয়া থাকাই তাহার জীবনের নিয়ম!

কিন্তু আজ যেন তাহার জীবনের সব নিয়মগুলাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খুলিয়া গিয়াছে। আজ সে নিজকে প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তে দুঃখী বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেছে। কিন্তু সে গুছাইয়া কিছু বলিতে পারিতেছে না! অথচ বুকের ভিতর কত কথাই না তোলপাড় করিয়া বেড়ায়! সে বলে, সরকার মশাই, সে যে কি ভয়ানক তা আমি বলতে পারছিনা।

কি করিয়া বলিবে হতভাগা? জীবনে সে কাব্য করিতে শিখে নাই, আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বও সে জানেনা—বিনাইয়া বিনাইয়া বক্তৃতা করিয়া বলিবে কি করিয়া? জীবনের জ্বালাময়ী অভিজ্ঞতাই যার কাব্য. প্রতি মুহূর্ত্তের হতাশাই যার জীবনের আধ্যাত্মিকতার সোপান, অন্তরের দুঃখকে ব্যক্ত করিতে গেলে তাহাকে জীবনের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা ও হতাশার মুহূর্ত্তগুলিরই সাহায্য লইতে হইবে! এই মিথ্যার জগতে কি তাহাকে দুঃখ প্রকাশের ভাষা বলা হয়? অথচ সে-ছাড়া আর ভাষাই বা দুঃখিতদের কোথায়? বলিতে পারে না নিরাপদ।

তাহার না বলিতে পারার অক্ষমতা সরকারমশায়ের চিত্তে কি

এক ব্যথার অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। নিরাপদ ভাল করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলে এবং এটা অন্য সময় হইলে হয়ত সরকারমশাই লীলাময়ের নানারকম লীলার কথা বলিয়া যাইতেন। মানুষকে দুঃখ দেওয়া লীলাময়ের আরেক লীলা—এসব কথা তিনি নানারকম ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত বাণীর দ্বারা সমর্থনও করিতেন। কিন্তু আজ নিরাপদর কথায় কি যেন একটা ইঙ্গিত ছিল। সে ইঙ্গিত তিনি বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিয়াছে তাহার ভিতরকার ব্যথাক্লিষ্ট মানুষটা। কোন্ সময়ে যে কোন্ কথাটা মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে লাগিয়া সুরের ঝঙ্কার তোলে মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ হয়ত তাহা বলিতে পারেন কিন্তু সরকারমশায়ের ত সে জ্ঞান নাই, তাই নিরাপদর কথায় আজ তাঁহার মনে পড়িয়া যায় জীবনের ছোট বড় সকল ঘটনা। দুঃখ সহিয়া সহিয়া মানুষের জীবন এমন হইয়া উঠিয়াছে যে কোনও সহানুভূতিসূচক কথা শুনিলে আপনা আপনিই সব অতীত কাহিনীগুলি মনে পড়িয়া যায়। আর সে সব মনে পড়ে বলিয়াই চক্ষু দুইটী আপনা হইতে ভিজিয়া উঠে।

চলিতে চলিতে সরকারমশায় নিরাপদর কথাগুলি শুনিতে থাকেন। নিরাপদ বলিয়া চলে, সরকার মশাই মানুষের জীবনে কত কি যে ঘটে! ধরুন আমারই কথা—কোথায় ছিলুম আর কোথায় এসেচি। সংসারে আমারও একদিন মা-বাপ ছিল, আমি ও আর সব মানুষের মত পৃথিবীতে এসেচি কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। আজ তারাও কেউ বেঁচে নেই আর আমারও দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। অথচ সরকার মশাই, বল্‌লে বিশ্বাস করবেন না, নাকে দড়ি পড়ে গরু যেমন করে বোঝা ভর্ত্তি গাড়ী টেনে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি করে সংসারের বোঝা টেনে নিয়ে চলেচি। আবার মজা দেখুন, দুনিয়ায় আমার কেউই নেই।

বলিতে বলিতে নিরাপদ হঠাৎ থামিয়া যায়। উভয়ে নিঃশব্দে পথ

চলে। আবার কি ভাবিয়া নিরাপদ বলিতে থাকে, শুধু একটা বোন—তা সেও আজ আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে কিন্তু কি করব মার পেটের বোন! তাকে দেখ্‌লে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে—ঠিক যেন মায়ের মুখখানা কেটে বসানো। সরকার মশাই একবার মনে হয় তাকে ঘরে নিয়ে এসে রেখে দিই কিন্তু লোকের ভয়ে তা পারি না।

সরকার মশাই জানেন সে কাহিনী। নিরাপদর কথায় তাঁহার হৃদয়ের কত অকথিত কথা বাহিরে আসিবার জন্য যেন তোলপাড় করিয়া উঠিতেছিল, তিনি সেই সকল কথার আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইতে খাইতে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ যেন তিনি শুনিলেন নিরাপদর ভগিনীর কাহিনী। তাই সায় দিয়া বলিয়া উঠেন, সে ত বটে!

শুধু তাই নয় সরকারমশাই—বনমালীর সংসারে আমি জড়িয়ে আছি। আমার খালি মনে হয় বোধহয় আমি তাদের কষ্ট দিচ্ছি। বেচারীর অবস্থা দেখলে আমার কান্না পায়, মেয়ে, বউ নিয়ে মাঝে মাঝে সে এমনি ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে! রোগ শোক ত লেগেই আছে কিন্তু পয়সা কোথায় প্রতিকারের? সময় সময় এমনি হাহাকার ওঠে মনে হয় সব ছেড়ে দিয়ে সংসার থেকে পাড়ি দিই, বলিতে বলিতে নিরাপদ চলিতে থাকে।

সরকারমশাই যেন খানিকটা হাসিয়াই বলিয়া উঠেন, তাহলে ত চুকে যেত সব ল্যাটা। ভাই, আমারও সময় সময় এমনধারা হয় কিন্তু কি ক'রব হাজার দুঃখতেও মানুষ মরতে পারেনা। অথচ চিরদিনই কি আমাদের এমনি দৈন্য-দশা ছিল। আমাদেরও জমি জায়গা অনেক ছিল। কিন্তু সে সব বলে আজ আর লাভ নেই। আমার বাবাকে ঠকিয়ে সব নিয়েছে! তবে তার জন্যে আজ আর আমার আক্ষেপ নেই নিরাপদ। জানি এজগতের রীতিই এই—মানুষ এখানে স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার করাই এখানকার ধর্ম্ম। নিরুপায়

আমরা তাই কিছু করতে পারিনি। তা' নাহ'লে আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন দু'চার টাকা ক'রে ঘুষ খেয়ে আদালতে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে এল বললে, ও-জমি মুখুয্যে মশায়ের।' ঐ যে গাঁয়ে ঢুকতেই পাকা দালান যাদের। জান ভাই নিরাপদ এমনি করে সর্ব্বস্ব আমাদের গেছে। আছে শুধু ঐ বাস্তু ভিটেটুকু!

সরকারমশায়ের কথার সাথে যেন নিরাপদের কথারও মিল রহিয়াছে। নিরাপদ ভাবে হয়ত অমনি করিয়াই একদিন তাহাদেরও সর্ব্বস্ব গিয়াছে।

সরকার মশায় বলেন, ভাগ্যি কোন রকমে গ্রামের মাইনর ইস্কুল পর্য্যন্ত পড়েছিলুম তাই আজ ক'রে খেতে পাচ্ছি তা' না হ'লে কি যে করতুম তাই শুধু ভাবি!

ওঃ! সে কথা আর বল্‌বেননা, কম কষ্টটা তাহ'লে আপনাকে ভোগ করতে হ'ত, বলিয়া নিরাপদ একরকমের দুঃখের হাসি হাসে। তারপর বলে, এই ত আমরা—উদয়াস্ত খাটুনী আমাদের!

আজ এই পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ ইহাদের জীবনে কোন এক অলৌকিক দৈবীমুহূর্ত্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একথার অর্থ এই যে, ইহারা এতকথা জানেনা. জীবনে দুঃখ আছে বটে কিন্তু সেই দুঃখের আয়নায় এমন করিয়া মুখ দেখিতে ইহারা শিখে নাই। কে জানে হয়ত মানুষ অনুকূল আবহাওয়া পাইলে এমনি করিয়াই ভাবে। গড়-মান্দারণের বিস্তৃত বনময়, প্রান্তর আকাশের চাঁদ, জ্যোৎস্নার বন্যা আর দিগন্ত জোড়া ধূ ধূ করা মাঠ কি তবে ইহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবার পক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে? হইবেও বা—প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেক সময়ে মানুষের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। তাহা না হইলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আবহাওয়ায় মানুষজাতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চোখে পড়িবে কেন?

নিরাপদ বলে, আজ বুঝতে পারছি সরকারমশাই কেন আমাদের জীবনে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত জ্বালা ?

সরকার মশায় বলেন, সেকথা কে না জানে নিরাপদ ?

নিরাপদ নিজের সত্যকার অভিজ্ঞতার নজীর দেখাইয়া জীবনে এই প্রথম প্রতিবাদ করিয়া বলে, না সরকার মশাই। আমি ভাবতুম বুঝি ভগবানই আমাদের এমনিধারা দুঃখের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েচে !

তুমি যদি তা ভেবে থাক নিরাপদ, তুমি ভুলই ভেবেচো, সরকার মশায় বলিতে থাকেন, ঈশ্বরের রাজত্বে ছোট বড় ব'লে কেউ নেই ! তিনি যখন আমাদের পৃথিবীতে পাঠান তখন আমাদের ডেকে কোনো লেখাপড়া ক'রে পাঠান না যে আমাদের এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে প'ড়ে থাকতে হবে। ঈশ্বর কি এতই নিষ্ঠুর হবে যে অনবরত মানুষের চোখের জল ঝরাবার জন্যে তিনি আমাদের এত কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখবেন ?

নিরাপদ বলে, আমি ঠিক তা' বলছিনা সরকারমশাই ! এই যে আমাদের এত কষ্ট শুধু পয়সা নেই বলেই ত ? কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে ?

সরকার মশায় যেন কি ভাবেন। বঞ্চিত বুকের চিরন্তন প্রশ্ন—ইহার জন্য দায়ী কে ? ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর যত অসন্তোষ, যত বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ! কিন্তু ইহারা সঠিকভাবে তাহা বুঝিতে পারেনা। ইহাদের অসংবদ্ধ জীবনযাত্রা অসন্তুষ্ট জগতের বিপুল স্পন্দনকে উপলব্ধি করিতে পারেনা। তবু সরকারমশায় যেন আজ আরেক নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছেন। নিরাপদ আজ এমন সব কথার অবতারণা করিতেছে যাহার ফলে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে একটার পর আরেকটা সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তিনি বলেন, ভাই নিরাপদ সত্যি কথা বলতে কি এর জন্যে দায়ী আমরাই। কেন আমরা এত দুঃখকষ্টের প্রতিকার করবার চেষ্টা করিনা ?

সত্যই ত। নিরাপদর চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে, পল্লীগ্রামের

অনশনক্লিষ্ট, রোগক্লিষ্ট, শোকাচ্ছন্ন শত শত নর-নারীর মলিন মুখ। ইহারা কি কখনও নিজেদের দুঃখের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে? এমনি সব কত কথা নিরাপদর মনে পড়িয়া যায়।

পথ চলিতে চলিতে তাহারা উভয়েই উভয়ের কথায় কিছু না কিছু বিস্ময়কর তথ্যের সন্ধান পাইতেছিল। তাই সেই সকলের আনন্দেই তাহারা পথের দূরত্ব পরিমাপ করিবার আর সময় পায় নাই। সকাল বেলায় তাহারা যখন পথে বাহির হইয়াছিল তখন কামার পুকুর দিয়া তাহাদিগকে দক্ষিণের পথে যাইতে হইয়াছিল। সারাদিন ধরিয়া আজ তাহারা দক্ষিণে তিনচার মাইল, পূর্ব্বেও প্রায় তিনচার মাইল এবং উত্তরেও প্রায় অনুরূপ পথ পার হইয়া পশ্চিমের পথে আসিয়া পড়িয়াছিল। কথায় কথায় তাহারা এমন মগ্ন ছিল যে, বুঝিতে পারে নাই কখন পার হইয়া আসিয়াছে ব্যাঙাই চৌমাথা, কখন পার হইয়া আসিয়াছে হরিশপুরের সেই হাজার হাজার মানুষের মাথার খুলি পুতিয়া রাখা পুকুরটা। এসব পার হইয়া তাহারা ইঁদ্‌ড়ার পথ দিয়া অমরপুর অভিমুখে চলিতেছিল। গড়মান্দারণে প্রবেশ করিয়া এমনিতরো ঘুরিয়াই চলিতে হয় কারণ পথ এত দুর্গম যে যে-পথে আসা হয় সেপথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নিরাপদ বলে, আচ্ছা সরকার মশাই মানুষ কেন মানুষকে কষ্ট দেয়? ইচ্ছে করলে সবাই ত বেশ মিলেমিশে থাকতে পারে?

সরকার মশায় হাসেন। লোকালয়ের মাঝখান দিয়া তাহাদের এখন চলিতে হইতেছে। এসব কথা যেন লোকালয়ে মানায় না, সুর কাটিয়া যায় এখানে। সরকার মশাই বেশ ভাল করিয়াই যেন সেটা উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি সব কথা ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠেন, আমরা অনেকখানি পথ হেঁটে এলুম নিরাপদ। ঠিক একটা চাকার মত গোল হয়ে ঘুরে এলুম।

নিরাপদর কাছে নূতন জায়গা। সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই—তাই বলিয়া উঠে, তাই নাকি ?

হ্যাঁ, সরকার মশাই বলেন, তুমি বুঝতে পারলে না !

কই না, নিরাপদ বলে।

আরে আসবার দিন যে-পথে এসেছিলুম মনে নেই—আমরা সেই পথে চলেছি, বলিয়া সরকার মশাই সহজে চিনিতে পারা যাইবে পথের এমন সব চিহ্নগুলির কথা উল্লেখ করিতে থাকেন।

ব্যাঙ্গাই চৌমাথার নাম শুনিয়া নিরাপদ বলে, কখন পার হ'য়ে এলুম বলুন ত ?

কখন পার হ'য়ে এসিচি আমিও বুঝতে পারিনি বলিয়া সরকার মশায় হাসেন।

মনের ভার যেন নিরাপদর লঘু হইতে চাহে না। চলিতে চলিতে সে বলে, সরকার মশাই চলুন কালকে বেরুনো যাক—অনেক দিন এসিচি !

হ্যাঁ যেতে ত হবেই আর দু' একটা দিন কাটিয়ে যাই, সরকার মশাই বলেন। নিরাপদ বলে, না, কালই চলুন—আমার মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।

চল বাড়ীতে কি বলে, বলিয়া উভয়ে জোরে জোরে পা ফেলিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে থাকে।

বাড়ীতে আসিয়া সেদিন করুণাময়ীকে নিরাপদ একরকম পীড়াপীড়ি করিয়াই ধরিল যে আগামী কল্য সে চলিয়া যাইবে। সে গেলে যে সরকার মশাইকেও যাইতে হইবে তাহা ভাবিয়া করুণাময়ী স্বামীর সহিত পরামর্শ করে। অনেক পরামর্শের পর তাহাদের যাওয়াই স্থির হয়। করুণাময়ী নিরাপদকে দিবার জন্য পল্লীগ্রামের কতকগুলি জিনিষ বাঁধিয়া ছাঁধিয়া ছোট একটী মোট প্রস্তুত করিয়া দেয়। স্বামীর জন্য বাঁধে আর একটা মোট।

পাশে মেদিনীপুর জেলায় বেড়াইতে গিয়া খড়ার হইতে নিরাপদ কতকগুলি বাসন কিনিয়া লইয়া আসিয়াছিল। খড়ার বাসনের জন্য বিখ্যাত এবং সেখানে সস্তায়ও মেলে। তাই নিরাপদ লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। সেগুলিকে করুণাময়ী নিরাপদের সহিত দিতে ভুলে নাই, তাহা ছাড়া তসরের তিনখানা কাপড় করুণাময়ী নিজের খরচেই কিনিয়া নিরাপদর মোটের মধ্যে ভরিয়া দেয়। এ অঞ্চলে তসরের কাপড়ের ব্যবসাটা একটা কুটীরশিল্প হিসাবেই চলে। কি একটা পূজার দিনে নিরাপদ করুণাময়ীকে তসরের কাপড় পরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এত সুন্দর কাপড়ের কত দাম, তাহাতে সে যাহা শুনিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। বাজারে এই কাপড়ের দর উনিশ কুড়ি টাকা কিন্তু এখানে অনেক ঘরে এই কাপড় তৈয়ারী হয় বলিয়া এবং ইহা প্রস্তুত করিতে তিন চার টাকার বেশী খরচ হয়না বলিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট ঐ দামেই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ইহা শুনিয়া সে ভাবিয়াছিল—আহা তাহার কাছে টাকা থাকিলে সে অনায়াসে কয়েকখানা কাপড় লইয়া গিয়া একখানা রাধাকে, একখানা সুশীলাকে, এবং একখানা কাঁদনকে দিত। তাহারা এ কাপড় পরিতে পাইলে কত সুখী হইত! কাপড় কিনিবার মনোভাব সে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই, প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। করুণাময়ী সেকথা ভুলে নাই, তাই সে তিনখানা কাপড় কিনিয়াছে। কাপড়গুলা ঠিক করিয়া বাঁধিবার সময় সে নিরাপদকে ডাকিয়া বলে, দেখ ঠাকুর পো' তিনখানাই শাড়ী—সুশীলাকে যেন একখানা দিতে ভুলো না।

সুশীলা? সুশীলার কথা করুণাময়ী জানিল কিরূপে? নিরাপদ কি কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সুশীলার কথা করুণাময়ীকে বলিয়াছে? হইবেও বা! মানুষ জাতের স্বভাবই এই—দূরে আসিলে যাহাকে সে এতটুকুও ভালবাসে তাহারই কথা ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া অপরের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিরাপদ লজ্জায় আরক্ত হইয়া চুপ করিয়া থাকে। করুণাময়ী বলে, বুঝ্‌লে, দিও।

নিরাপদ ঘাড় নাড়িয়া জানায়, আচ্ছা।

আহারাদি সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দুপুর-বেলায় তাহারা বাহির হইয়া পড়ে।

* * * *

বর্ষা শেষ হইয়া শরতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। গাছে গাছে সবুজের চোখ ঝল্‌সানো দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে! আজকাল দিবাবসানের সাথে সাথে আকাশের চারিদিক পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ভরিয়া যায়। অস্ত সূর্য্যের গলিয়া পড়া স্বর্ণকিরণ সেই সকল মেঘের চারিদিকে শাড়ীর সোণালি পাড় বলিয়া মনে হয়। এমনিতরো আকাশের নীচে পল্লীগ্রামের শস্যে ভরা সবুজ প্রান্তর কি যেন এক অপরূপ শোভায় ভরিয়া উঠে! তাহার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কৃষকের মনে জাগিয়া উঠে উল্লাস, আনন্দে বুকখানা ফুলিয়া উঠে।

কিন্তু শরৎকালের এই আনন্দটুকু কৃষকেরা উপভোগ করিতে পারে না। বর্ষায় নদীনালা ডোবা ভরিয়া যায় জলে, নিষ্কাশনের পথ থাকে না। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শরৎকালে তাই ঘরে ঘরে শোনা যায় ম্যালেরিয়া রোগীর কাতর আর্ত্তনাদ। জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে প্রাণবায়ু বুঝি বা বাহির হইয়া যায়। ঔষধ নাই, পথ্য নাই—নিরুপায় রোগীর দল কোন আশায় যে বাঁচিয়া থাকে তাহা তাহারাই জানে।

খেঁদির মৃত্যুর পর কাঁদন যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। মনে সুখ নাই খাইতে পারে না, শরীর হইয়া গিয়াছে পাত। তাহার উপর প্রায় মাসখানেক হইতে চলিল সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। বনমালীরও মনে সুখ নাই, তাহারও দু'বেলা জ্বর আসে। কিন্তু কি করিবে, কাজ ত

করিতেই হইবে তাহা না হইলে খাইতে দিবে কে? নিরাপদ সেই যে গিয়াছে আর কোন সংবাদ নাই তাহার। একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দেয় নাই, তাহারাও যে চিঠিপত্র লিখিবে তাহারও উপায় নাই। সরকার মশায়ের বাড়ীর ঠিকানা তাহারা জানে না।

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথেই বনমালীকে কাজে যাইতে হয়। এখন আর সে অভয় সিংহীর কলাবাগানে কাজ করে না। আশুবাবুর নূতন একটা কলাবাগানের সমস্ত ভারই তাহার উপরে, কাজ তাহার অনেক। তবে সুবিধা এই যে অভয় সিংহী তাহাকে আট টাকা বেতন দিত, আশুবাবুর ম্যানেজার অদ্বৈতবাবু তাহাকে দেয় দশটাকা—দুই টাকা বেশী। এই বেশীটুকু পাওয়ার জন্য তাহাকে খাটিতে হয় বেশী। তাহা ছাড়া দেনার দায়ে সে আশুবাবুর কাছে বিকাইয়া আছে। অম্বিকা চাটুয্যে তাঁহারই লোক। তাহাকে দিয়াই আশুবাবুর ম্যানেজার অদ্বৈতবাবু তেজারতি চালাইতেছিল। এখন সে যদি আশুবাবুর কাজ ঠিকমত না করিতে পারে তাহা হইলে সবদিক দিয়া তাহার ভরাডুবি হইয়া যাইবে।

তবে আজকাল একটা সুবিধা আছে এই যে গোপাল শশী কালী ও পাঁচু সকলেই একজায়গায় কাজ করে। আশুবাবুর কাছে বেশী বেতন পাওয়া যায় বলিয়া সকলেই যে যাহার মনিবের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। অবশ্য বনমালীই প্রথমে তাহাদের বেশী বেতনের কথা তুলিয়া লোভ দেখায়, তবে তাহারা আসিয়াছে। তাই যদি একদিন সে না যাইতে পারে, উহাদের কেহ না কেহ তাহার হইয়া কাজটুকু করিয়া দেয়। কিন্তু এরকম করিয়া ক'দিনই বা চলে। দুই একদিন না হয় উহারা করিয়া দিবে কিন্তু তারপর! তবে বনমালী সাধারণতঃ কামাই করিতে ভালবাসে না। জ্বর হইলেও সে জ্বর গায়ে ক্ষেতে যায়।

সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া বনমালী দেখে কাঁদন দুয়ারের

একপাশে ছেঁড়া মাতুরে পড়িয়া নীরবে কাঁদিতেছে। বনমালীর ভাল লাগে না কাঁদনের এই কান্না! দিবারাত্রি গুমরাইয়া গুমরাইয়া কান্না মনকে যেন অসহ্য বিরক্তিতে ভরাইয়া দেয়, একটা নিস্ফল আক্রোশ রহিয়া রহিয়া ধূমায়িত বহ্নির মত মনের সর্ব্বত্র যেন ছড়াইয়া পড়ে। অসহিষ্ণু ভাবে সে বলিয়া উঠে, গ্যাখ দিন রাত্তির এরকম করে কেঁদনা— ভাল লাগে না।

কেন কাঁদে কাঁদন? কাঁদন কি জানে না, যে যায় সে আর ফিরে না। কন্যা মরিয়াছে, আর তাহাকে ফিরাইয়া আনা যায়না। তবু কাঁদে কেন সে? অন্ধকারের অপার সমুদ্রে যে তলাইয়া গিয়াছে অতল তলে তাহার জন্য কেন এ শোক, কেন এ বিলাপ? কে বলিবে সে কথা। কেহ যদি কখনও নিজের কোন বহুমূল্য জিনিষ অন্ধকারে হারাইয়া থাক তাহা হইলে হয়ত খানিকটাও বুঝিতে পারিবে কাঁদনের ব্যথা। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বেড়ানোর মধ্যেও অন্তরে কতখানি আশার আনন্দ জাগে। বনমালীর ভাল না লাগিলেও কাঁদন কাঁদিবে কারণ কাঁদন জননী, গিয়াছে তাহারই।

প্রথম প্রথম বনমালীর ধমকে কাঁদন হু হু করিয়া আরও কাঁদিত কিন্তু আজকাল ক্রমশঃ যেন কান্নাটা কমিয়া আসিতেছে। তাই আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে কাঁদন চুপ করিয়া যায়। বনমালী বলে, দু'মুঠো ফুটিয়ে রাখতে পারবে না এসে আবার আমাকেই পিণ্ডি ফোটাতে হবে? তা যদি না হয় ত একটু সকাল সকাল চলে আসব?

কাঁদন হাতের উপর মাথাটাকে তুলিয়া লইয়া বলে, জ্বর যদি তেমন না হয় ত রেঁধে রাখব'খন।

বনমালী কাঁদনের মুখের দিকে তাকায়। কাঁদন যেন কি ভাবিয়া বলিয়া উঠে, আচ্ছা সুশীলা আসলে সেই দু'মুঠো ফুটিয়ে দিয়ে যাবে'খন। তুমি যাও—

বেশ—দেখ যেন শেষকালে আবার দুপুর বেলায় ছুটোছুটি করতে না হয়, বলিয়া বনমালী বাহির হইয়া গেল।

খেঁদির মৃত্যুর পর কাঁদন সুশীলাকে সব সময়েই পায়। সুশীলা না থাকিলে হয়ত তাহাদিগকে খেঁদির পথানুসরণ করিতে হইত। সে আসিয়া পড়িয়াই তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। এমন কতদিন গিয়াছে সে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়াছে তবে তাহাদের খাওয়া হইয়াছে। রোগে পড়িয়া অবধি কাঁদন সংসারের অকেজো মানুষের তালিকায় পড়িয়া গিয়াছে, যথাসময়ে সে বনমালীকে রাঁধিয়া ভাত দিতে পারে নাই, ইহার জন্য কতদিন বনমালীর কাজের ক্ষতি হইয়াছে। বহুদিন তাই লইয়াই সে রাগারাগি করিয়াছে। আর কাঁদনের নিজের ত কথাই নাই, সময়ে পথ্য না করিতে পাইয়া সে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, রোগ তাহার দিন দিন বাড়িয়াই গিয়াছে। এই অবস্থায় সুশীলাই একমাত্র লোক যে আসিয়া পড়িয়া সবদিক রক্ষা করিয়াছে। আজ দুই তিন দিন সুশীলা আসে নাই, তাই সময়ে রান্না হয় নাই। জ্বর গায়েই কাঁদন রাঁধিতে যায়, বনমালী আসিয়া তাহা দেখিতে পাইয়া রাগারাগি করে এবং কাঁদনকে রান্নার কাছ হইতে সরাইয়া দিয়া নিজেই রাঁধিতে লাগিয়া যায়। দুপুর বেলায় তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়া কি রান্নাবান্নার কাজ পুরুষ মানুষের ভাল লাগে? তাই সেই যন্ত্রণাদায়ক কাজের কথা মনে পড়িবা মাত্র বনমালী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। সুশীলা যদি না আসে তবে কাঁদন নিজেই রাঁধিবে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে কাঁদন আবার ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

কতক্ষণ কাঁদিতেছিল তাহা তার খেয়াল নাই। চমক ভাঙ্গিয়া যায় সুশীলার ডাকে। চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, সুশীলা দাওয়ার উপরে আসিয়া বলে, আবার তুই কাঁদছিলি বৌদিদি?

কাঁদন উঠিয়া বসিতে বসিতে বলে, কি করি ভাই—কান্না যে আসে তাই ত কাঁদি।

সুশীলা শাসনের সুরে বলে, না খবরদার তুই কাঁদবি না। লোকের ছেলেপিলে কেউ কখনো মরে না? শরীরটা সারা—ভাল ক'রে ঘর সংসার কর! আবার সে ফিরে আসবে। তা' নয় খালি কান্না আর কান্না! নে ওঠ, হাতমুখ ধুয়ে পাঁচন খা!

আর পাঁচন, কাঁদন বুক চাপড়াইয়া বলে, এবার গেলেই হয়।

নে নে পাকামো রাখ—ওঠ, বলিয়া সুশীলা কাঁদনের কপালে হাত দিয়া দেখে জ্বর আছে কিনা। তারপর বলে, জ্বর নেই ওঠ্!

কাঁদন বলে, কদিন তুই আসিস্‌নি কেনরে?

সে অনেক ব্যাপার, বলিয়া সুশীলা দাওয়ার একদিকে বসিয়া পড়ে। বসিয়া সে বলিয়া উঠে, হাঁরে বৌদিদি দাদার কদিন খুব কষ্ট হ'য়েছে নারে?

হ'লেই বা কি করব বল—জ্বরে আমি উঠ্‌তে পারিনি, বলিয়া সুশীলার মুখের দিকে কাঁদন তাকায়। সুশীলার মুখখানা যেন কিসের এক বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। সুশীলা বলে, কোথা থেকে এক সন্নিসি এসেছিল ভাই পরশুদিন তাই আসতে পারিনি। তার ওপর আবার হ্যাঙ্গাম বলিস্ কেন,—সন্নিসি সব কি মন্তর দেবে তাই মা নেচে উঠেচে কলকাতায় যাবে। অঘোর কাকা সেই সন্নিসির শিষ্য, তাই তার ওপর ভার দিয়ে গেছে মাকে নিয়ে যাবার। মাকে কত বোঝালুম শুনলে না। অঘোর কাকা ত লোক ভালো নয়! অথচ মা যাবেই।

তাই নাকি, বলিয়া কাঁদন উঠিয়া দাঁড়ায়। সুশীলা বলে, ধরব?

কাঁদন বলে, না।

সুশীলা বলে, দাঁড়া আমি জল নিয়ে আসি।

কলসীতে বোধহয় জল নেই, বলিয়া কাঁদন দাওয়ার একটা খুঁটী ধরিয়া আবার বসিয়া পড়ে।

সুশীলা বলে তবে বোস্ একটু—চট ক'রে এক কলসী জল নিয়ে আসি।

সুশীলা জল আনিতে বাহির হইয়া যায়। কাঁদন বসিয়া বসিয়া উহারই কথা ভাবে। মেয়েটার কি অফুরন্ত প্রাণ, যেখানে সে থাকে সেখানের সবাইকে সকল ব্যথা ভুলাইয়া দেয়,—তাহার স্পর্শ প্রাণের স্পর্শ! কাঁদন ও সুশীলা প্রায় সমবয়সী বলিয়া তাহাদের মিল বেশ হইয়াছে, তাহা ছাড়া সম্পর্কটা বেশ ভালই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে জল লইয়া ফিরিয়া আসে। ঘর হইতে ঘটী আনিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া কাঁদনকে দেয় মুখ ধুইতে।

কাঁদনের মুখ ধোওয়া হইয়া গেলে ঘর হইতে পাঁচনের বোতল আর একটা পাথর বাটী লইয়া আসে সুশীলা। তারপর আন্দাজ করিয়া আধ গেলাসটাক ঔষধ বাটীতে ঢালিয়া কাঁদনকে দেয় খাইতে। কাঁদন বাটীটা লইয়া পাঁচনটা গিলিতে যায়। সুশীলা বলে, দাঁড়া বৌদি—সে দিন আদা আনা হয়েছিল, যদি থাকে ত দু'খানা কুঁচিয়ে দিই!

তাই দে ভাই এ একবারে তেঁতো 'হাকু,' বলিয়া কাঁদন বাটীটা নামাইয়া রাখে।

পরক্ষণেই সুশীলা আদা কুঁচাইয়া তাহার সহিত লবণ মিশাইয়া লইয়া আসে। কাঁদন পাঁচনটা গিলিয়া ফেলিয়াই আদার কুঁচিগুলা মুখে ফেলিয়া দেয়।

তারপর সুশীলা সব তুলিয়া রাখিয়া বলে, ঝাঁটপাটগুলো সেরে নিয়ে রাঁধবার যোগার করি—কি বল্?

কাঁদন বলে, তাই কর ভাই যা' বুঝিস্—আমি একটু শুই।

উহুঁ, সুশীলা বলে, উটী হচ্ছেনা তুমি বোসে থাকো ঠাকরুণ—আমি গল্প করতে করতে কাজ করি।

সুশীলা শুইতে দিবে না কাঁদনকে, কারণ সে জানে ম্যালেরিয়া জ্বর শুইয়া থাকিলেই পাইয়া বসে! কাজেই ছলছুতা করিয়া যেমন করিয়া হউক তাহাকে নিরস্ত করিতে হইবে। তাই সুশীলার কাঁদনের সহিত গল্প করিয়া কাজ করিবার এত সখ!

সুশীলা কাজ করে আর গল্প করে কাঁদনের সহিত। কাঁদন বসিয়া শোনে তাহার কথাগুলি আর মাঝে মাঝে উত্তর দেয়! হঠাৎ কথার মাঝে সুশীলা প্রশ্ন করিয়া বসে, হ্যাঁ বৌদি, তোদের এরা ফিরবে কবে?

কাঁদন বলে, কারা ঠাকুরপোরা?

সুশীলা বলে, হ্যাঁ।

কাঁদন বলে, কি জানি ভাই কোন খবরই নেই!

আচ্ছা মানুষ ত—গেলি বিদেশে বিভূঁয়ে একটা খবরও ত দিতে হয়, বলিয়া সুশীলা আরও কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া যায়। কাঁদন বলে, তাকে আমি জানি। সাদাসিধে মানুষ, ভাবে হয়ত আমরা তাকে ভুলে গেচি; এই অভিমান ক'রে কোন খবর টবর দেয়না অথচ আমরা যে তার ঠিকানা জানিনা, সেটুক সে বুঝবেনা!

সুশীলা বলে, সংসারে কেউ নেই বলেই বড় অভিমানী নয়?

কাঁদন বলে, বোধ হয় তাই।

নিরাপদর অভিমানের কথা সুশীলা জানে। সেই একদিন দুপুরে নিরাপদ তাহাদের বাড়ী আসিলে সে মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল বলিয়া সেকথা কতদিন পরেও পুকুরধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উল্লেখ করিতে সে ভুলে নাই! সুশীলা বলে, এবার এলে তোরা ভাই আর তাকে যেতে দিস্‌নি—ওসব লোক বাড়ী না থাকলে কেমন যেন বাড়ীটা মানায়না!

কি বলিতেছে সুশীলা? কাঁদনের বুঝিবার শক্তি নাই। বৌদির

মৃত্যুর পর কাঁদন যেন বুড়া হইয়া গিয়াছে, অনুভূতি গিয়াছে ভোঁতা হইয়া। তাহা না হইলে যেকথা আজ সুশীলা বলিতেছে একথা কি সে বুঝিতনা! কিন্তু শোক দুঃখ জ্বালা মানুষের মধ্য হইতে যে আসল মানুষটাকেই হরণ করিয়া লইয়া পালায়!

এমনি তরো কথাবার্ত্তার মাঝে দু' একবার সুশীলা নিরাপদর কথা বলে। তাহার কথা না কহিলে সুশীলার যেন ভাল লাগেনা।

দুপুর বেলায় রান্না বান্না সারিয়া কাঁদনকে ঔষধ ও দুধ সাগু খাওয়াইয়া বনমালীর ভাত বাড়িয়া রাখিয়া সুশীলা বাড়ী চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। কাঁদন বলে, বিকেলের দিকে আসিস্ ভাই!

আচ্ছা, বলিয়া সুশীলা চলিয়া যায়।

খানিক পরে বনমালী ফিরে জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে। ভাত ঢাকা দেওয়াই থাকে। সে আসিয়া বিছানা লয়।

কাঁদন বলে, ভাত যদি না খাও তবে একটু দুধ-সাবু খেলেনা কেন?

বনমালী হাত নাড়িয়া বলে, না জ্বরটা ছাড়ুক—চান ক'রে দুটো খাব'খন!

ম্যালেরিয়া জ্বরটী বেশ। তাহার উপর আবার ইহাতে অভ্যস্ত পল্লীবাসিগণ জ্বরটাকে বেশ পোষ মানাইয়া লইয়াছে। জ্বর আসিলে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, ছাড়িলেই নিয়মমত স্নানাহার চালায়। ভয়ঙ্কর রোগের চিকিৎসা করে ইহারা নিরুপায় ঔদাসিন্য দিয়া। তাই ইহাতে মরেও যেমনি, ভোগেও তেমনি, রোগক্লিষ্ট অবস্থায় বাঁচিয়া থাকেও বেশ। ম্যালেরিয়া পল্লীগ্রামের একান্ত করিয়া নিজস্ব জিনিষ। পল্লীবাসিরা অবস্থায় পড়িয়া তাহাকে বড় আপনার করিয়া লইয়াছে।

বৈকাল বেলা সুশীলা গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বনমালীদের বাড়ীতে আসে। উঠানে পা দিবামাত্রই দাওয়ায়

বনমালীকে দেখিয়া লজ্জায় সে গান থামাইয়া দেয়। বলিয়া ওঠে, ওমা দাদা এবেলা কাজে যাও নি!

বনমালীর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। সে স্নান করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া সুশীলা লজ্জায় গান থামাইয়া ফেলায় সে বলিয়া উঠে, গা' গা' থাম্‌লি কেন—আমি এখুনি পুকুরে যাচ্ছি!

কাঁদন ঘরের ভিতর ছিল। বাহিরে আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলে, অনেক দিন তোর গান শুনিনি সুশীলা?

হ্যাঁ আমার আবার গান, বলিয়া সুশীলা আরক্ত হইয়া উঠে।

বনমালী গামছা লইয়া স্নান করিতে চলিয়া যায়। কাঁদন বলে, গা'-না সুশীলা?

দূর, বলিয়া সে প্রশ্ন করে কাঁদনকে, হ্যাঁ বৌদিদি দাদা এব্‌লা বেরোয়নি কেনরে?

জ্বর হয়েছিল, কাঁদন দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া বলে, এই ছাড়ল তাই চান করতে চলেছে।

সুশীলা বলে, তাহলে খাওয়াও হয়নি বল্‌?

কাঁদন বলে, না।

মিছে কষ্ট ক'রে রাঁধাই হল তাহ'লে, বলিয়া সুশীলা দাওয়ার উপর উঠিয়া বসে। কাঁদন বলে, না এখুনি তো খাবে!

ও তা' বটে, বলিয়া সুশীলা পুনরায় প্রশ্ন করে, এব্‌লা তাহ'লে কি রাঁধ্‌তে হবে?

কাঁদন বলে, না না এব্‌লা আর কিচ্ছু করতে হবে না! তুই বরং যে গানটা গাইছিলি গা'?

সুশীলা হাসিয়া বলে, ঝক্‌মারি হয়েচে তোদের দোরগোড়ায় এসে গানের কলিটা মনে পড়েছিল ব'লে!

গা'না—গা'না, কাঁদন বলে।

সুশীলা হাসে। কাঁদন গান শুনিতে চায় কেন? গান ভাল লাগে বলিয়া না গান শুনিয়া মনের কষ্ট ভুলিয়া থাকিবে বলিয়া—কোনটা সত্য? সুশীলা সুর করিয়া গাহে:

…যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী…

ক্রমশঃ গান শেষ হইয়া যায়। সাধারণ গান—পল্লীগ্রামের গৃহস্থবাড়ীর সাধারণ মেয়ের কণ্ঠে, অতি সাধারণ ভাবেই তাহার অর্থ প্রকাশ পায়। তবু সুশীলার গানের মধ্যে কি আছে না আছে কাঁদন তাহা লক্ষ্য করে নাই সে শুধু বলিয়া উঠে, তুই এত সুন্দর গান গাস্ সুশীলা যে কি বল্‌ব।

সুশীলা হাসিয়া বলে, তাই নাকি?

হ্যাঁরে, কাঁদন বলে।

সুশীলা রসিকতা করিয়া বলে, তবে মেডেল গড়িয়ে দে।

অন্য সময় হইলে কাঁদন ইহার যথাযথ উত্তর দিতে পারিত কিন্তু এখন যেন সে এসব কথা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না কিম্বা বোধহয় বুঝিবার চেষ্টাও করে না! আসলে মনটা তাহার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া! তাহা না হইলে মেডেল গড়াইয়া দিবার কথায় কি কথা বলিতে হইবে সে কি তাহা জানে না, না তাহার কিছু বুঝিতে বাকী আছে। যদিও সুশীলা খুব চাপা মেয়ে তবুও কি মেয়েদের কাছে তাহার মত মেয়ের যথার্থরূপ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে? মেয়েরা বোঝে মেয়েদের! কিন্তু কাঁদন কন্যার মৃত্যুর পর যেন কি হইয়া গিয়াছে!

সুশীলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, রাঁধিবে কি না। কাঁদন বলে, না।

সুশীলা বলে, তবে একটু সাবু ফুটিয়ে দিই তোকে?

উঁহুঁ কাঁদন বলে, আজ শরীরটা বেশ ভালই আছে—আজকে আর কিছু খাব-টাব না! তেমন দেখিত পয়সাটাক মুড়ি আনিয়ে চিবুবো 'খন।

ইহাদের কথার মাঝে আসে বনমালী। স্নান করিয়া যেন তাহার চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে। কাপড় ছাড়িয়া সে খাইতে যায়।

আহার সারিয়া বনমালী বলে, সুশীলা একটু তামাক দিতে পারিস্ ভাই ?

দিচ্ছি, বলিয়া সুশীলা তামাক সাজিতে বসিয়া যায়। বনমালী দাওয়ার উপর একটা খুঁটীতে ঠেস দিয়া বসে। বৈকালে মেঘ-মেদুর আকাশটার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে, নীরোটা যে কবে ফিরবে !

কাঁদন বলে, তুমি একদিন হাট থেকে খবর নিয়ে এসো !

কার কাছে খবর নোব, বনমালী বলে, সরকার মশাইও যে গেছে। আর ত কেউ তাদের খবর জানে না !

সুশীলা হুকা আনিয়া বনমালীকে দিয়া কাঁদনের পাশে গিয়া বসিয়া পড়ে। কাঁদন বলে, সে না এলে যেন বাড়ীটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে !

হুকা টানিতে টানিতে বনমালী বলিয়া উঠে, হুঁ !

সুশীলা কাঁদনের মুখের দিকে তাকায়। বাড়ী ফাঁকা হইয়াছে কি শুধু নিরাপদর জন্যই ? এখনই হয় ত কাঁদন কাঁদিয়া উঠিবে, যাহার জন্য সত্য সত্যই বাড়ীটা তাহার কাছে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে, তাহার কথা স্মরণ করিয়া ! কিন্তু কেন কি জানি কাঁদন কাঁদেনা ! বলে, নূতন জায়গায় গেছে—হয়ত কত কষ্ট হচ্ছে !

না কষ্ট হবে না, বনমালী বলে, সরকার মশাই খুব অমায়িক লোক ! তবে নতুন জায়গায় গেছে বলেই দেরী হচ্ছে কখনো ত বেরোয়নি কোথাও ?

তা অবিশ্যি সত্যি, কাঁদন বলে।

সুশীলা বলে, হ্যাঁরে বৌদি সেই জায়গাটা না তার জন্মস্থান ?

হ্যাঁ, উত্তর দেয় বনমালী।

কাঁদন বলে, সেই জন্যই জায়গাটার ওপর এত মায়া।

সুশীলা কাঁদনের দিকে একবার বনমালীর দিকে আরেকবার তাকাইয়া কি ভাবে।

কথাবার্ত্তার মাঝে কখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়ে। সুশীলা উঠিয়া প্রদীপ জ্বালায়। ঘরে সন্ধ্যা দিয়া বলে, বৌদিদি আজ চলিরে, কাল হয়ত আসতে পারব না—সেই সন্নিসির ওখানে যাব!

তাই নাকি, কাঁদন বলে।

বনমালী জিজ্ঞাসা করে, কোথারে?

ক'ল্‌কাতায়, বলিয়া সুশীলা বনমালীর দিকে তাকায়।

কাঁদন বলে, কখন যাবি?

সকালেই ত যাওয়া ঠিক হ'য়েছে, সুশীলা বলে।

কাঁদন বলে, তা'লে তাড়াতাড়ি ফিরিস—কি জানি যদি জ্বর বাড়াবাড়ি হয়!

আচ্ছা, সুশীলা বলে, জ্বর তোর আর হবেনা—একটু ধরাকাটে থাক্‌লেই সেরে যাবে।

বনমালী বলে, মেয়েটা ছিল ব'লে এ যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেলে।

সেকথা আর বলতে, বলিয়া কাঁদন উঠিয়া পড়ে। বনমালী হাই তুলিয়া সন্ধ্যার নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকায়।

পরদিন সকালেই নিরাপদ আসিয়া উপস্থিত হয়।

কাঁদন উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের দ্বারা তাহাকে অভ্যর্থনা করে, বনমালী করে তাহার বিষাদময় হাসি দিয়া। নিরাপদ বুঝিতে পারেনা ব্যাপারটা। দাওয়ার উপর পিঠের পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া সে বিস্ময়ে-বিমূঢ় হইয়া উঠানের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। চোখে মুখে তাহার এক নূতনভাব। নূতন জায়গায় ঘুরিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহাকে যেন নূতন মানুষ দেখাইতেছে। এই নূতন মানুষকে পুরাতন দিনের কথা স্মরণ করাইয়া

দিয়া নিজের দুঃখভার খানিকটা লাঘব করিবার জন্যই বোধ করি কাঁদনের এত কান্না!

খেঁদি নাই! নিরাপদরও চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়ে। নিরাপদর আগমনে বনমালীর গৃহে নূতন করিয়া হয় শোকের উৎসব!

বনমালী বলে, নীরোরে, কি বিপদ যে গেল তোকে আর কি বলব? রোজ ভাবি এই বুঝি তুই এলি, কিন্তু—

—কথা তাহার শেষ হয়না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।

নিরাপদ উঠিয়া আসিয়া দাওয়ার উপর বসে। সে যেন কত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে রতনপুর হইতে চলিয়া গিয়া। তাই অপরাধীর মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মুখ দিয়া তাহার একটীও কথা বাহির হয়না!

কাঁদন বলে, ঠাকুরপো, তুমি যদি থাকতে তাহলে খেঁদি আমার মরতনা!

কি ভুলই করিয়াছে নিরাপদ! অনুশোচনায় মন তাহার ভরিয়া উঠে। কাঁদন বলে, ঠাকুরপো, বিনা তিকিচ্ছেয় মেয়েটা আমার ম'রে গেল!

কি মর্ম্মান্তিক! নিরাপদর বুকে যেন শেল বিঁধিতেছে! সেই দায়ী খেঁদির মৃত্যুর জন্য!

কাহারও শোকের দিনে উপস্থিত থাকিয়া নিরাপদ কাহাকেও সান্ত্বনা দিতে শিখে নাই। মানুষের জীবনে ইহা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার! যে শোকে সান্ত্বনা দিতে পারে পারুক কিন্তু নিরাপদ পারেনা। তবে একটা জিনিষ সে শিখিয়াছে, ইহা তাহার জন্মগত শিক্ষা—অপরের দুঃখ-শোকের অসহনীয় অবস্থায় নিজেকেও সে তাহাদের সহিত এক সমতল ভূমিতে দাঁড় করাইতে পারে এবং ইহার জন্যই তাহাকে কাঁদন ও বন-

মালী এত ভালবাসে। তাই কঠোর নিয়তির বিরুদ্ধে তাহারা অভিযোগ করে দরদী সমধর্ম্মী বন্ধুর কাছে।

নিরাপদ ভাবিয়া পায়না—তাহার অবর্ত্তমানের এই কয়টা দিনের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল কি করিয়া? সংসারের প্রতিদিনকার ছোট বড়ো দুঃখ আঘাত সহিতে ত তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তবুও এমন সব আঘাত অলক্ষ্যে চোরের মত আসে কেন? কে জানে সে থাকিলে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিত কিনা!

বনমালী সে বেলা আর কাজে যায় না। বসিয়া বসিয়া নিরাপদর সহিত গল্প করে।

কাঁদনের কান্না একসময় কমিয়া আসে। পুঁটুলিটা খুলিয়া দেখে নিরাপদ কি সব আনিয়াছে। তাহাকে পুঁটলী খুলিতে দেখিয়া নিরাপদ বলে, সরকার মশায়ের বউ আসবার সময় বেঁধে দিলে—নিয়ে এলুম!

খড়ারের প্রস্তুত নানা রকম বাসন দেখিয়া কাঁদনের ভারী আমোদ হয়। কোনটার কত দাম সে জিজ্ঞাসা করে।

বনমালী বলে, বেশ বাসন ত?

কাঁদন বলে, এসব ত এখানে পাওয়া যায় না!

নিরাপদ বলে, খুব সস্তা। পয়সা থাকলে আরও নিয়ে আসতুম!

কাঁদন পুঁটুলি খুলিতে থাকে। কাগজে মোড়া ছিল তসরের কাপড়-গুলা। মোড়কটা খুলিতেই টক্‌টকে লাল পাড় ছাই-রঙের তসরের কাপড় দেখিয়া কাঁদন বিস্ময় প্রকাশ করে। বনমালী বলে, দেখি—দেখি!

হ্যাঁ ঠাকুরপো, এ কাপড় কোথায় পেলে, বিস্ময়ান্বিত ভাবে কাঁদন প্রশ্ন করে। নিরাপদ যথাযথ উত্তর দেয়। কাঁদন দাঁড়াইয়া পড়িয়া কোমর হইতে পা অবধি কাপড়টা আড়াআড়ি ধরিয়া বহর মাপিতে থাকে। তারপর কয়খানা কাপড় নিরাপদ আনিয়াছে তাহা হিসাব করিতে বসে। নিরাপদ বলে, তিনখানা এনেচি!

বনমালী বলে, তি-ন্‌-খা-না !

নিরাপদ বলিয়া উঠে, একখানা বৌঠানের একখানা রাধার—

আরও কি বলিতে যায় নিরাপদ কিন্তু তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়া তাহারই মুখের কথাটা বলিয়া দেয় কাঁদন। বলে, সুশীলাকে একখানা দোব—আহা-আ বড় আহ্লাদ হবে তার !

বনমালী একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া কাপড়ের জমি দেখিতে দেখিতে বলে, এযে খুব দামী কাপড়রে নীরো ?

হ্যাঁ, বলিয়া নিরাপদ কাপড়ের ইতিহাস বর্ণনা করিতে থাকে। কাঁদন সব জিনিষপত্র তুলিয়া রাঁধিবার বন্দোবস্ত করিতে যায়। বনমালী তামাক সাজিয়া আনিয়া নিরাপদকে দেয়। আজ নিরাপদর খাতির পাইবার দিন। সে এত জিনিষপত্র লইয়া আসিয়াছে বলিয়াই যে তাহার খাতির তাহা নহে, অনেকদিন পরে আবার সে তাহাদের সুখ-দুঃখের সহিত পরিচিত হইতেছে বলিয়া !

নিরাপদর অবর্ত্তমানে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে ! সবচেয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বনমালীর সংসারে। তাহার পর গ্রামের পরিবর্ত্তন-টুকু তাহার কাছে তুচ্ছ নয়। এতদিন যে দক্ষিণপাড়ার মধ্যে আশুবাবুর কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না আজ সেই দক্ষিণপাড়ার মানুষগুলো তাঁহার কথায় উঠে বসে। কলাবাগানের সমস্ত লোকগুলাকে আশুবাবু কিনিয়া লইয়াছে। রায়েদের, মল্লিকদের, বর্ম্মনদের, সিংহীদের বাগানে কাজ করিতেছে এখন নূতন লোক।

মুস্কিল হইল নিরাপদর। গ্রামে আজকাল বহু বেকার লোক পাওয়া যায়। ইহাদের সকলেই প্রায় জমি হইতে উৎখাত হইয়া দেনার দায়ে বাস্তুভিটা হারাইয়া পরের জমিতে দিনমজুরী করিয়া জীবিকার সংস্থান

করে। সংখ্যায় অত্যধিক হওয়াতে যে যাহাই মজুরী দিকনা কেন ইহারা কাজে লাগিয়া যায়। ওদিকে আশুবাবুর কলাবাগানে যাহারা কাজ করিতেছে তাহারা পায় দশ টাকা, আর দক্ষিণপাড়ায় যাহারা কাজ করে তাহারা পায় আট টাকা। আট টাকা বলিয়া কাহারও কোন আক্ষেপ নাই—যাহোক একটা কাজ পাইয়াছে ত! নিরাপদ বেচারার অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, অভয় সিংহীর কলাবাগানে যে কাজ করিত এখন অপর একজন সেই কাজটী করিতেছে। সে কি করিবে তাহা হইলে?

বনমালী বলে, আমি বাবুকে ব'লে দেখ্‌ব।

নিরাপদ বলে, আমিও একবার উত্তরপাড়া যাই তাহ'লে।

পারিস্ যদি যা' একদিন, বলিয়া বনমালী কাঁদনকে উদ্দেশ করিয়া বলে, কি গো আর দেরী কত?

কাঁদন বলে, যাও তোমরা চান করে এসো!

অনেকদিন পরে আবার বনমালী ও নিরাপদ একসাথে তেল মাখিতে বসে। তারপর একসাথে যায় স্নান করিতে। কেমন করিয়া ইতিমধ্যেই দক্ষিণপাড়ার চারিদিকে নিরাপদর আগমন সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পথে দেখা হইয়া গেল কালী সামন্তর সাথে। কালী বলিয়া উঠে, শুন্‌লুম তুই এসিচিস নিরাপদ—কেমন আছিস্?

নিরাপদ অল্প একটু হাসিয়া বলে, ভাল—তোর সব ভাল বেশ?

কালী বলে, ঐ একরকম কেটে যাচ্ছে আর কি!

কথা কহিতে কহিতে তাহারা পুকুরঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ষা আসিয়া গিয়াছে, কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে পুকুরটা। গ্রীষ্মের প্রখর-উত্তাপে যে কলমী, শুষনি ও হিংচা দলগুলার অস্তিত্ব বুঝা যাইতনা, এখন সেগুলা সজীব হইয়া পুকুরের এ-কোণ—ও-কোণে ঝাঁপড়ি ঝাঁপড়ি হইয়া উঠিয়াছে। পুকুরটার যেন শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। পুকুরের

মাঝখানটা ভরিয়া গিয়াছে পদ্মপাতায়। জল হইয়া উঠিয়াছে স্বচ্ছ কাঁচের মত। সেদিকে তাকাইয়া নিরাপদ উপলব্ধি করে নূতনত্বের মাধুর্য্য—

কালী বলে, খুব বেড়িয়ে এলি নিরাপদ!

নিরাপদ হাসে।

সংসারের তাড়নায় কখনও ইহারা কোনস্থানে যাইতে পারে না। তাই দূরদেশে যাহারা যাইতে পারে তাহাদের সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া মনে মনে ইহারা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলিয়া ভাবে। দূরদেশে ঘুরিয়া আসা মানুষের চোখে যে সুদূরের মায়া-অঞ্জন লাগিয়া থাকে তাহারই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ইহারা দূরদেশের অজানা রহস্যকে উপলব্ধি করে। কালী তাই নিরাপদর মুখের দিকে তাকাইয়া কি সব ভাবিতে থাকে। প্রশ্নের পর প্রশ্নও করে। নিরাপদ গল্প বলে, ব্যাঙাই চৌমাথার গল্প, গড়-মান্দারণের গল্প। শুনিয়া কালী মনে মনে দুর্গম, ভয়সঙ্কুল স্থানের কল্পনা করে। নিরাপদ ভাগ্যবান তাই এমন জায়গায় যাইতে পারিয়াছে।

পাঁচু আসে স্নান করিতে। নিরাপদ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠে, কি গো খুড়ো ভাল আছ ত?

হ্যাঁ বাবা তুমি ভাল আছ বেশ, পাঁচু বলে।

নিরাপদ ঘার নাড়িয়া বলিয়া উঠে, হ্যাঁ খুড়ো।

কালী সুযোগটা ছাড়ে না। পাঁচু আজ তাহাদের বাড়ী খাইবে। সে বলিয়া উঠে, খুড়ো রান্নার কদ্দূর দেখলে গো?

হ'ল ব'লে, বলিয়া পাঁচু জলে নামে।

বনমালী বলে, আজ কি খুড়ো কালীর বাড়ীই হবে নাকি?

হ্যাঁ, ওরা কেউ নেই, বলিয়া পাঁচু জলে ডুব দেয়।

নিরাপদ পাঁচুর ডুব-দেয়ার দিকে তাকাইয়া থাকে। পাঁচু খুড়োর

বাড়ীর উহারা গিয়াছে কোথায়? সে জিজ্ঞাসা করে, খুড়ি-টুড়ি কি এখানে নেই নাকি?

বনমালী বলে, হ্যাঁ আছে—আজকে এক সন্নিসি ঠাকুরের কাছে গেছে।

ও, বলিয়া নিরাপদ জলে ডুব দিতে থাকে। ওরা গেল আজই গেল? সুশীলাটা কি মেয়ে?

স্নানান্তে যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া আসে।

কাঁদন বহু দিন এমন উৎসাহ সহকারে রান্না করে নাই। দাওয়ার একদিকে বনমালী ও নিরাপদর ঠাঁই করিয়া দিয়া তাহাদের আহার করিতে দেয়। নিজে বসিয়া থাকিয়া যত্ন করিয়া খাওয়ায়। খাওয়া হইয়া গেলে তামাক সাজিয়া দেয়। দাওয়ার উপর মাদুর পাতিয়া বিছানা করিয়া দেয় শুইতে।

জাহানাবাদ হইতে আসিতে বড় কষ্ট হইয়াছিল নিরাপদর। পথে একহাঁটু কাদা, সেই কাদা ঠেলিয়া আসা কম কষ্টকর নয়। শুইতে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া যায়। কিন্তু ঘুম আসেনাতো। পা' দুটা তাহার যেন খসিয়া যাইতেছিল তবু কি এক অস্বস্তিকর চিন্তাধারা তাহাকে ঘুমাইতে দিল না।

সে ফিরিয়া আসিয়াছে সেইখানে যেখানের জল হাওয়ায় সে মানুষ হইয়াছে। তাহারই প্রখর-মধ্যাহ্ন বেলার শয়ন-শয্যায় সে ঠিক পূর্ব্বেকার দিনগুলিই ফিরিয়া পাইয়াছে যেন। ঐ দক্ষিণপাড়ার কলাবাগানে পাখী পাখালির ডাক। কৈবর্ত্তপাড়ার ওদিকে ছোট ছোট বাঁশবনগুলায় কাদের যেন হাহাকার, গ্রামের বাহিরে ক্ষেতগুলায় ধানের উপর "ঢেউ খেলিয়া" যাওয়ার অবিরাম গুঞ্জন। বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিরাণীর রূপ সজ্জা মানুষের মনকে থাকিয়া থাকিয়া নাড়া দিয়া যায়।

কত কি সে ভাবিতে থাকে। মানুষ কোনকিছুকে কেন্দ্র করিয়া

কত কি কল্পনা করে কিন্তু ঘটনাচক্রে কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায় তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। নিরাপদ কি কখনও ভাবিয়াছিল বনমালীর সংসারে এমন ঝড় বহিয়া যাইবে? তাহাকে কি আসিয়া এইসব দেখিতে হইবে?

স্বপ্নের মত সব কিছু ঘটিয়া যাইতেছে। বিচিত্র এই জগৎ আর ইহার বুকে বিচিত্র মানুষের খেলা! ঘুমের পিপাসায় চোখ দুইটা জ্বালা করিতে থাকে নিরাপদর। অথচ সে ঘুমাইতে পারে না। কি করিয়া ঘুমাইবে সে? এই দুপুরে তাহার ঘুমাইয়া কাটাইবার কথা নহে। পথে আসিতে আসিতে সে কতবার ভাবিয়াছে, দুপুর বেলাটায় সে কি করিবে! কেবলই তাহার মনে পড়িয়াছে একখানি মুখ, যাহার জন্য সে সর্ব্বস্ব দিতে পারে। সে মুখ কাহার?

একদিন ঘুমন্ত দুপুরে সে নিজে শয়ন করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিয়াছিল, আজ তাহার সে ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে জাগাইতে যাইবারই কথা যে নিরাপদর। তারপর যখন সে জিজ্ঞাসা করিবে, জাগাইলে কেন, তখন নিরাপদ তাহার হাতে টক্ টকে লাল পাড় তসরের কাপড়খানা দিয়া বলিবে—ইহা তোমাকে পরাইয়া দেখিব বলিয়া! তখন কি আর সে ছল করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিবে? কিন্তু সে আসা তাহার স্বপ্নই রহিয়া গেল।

বৈকাল বেলায় সারা গ্রামখানা ঘুরিয়া আসিয়া নিরাপদ সন্ধ্যার দিকে বাড়ী পৌছায়। বনমালী বাড়ী নাই, কাজে গিয়াছে। এখনও ফিরে নাই। নিরাপদ দাওয়ায় উঠিয়া বসিয়া কাঁদনের সহিত গল্প করে। সরকার মহাশয়ের সম্বন্ধে, তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ী সম্বন্ধে, জাহানাবাদের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্বন্ধে নিরাপদ অনর্গল বলিয়া যায়। কাঁদন মুগ্ধ হইয়া যায় শুনিতে শুনিতে।

খানিক পরে ব্রজকে সঙ্গে লইয়া বনমালী ফিরে। কাঁদন উঠিয়া

পলাইয়া যায় ঘরে। বনমালী বলে, নীরো তুই এসেছিস তাই ধরে নিয়ে এলুম ব্রজকে।

নিরাপদ একগাল হাসিয়া বলে, কি ব্রজ ভাই ভাল?

হাঁ ভাই, বলিয়া একদিকে বসিয়া পড়ে।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, তারপর আজকাল করছ কি?

আর করাকরি, ব্রজ খানিকটা বিষাদ মাখা হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠে, আমার দিন ত কাটিয়ে দিয়েচি? যা হয় ক'রে এখন ছেলেগুলোকে মানুষ করে দিতে পারলেই ছুটী নিই।

আচ্ছা তোমার সে বাড়ীর ব্যাপার কি হ'ল, নিরাপদ প্রশ্ন করে। ব্রজ বলিয়া উঠে, সে ত অনেক দিন গেছে ভাই!

তাই নাকি, নিরাপদ সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করে।

বনমালী বলে, তা ছাড়া ও এখান থেকেই বাস তুলে দিয়েচে।

ও, এত খবর ত আমি জানি না, নিরাপদ বলে। ব্রজ বলে, আর খবর নীরো! অনেক আশা করে মানুষ কিন্তু পায়না কিছুই। আশুবাবুর ওপর অনেক ভরসা করেছিলুম কিন্তু কিছুই হ'লনা। বাড়ী ত আমার গেলই তা' ছাড়া বেগার খেটেও মরলুম অনেকদিন।

আশুবাবুর হইয়া ব্রজ সত্য সত্যই কিছুদিন বেগার খাটিয়াছিল। আশুবাবু যে একজন বেশ গুণবান ব্যক্তি গ্রামের লোকের কাছে সে-ই প্রচার করিয়া বেড়ায়। তাহা ছাড়া কোথায় কোন লোক খাজনা দিতে পারিতেছে না, তাহার জমিটুকু কাড়িয়া লইতে হইবে, এ সংবাদ কিছুদিন ধরিয়া আশুবাবুকে ব্রজ যোগাইয়াছে। আজ সেই ব্রজ আশুবাবুর সাহায্য ত দূরের কথা, তাঁহার কাছে গেলে চিনিতেও পারেন না। ইহাই নিয়ম জগতের। যাহাকে দিয়া কাজ করাইতে হইবে, তাহাকে তখন অনেক স্তোকবাক্য শুনাইবে কিন্তু কাজ মিটিয়া গেলে আর তাহাকে চিনিতে পারিবে না।

ব্রজর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার সেই সুন্দর চেহারা আর নাই। ব্রজ যেন এই কয় মাসের মধ্যে বুড়া হইয়া গিয়াছে। গাল দুটো তোব্ড়াইয়া গিয়াছে, গালের হাড় দুটো বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কাণের কাছে যেখানে তাহার গালপাট্টার মত জুল্পি রহিয়াছে তাহার মাঝের হাড় উঠিয়া জুল্পিটাকে ঢেউ খেলাইয়া দিয়াছে। রংটা যেন কালো হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া নিরাপদ প্রশ্ন করে, তাহলে আছ কোথায় ?

ব্রজ বলে, ঐ থাকবার মত যা হয় একটুখানি জুটেচে।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ?

বনমালী বলে, শ্রীরামপুরে।

সে এক বড় করুণ কাহিনী। গত আষাঢ় মাসে এমন হইল যে ব্রজর আর দিন চলে না, ছেলেগুলা খাইতে না পাইয়া বুঝি শুকাইয়া মরে এমনি অবস্থা। ব্রজ কি করিবে কোন উপায় নাই। এমন সময় আসিল মহেশের রথ। তাহার স্ত্রী এর তার ঝাড় হইতে কয়েকখানা বাঁশ চাহিয়া আনিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া কয়েকটা চুপড়ি তৈয়ারী করে। ব্রজ সেইগুলা বিক্রয় করিতে আসে রথের মেলায়। চুপড়ির চাহিদা দেখিয়া উল্টা রথে ব্রজ আরও চুপড়ি লইয়া আসে। কিন্তু মুস্কিল হইল ব্রজর। চুপড়ি তৈয়ারী করা তাহাদের জাত-ব্যবসা নয়। গ্রামের লোক তাহাকে উপহাস করিতে সুরু করিয়া দেয়। সাধারণতঃ ডোম যাহারা তাহারাই চুপড়ি, ঝুড়ি, ধুচুনি প্রস্তুত করে। ব্রজকে তাহাদের পর্য্যায়ে ফেলিয়া উপহাস করার ভিতর বেশ একটা বক্র ইঙ্গিত আছে। ব্রজর দিনকাল খারাপ তাই সে কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চাহে না! অন্তরে একটা তীব্র বিক্ষোভ লইয়া সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

সেবারে রথের মেলায় কিছু পুঁজি করিয়া ব্রজ শ্রীরামপুরের কলবাজারের নিকট ছোট খাটো একটী [illegible] দোকান করে।

এই দোকানটাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র সম্বল। আজ সে আসিয়াছিল এখান হইতে কিছু শাক সব্জী, তরী তরকারী ক্রয় করিতে। পথে দেখা হইয়া যায় বনমালীর সাথে। পুরাণো দিনের বন্ধু, তাই সে ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছে আপনার গৃহে। ব্রজও আসিয়াছে সানন্দে।

তাড়াতাড়ি কথাবার্তা সারিয়া ব্রজ উঠিয়া পড়ে। সন্ধ্যার ট্রেণখানায় তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।

বনমালী বলে, মাঝে মাঝে এসো ব্রজ!

ব্রজ বলে, সময় পাইনা ভাই—কবে যে এ সংসারের ঘানি থেকে রেহাই পাব।

নিরাপদ বলে, ওদিকে কখনো কখনো যেতে হলে এবার সুবিধেই হবে—তোমার ওখানে গিয়ে ওঠা যাবে।

নিশ্চয়—নিশ্চয়, বলিয়া ব্রজ বাহির হইয়া পড়ে। বনমালী তাহার সহিত খানিকটা আগাইয়া যায়।

দুইতিন দিন কাটিয়া যায় সুশীলারা ফিরেনা!

গ্রামের লোক কত কি বলিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে গ্রামে ঢি-ঢি পড়িয়া গিয়াছে। পাঁচুদাসের বউ ও মেয়ে অঘোরের সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছে—ইহা লোকের মুখে মুখে। কেহ কেহ পাঁচুকে আসিয়া অঘোরের সম্বন্ধে গ্রামের ধারণার কথা বলিয়া যায়। পাঁচু নীরবে সব শুনিয়া যায়। হৈ চৈ করা পাঁচুর স্বভাব নয়। কিন্তু সে হৈ চৈ না চাহিলে, গ্রামের লোক চাহিবেনা কেন? মাথাটা যে ব্যাথা হইয়াছে তাহাদের বেশী! তাই তাহারাই খোঁজ খবর লইয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া গ্রামের মধ্যে ঢাক পিটিয়া বেড়ায়। অনেকদিন পরে একটা মুখরোচক ঘটনা পাওয়া গিয়াছে।

রাত্রিতে দাওয়ায় বসিয়া কাঁদন বলে, এ গাঁয়ের লোক একটা কিছু পেলে হয় একবার!

বনমালী বলে, অঘোরটা যে খারাপ লোক খুড়ো কি তা' জানতনা ?

নিরাপদ লজ্জায় মাথা তুলিতে পারেনা। তবু এ তাহাদের একান্ত নিজস্ব আলোচনাস্থল বলিয়া সে যোগ দেয়। বনমালীকে সম্বোধন করিয়া সে বলে, জানিস্ আমি প্রায়ই অঘোরকে ওদের বাড়ী দেখিচি।

কাঁদন বলে, তোমরা যাই বল বাপু সুশীলা কিন্তু সে ধাঁচের মেয়ে নয় !

বনমালী বলে, কিন্তু ওর মা'টা ভাল নয়।

তাহা না হউক ! সুশীলা যে খারাপ নয় এইটুকুই নিরাপদর আনন্দ। সে বলিয়া উঠে, সুশীলা অঘোরকে দু'চক্ষে দেখতে পারেনা !

বনমালী বলে, গাঁয়ে কি আর লোক ছিলনা ওদের সন্নিসি ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবার ?

পাঁচুখুড়োর যেমন কাণ্ড, বলিয়া নিরাপদ কি সব ভাবিতে থাকে।

আজ দুইতিন দিন ধরিয়া উহাদের জন্য নিরাপদর শান্তি নাই। রাতে ঘুমাইতে পারেনা। শুইয়া শুইয়া কত কি চিন্তা করে। হয়ত অঘোর তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে, টাকার জন্য মানুষের পাশব-বৃত্তির লালসাবহ্নির সম্মুখে তাহাদের ধরিয়া দিয়াছে ! কোথায় হয়ত হতভাগিনীরা নিষ্ফল-ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভরাইয়া তুলিতেছে ! সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়ার কথা তাহার মিথ্যা ! অথচ কাঁদন বলিয়াছে, সুশীলা তাহাকে বলিয়াছিল যে সন্ন্যাসী তাদের বাড়ী আসিয়াছিল ! তবে কি সন্ন্যাসীই মিথ্যা ! কে জানে ! নিরাপদর মাথা ঘুলাইয়া যায়।

রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া সেদিন কথাবার্ত্তা একরকম শেষ করিয়া যে-যাহার শুইয়া পড়ে।

রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় নিরাপদর। বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া সে আকাশের দিকে তাকায়। কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বে-উঠা চাঁদের আলোয় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছে। অন্ধকার ঘর হইতে কোন রূপসী মেয়েকে

কে যেন বাহিরে আনিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে, এমনিভাবে রাত্রির জ্যোৎস্নামাখা পৃথিবী পড়িয়া আছে। নিরাপদ উঠান পার হইয়া পথে নামিয়া পড়ে।

আকাশের মাঝামাঝি থ্যাবড়ানো চাঁদটা আলো ঝরাইতে থাকে। পথের দুইপাশের বাব্‌লাগাছগুলো যেন নীরবে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইতেছে, দূরের বন-জঙ্গলগুলা গ্রামপ্রান্তে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। নিরাপদর যে কি হইয়াছে তাহা সেই জানে। গ্রামের বিসর্পিল পথ-রেখা ধরিয়া সে কেবলই চলিতে থাকে।

শরতের শিশিরসিক্ত দুর্ব্বাদলের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। ঘাসের শীর্ষে শীর্ষে জন্মিয়াছে শিশিরবিন্দু, জ্যোৎস্নাধারায় সেগুলা মাটীর বুকে পড়িয়া আছে যেন হাজার হাজার মুক্তা! সামনের দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের-উপর কে যেন আস্তরণ বিছাইয়া গিয়াছে, তাহার নীচে ঘুমন্ত শিশু পরম নিশ্চিন্ততায় পড়িয়া আছে।

নিশীথ-রাত্রির নিস্তব্ধপ্রহরে নিরাপদ এমন করিয়া বেড়ায় কেন? ভোর ত হয় নাই! এখনও যে অনেক দেরী! তবে জ্যোৎস্নার তীর-বেঁধা নিশাচর পাখীর মত সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? কোথায় যাইতে চায় সে? কোথায় যে সে যাইবে তাহার ঠিক নাই, গতি তাহার এলো-মেলো, ছন্দহীন। হিসাব করিয়া কেহই এরকম রাত্রিতে পথে বাহির হইতে পারে না। নিরাপদও হিসাব করিয়া বাহির হয় নাই। যেন তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে। নিরাপদর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন কথাই নাই সেখানে। গ্রাম্যলোকেরা প্রভাতে উঠিয়া নিরাপদর কাহিনী শুনিয়া হয়ত বলিবে তাহাকে নিশি পাইয়াছিল। গ্রামের লোক নিশি পাওয়ায় বিশ্বাস করে, ভয় পায়, দেবতার নিকট পূজা দেয়। কিন্তু ভয় নাই নিরাপদর ভাবনাও নাই। ধান ক্ষেতের আল দিয়া, কোথাও কোন পাটক্ষেতের রিক্ত ও বন্ধুর পথ দিয়া, নিরাপদ

কেবলই চলে আর মাঠের অসমতল বুকে আলের পাশ দিয়া তাহার ছায়াটি পড়ে ঢেউ খেলাইয়া।

নিরাপদকে কি সত্যই নিশিতে পাইয়াছে?

ঐত দক্ষিণপাড়ার প্রান্তসীমা! ঐ মল্লিকদের, বর্ম্মণদের বেরাদের সিংহীদের কলাবাগান! ঐ পাঁচু দাসের বাড়ীর কাছাকাছি অন্ধকার করিয়া রাখা কৃষ্ণচূড়া গাছগুলা! ঐ ওদিকে আশুবাবুর অট্টালিকার ঘুমন্ত একটুকরা বাহির হইয়া রহিয়াছে! ঐ দূরে রেলপথের ডিষ্ট্যাণ্ড-সিগ্‌ন্যালের লাল আলোগুলা বন্যজন্তুর রক্তপিপাসু চক্ষুর মত জ্বল জ্বল করিতেছে। আকাশে রহিয়াছে চাঁদ! দূরে ডানা নাড়িতেছে কোন নিশাচর পাখীর দল! এসবে কি নিরাপদর চেতনা ফিরিয়া আসে না? দিনের জগতের মানুষ নিরাপদ, রাত্রিজগতের চেহারায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, আনন্দ-অবশ চিত্ত তাহার আত্ম-বিস্মৃতির অতলতলে আড়াল হইয়া গিয়াছে—তাই চেতনা নাই তাহার, চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত।

চাঁদের আলো এত সর্ব্বনেশে কে জানিত! মানুষকে মিথ্যা মিথ্যা কষ্ট দেয় এই চাঁদের আলো, মানুষকে মোহাবিষ্ট করিয়া মৃত্যুপথে টানিয়া লইয়া যায় এই চাঁদের আলো! আর একটু হইলেই হইয়াছিল আর কি, নিরাপদর জীবন-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়া যাইত! পায়ের নীচে সুর সুর করিয়া চলিয়া গেল ওটা কি? রূপসী একটা সাপ না!

মুহূর্ত্তমধ্যে চেতনা ফিরিয়া আসে নিরাপদর। বুকটা তাঁহার তখনও ঢিপঢিপ করিতেছিল। এ সে কোথায় আসিয়াছে মৃত্যুর মুখোমুখি! কোথায় সে যাইবে এই উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়া নৈশ-আলোকের ছায়ায় ছায়ায়? কেন আসিয়াছে সে এখানে? আর আসিলই বা কি করিয়া? স্বপ্নোত্থিতের মত কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ঘোর কাটাইয়া নিজের এই রহস্যজনক গতিবিধির কথা চিন্তা করিতে থাকে।

তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে নিশ্চয় তাহা না হইলে সে এখানে

আসিল কি করিয়া? নিরাপদ গ্রাম্য-প্রথানুসারে পরণের কাপড়টা ঝাড়িয়া লয়। তারপর চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া দেখে সে গ্রামের পূব দিক্‌কার জলাভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। রাত্রি কত হইবে কে জানে? নিরাপদ বাড়ীর পথে ফিরিতে থাকে। দূরে গ্রামের মধ্যে চৌকীদারের হাঁক শোনা যাইতেছিল। নিরাপদ চমকাইয়া উঠে রাত্রির গভীরতা উপলব্ধি করিয়া। পা' চালাইয়া সে চলিতে থাকে।

পথের মাঝেই পাঁচু দাসের বাড়ী পড়ে। বাড়ীর কাছে আসিয়া নিরাপদ সম্মুখের কাঞ্চন গাছটার দিকে তাকায়। স্থবিরের মত গাছটা দাঁড়াইয়া আছে, ফাঁকে ফাঁকে তাহার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে মাটীর বুকে। নিরাপদ কিছুক্ষণ দাঁড়ায় সেখানে। সুশীলারা নাই, বাড়ীটার চারিদিকে যেন কত যুগের চাপা দীর্ঘশ্বাস জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। নিরাপদ নিঃশব্দে কয়েক পা আগাইয়া গিয়া দরজার কাছে যায়—দরজায় তালা লাগানো! পাঁচুখুড়ো ক'দিন কালীদের বাড়ীতে রহিতেছে! দরজাটার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিরাপদ ভাবে, সুশীলা যদি আজ থাকিত! আজিকার এই জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে তাহার এই নিঃসঙ্গ এবং নিঃশব্দ বিচরণের একটা অর্থ হইত! মনটা নিরাপদর হাহাকার করিয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে তাহার মনে পড়িয়া যায় বৈশাখ মাসের সেই যাত্রা শুনিয়া আসিবার রাতটী। সেদিন সুশীলা তাহাকে বলিয়াছিল সারারাত্রি ঘুরিবার কথা। কিন্তু নিরাপদর জন্যই তার সে আশা সফল হয় নাই। হতভাগিনী আজ কোথায় গেল যখন নিরাপদ রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে একা একা?

নিরাপদর কি মনে হয়, সেখানেই ঝপ করিয়া বসিয়া পড়ে। আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখে আসে জল। কোন্ বেদনার উৎস হইতে এ স্রোত আসে নিরাপদ বুঝিতে পারে না, অন্তর ভরিয়া কেবল জ্বালা আর জ্বালা! জ্বালা জুড়াইবার জন্য যে

নিরাপদ চোখের জল ফেলে তাহা নয়, চোখে জল আপনা আপনিই আসে, না জানাইয়া অলক্ষ্যে···অথচ ইহার উৎস কোথায় তাহা কি ভাবিলে নিরাপদ পাইবে না? পাইবে কিন্তু মানুষ যে নিজেকে এমনি ভাবে কাঙ্গাল করিয়া চোখের জল ঝরাইতে ভালবাসে কারণ তাহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠে—জ্বালা ভুলিয়া অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইবার সুর। নিরাপদ যখন মানুষ তখন সেও তাহা চায় বৈ কি! তাই নিরাপদ চোখের জল কেন আসে আপাততঃ তাহা বুঝিতে পারে না!

হৃদয়ের অবরুদ্ধ ব্যথার বহিঃপ্রকাশ কি এমনই ভয়ঙ্কর! এত যন্ত্রনা-দায়ক, এত কষ্টকর! বুক ত নিরাপদর হাল্কা হয় না আরও যেন ভারী হইয়া উঠে। নিরাপদ উঠিয়া চলিতে থাকে। ভারাক্রান্ত অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে রহিয়া রহিয়া উঠিয়া আসে দীর্ঘশ্বাস। এ তো ক্ষণিকের শোক নয় নিরাপদর যে একবার কাঁদিলেই তাহার সকল জ্বালা ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া যাইবে? মাতালের মত ছন্দহারা গতিতে সে চলিতে থাকে! কে জানে কে তাহাকে এমন করিয়া মাতাল করিয়াছে, হয়ত হইবে চাঁদের সুধা নয়ত জীবনের আকণ্ঠ পান করা গরল!

খানিক পরে সে বাড়ী আসিয়া পৌছায়। উঠানে পা দিতেই দেখে বনমালী উঠিয়া হাত মুখ ধুইতেছে। কাঁদন দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। দরজার কাছে জ্বলিতেছে আলো। তাহাকে দেখিয়াই বনমালী বলে, কোথায় গেছলিরে নীরো?

আর ভাই বলিস কেন পথে বেরিয়ে কেমন দিশেহারা হ'য়ে গেছলুম, বলিয়া নিরাপদ একবার কাঁদনের মুখের দিকে তাকায়। কাঁদন গালে হাত দিয়া বলে, ওমা সেকি কথা গো?

আর বল কেন বৌঠান, বলিয়া নিরাপদ হাত ঘুরাইয়া কোন্ কোন্ দিকে সে গিয়াছিল তাহা জানাইয়া দেয়।

বনমালী বলে, বলিস্ কিরে?

কাঁদন বলে, নিশিতে ডেকেছিল তা'হলে ?

এতক্ষণে নিরাপদর ভয় হয়। মনে পড়ে খাঁ-খাঁ করা উন্মুক্ত প্রান্তর, মনে পড়ে মাঠের পথে সেই সাপটা, তাহার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠে, গায়ে কাঁটা দেয়। ভাগ্যে সে স্ত্রীলোক নয় তাই রক্ষা। তাহা না হইলে এখনই পড়িয়া গিয়া, সংজ্ঞা হারাইয়া নিশি ও তাহার প্রেত-জগতের নানা দেব দেবীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সারা গ্রামখানিকে বিব্রত করিয়া দিত। নিরাপদ পুরুষ হইয়া নিজেও বাঁচিয়া গিয়াছে এবং আরও পাঁচজনকে বাঁচাইয়াছে।

কাঁদন এই প্রসঙ্গে কবে নিশিতে কাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া গাছের উপর বসাইয়া রাখিয়াছিল এবং গ্রামের লোক প্রায় তিনদিন পরে কেমন করিয়া সেই হতভাগাকে আবিষ্কার করিয়াছিল সেই সকল কাহিনী বলিতে থাকে।

নিরাপদ বলে, বনমালী এত রাত্রে উঠলি যে ?

বনমালী আকাশের দিকে তাকাইয়া বলে, বেরুবার সময় হয়েছে যে —তুই যাবি না ?

বাঃ মজা! নিরাপদ ত বনমালীর গাড়ীতে শেওড়াফুলি যাইবে, কথা হইয়াছিল। তাহার মনেই ছিল না যে আজ হাটবার। সে বলে, হ্যাঁ যাব বৈ কি!

নে তবে হাত মুখ ধুয়ে নে, বলিয়া বনমালী অপেক্ষা করে।

নিরাপদ বলে, বৌঠান সেই কাপড়খানা আর বাসন দুটো বের ক'রে দিও তো ?

দিই, বলিয়া কাঁদন সেগুলা আনিয়া দেয়। সেগুলা দিনের বেলাতেই সে ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিল। নিরাপদ সেগুলা লইয়া কাঁদনকে বলে, বৌঠান আজকে আর আসবনা আমি।

কাল আসবে ত, কাঁদন জিজ্ঞাসা করে। নিরাপদ উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

তারপর বনমালী ও নিরাপদ দুইজনে আশুবাবুর বাড়ীর দিকে যায়। সেখানে কালী, পাঁচু, শশী, বিপিন গোপাল সকলের সহিত দেখা হয়। কলার গাড়ীর উপর চাপিয়া যে যাহার গাড়ী চালাইতে সুরু করিয়া দেয়, নিরাপদ বনমালীর গাড়ীর পিছন দিকটায় বসিয়া পড়ে, উপরে থাকে রাত্রির জ্যোৎস্না-মাখা আকাশ, তাহারই দীপ্তি ছড়ানো পথের পাশে জঙ্গলগুলার কৃষ্ণবর্ণ গায়ে গরুর গাড়ীর নীচের আলোয়, চাকা-ঘোরার গড়ানো ছায়া, কেবলই গড়ায়।

বনমালী নিরাপদর নিশি পাওয়া কাহিনীটা চীৎকার করিয়া সকলকে শুনাইতে থাকে। নিরাপদ কোন ফাঁকে পাঁচুকে জিজ্ঞাসা করে, খুড়ো ওদের কিছু খবর পেলে ?

পাঁচু বলে, না।

বনমালী পিছন দিকে তাকাইয়া দেখে নিরাপদ তাহার পিছনের গাড়ীর চালক পাঁচুর সহিত কথা বলিতেছে। বনমালী বলে, নীরো তুই বলনা তারপর কি হল।

নিরাপদ বলে, নিশি পাওয়া ? তারপর নিরাপদ নিশি পাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিতে থাকে।

সকালবেলা শেওড়াফুলি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহারা। নিরাপদ নামিয়া পড়ে গাড়ী হইতে। বনমালীকে চুপি-চুপি বলে, তাহ'লে আমি যাই বনমালী ?

বনমালী বলে, আচ্ছা ! দুপুরের দিকে পারিস ত আসিস।

দেখ্‌ব, বলিয়া নিরাপদ রাধার বাড়ীর দিকে চলিতে থাকে।

প্রভাতের সোণালি রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে দিকে পালকমেঘ ছড়াইয়া আছে পেঁজাতুলার মত ! কোথাও আকাশটাকে মনে হয় যেন কোন গৃহবধূ তাহার একান্ত পরিচিত

গৃহাঙ্গণটী সম্মার্জ্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। প্রভাতসূর্য্যের ক্রমবর্ণায়মান দীপ্তির স্পর্শে আকাশের কোন কোন অংশ আবার রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। বাতাস বহিতেছে মৃদুমন্দভাবে। প্রভাতের মিষ্ট মধুর আবহাওয়া নিরাপদর মনে দিতেছে দোলা।

রাধার বাসার কাছে আসিয়া নিরাপদ খানিকটা ইতঃস্তত করে। অনেক দিন আসে নাই বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। চোখ দুইটা লাগে গরম গরম, কোন দিকে না তাকাইয়াই ঘাড়টা নীচু করিয়া সে চলিয়া যায় ভিতরে। উঠানের পাশেই রকের উপর দেখে, গেরুয়া পড়া এক ভৈরবী ধ্যানস্তিমিত চক্ষে বুকের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া আছে। সামনে রহিয়াছে তাহার গঙ্গা-জলে ভরা কোষা-কুষি। নিরাপদ প্রথমে চিনিতে পারে না। পরে ভৈরবী চোখ মেলিতেই, দৃষ্টিটা যেন তাহার চেনা চেনা বলিয়া মনে হয়, তারপর চিনিতে পারে। ভৈরবীটী বাড়ীউলি। জীবনের খেয়াঘাটে আসিয়া অতীতের পঙ্কিলময় দিনগুলিকে ফাঁকি দিবার জন্যই তাহার এ ধ্যান-ধারণা।

ভৈরবী নিরাপদর দিকে কটাক্ষপাত করিতেই নিরাপদ মুখ নামাইয়া ফেলে। বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া উঠানের মাটী খুঁড়িতে থাকে। ভৈরবী প্রশ্ন করে, কাকে চাও বাছা?

নিরাপদ মুখ তুলিয়া বলে, রাধাকে—

কে রাধা, ভৈরবী ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করে।

নিরাপদ বলে, আমার বোন—

তোমার বোন, ভৈরবী নিরাপদর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে, নতুন বেরিয়ে এসেছে বুঝি?

নিরাপদ ঘাড় নীচু করিয়া তেমনি করিয়া মাটী খুঁটিতে খুঁটিতে বলে, না এখানে ছিল।

তাই নাকি, ভৈরবী বলে।

নিরাপদ বলে, রাধা আর অমরবাবু?

কত কে যে আসে যায়, তাহাদের সকলেরই কি ভৈরবী খবর রাখিতে পারে? তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখে। হঠাৎই যেন মনে পড়িয়া যায়, এমন ভাবে বলিয়া উঠে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ সেই যে—যে মেয়েটা সেই চলে গেল? মিন্‌সেটা টিকিট চেকারের কাজ ক'রত না?

নিরাপদ জিজ্ঞেস করে, রাধা এখান থেকে চলে গেছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ সে যে অনেক দিন এখান থেকে চলে গেছে, বলিয়া ভৈরবী আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে।

নিরাপদ উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গেছে সে?

তা' জানি না বাপু, বলিয়া ভৈরবী পাশের ঘরখানায় প্রবেশ করিতে যায়। উঠানে তাহার একজন পুরাতন লোক দেখিয়া বলিয়া উঠে, হ্যাঁলা ক্ষান্ত তুই বলতে পারিস্, রাধা কোথায় গেছে?

ক্ষান্ত বিগত রজনীর তিক্ত আনন্দের স্পর্শমাখা চোখ দুইটা মেলিয়া বলিয়া উঠে, হ্যাঁগা তুমি রাধার দাদা না?

নিরাপদ ঘাড় নাড়িয়া জানায়। ক্ষান্ত বলে, হ্যাঁ আমি দেখেই চিন্‌তে পেরেচি। তা' রাধা ত এখানে নেই!

কোথায় গেছে, নিরাপদ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে।

ক্ষান্ত বলে, সে গেছে খুঁড়িগাছি, সেইখানেই থাকে চাঁপদানীর চটকলে কাজ পেয়েচে।

নিরাপদ আর কিছু শুনিতে চায় না। পথে বাহির হইয়া পড়ে। কি মনে করিয়া আবার সে ফিরিয়া আসে। ক্ষান্তকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়া উঠে, আচ্ছা কেন সে গেল?

ক্ষান্ত ফিরিয়া দাঁড়ায়। বলে, কি বল্‌ছ?

কেন সে গেল এখান থেকে, পুনরায় নিরাপদ জিজ্ঞেস করে।

ক্ষান্ত বলে, তা' জানিনি বাপু। তারপর সে চলিয়া যায় তাহার ঘরে। নিরাপদ দাঁড়াইয়া থাকে কিছুক্ষণ। কি যেন ভাবে, তারপর সেও চলিয়া আসে।

জোরে জোরে পা' ফেলিয়া সে হাটের দিকে চলিতে থাকে। বনমালীর কাছে আসিয়া সে চুপি চুপি সব বলে। বনমালী সব শুনিয়া বলে, হয় ত যা' ভেবেছিলুম তাই হয়েছে!

হইবেও বা! সুভদ্রা যে ধরণের স্ত্রীলোক তাহাতে তাহার পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়। হয় ত সে অমরবাবুকে ভজন-সজন দিয়া সরাইয়া লইয়া গিয়াছে আর রাধা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গিয়াছে চটকলে কাজ করিতে! নিরাপদ বলে, মেয়েমানুষ এত ভয়ঙ্করও হয়?

হেঁ হেঁ, বনমালী হাসিয়া বলে, নীরো তখনই বলেছিলুম!

যেন সত্য সত্যই সুভদ্রা রাধার চলিয়া যাওয়ার মূলে আছে এমনি ভাবে উহাদের আলোচনা চলে। নিরাপদর জাহানাবাদ চলিয়া যাওয়ার জন্য বনমালীর মনে একটা ক্ষোভ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া গিয়াছে। এই সুযোগে সে বলে, নীরো অত তাড়াতাড়ি তুই না চলে গেলে কি আর এ রকম হ'ত!

নিরাপদ স্বীকার করে সে কথা।

কিন্তু বনমালীর যেন এই সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলিবার রহিয়া গিয়াছে। বনমালী বিশ্বাস করে নিরাপদ যদি জাহানাবাদ না যাইত তাহা হইলে তাহার খেঁদি মারা যাইত না। তাহার সংসারে নিরাপদর উপার্জ্জনের অর্থ যদি ঐ সময়টুকুতে যোগান পাইত তাহা হইলে কন্যার চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত হইতে পারিত। সেই বেদনাময় অভিমানটুকু আজ যেন রাধার এই ঘটনা উপলক্ষ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িতে চায়। অথচ নিরাপদকে আঘাত না লাগে এমনও একটা

ভাব বনমালীর মনে জাগিয়া উঠে। বনমালী বলে, তুই গেলি গেলি একেবারে ঝড়ের মত চ'লে গেলি।

নিরাপদ যে দোষ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা যেন অত্যন্ত স্পষ্টরূপে তাহার মনের কাছে ধরা দেয়। সে বলে, কি করি জন্মস্থান—দ্যাখ্‌বার বড় ইচ্ছে হ'ল!

দ্যাখদিকিন্‌ কি হ'য়ে গেল, বনমালী অন্তরের বেদনারক্ত ভাষায় বলিয়া উঠে, তুই না গেলে মেয়েটা মরত না আর রাধারও এমন অবস্থা হ'ত না।

অনুমানের প্রামাণ্যের মাঝে বেদনার বহিঃপ্রকাশ। নিরাপদ বুঝিতে পারে কিন্তু কিছু বলে না। বলিবার ভাষা তাহার নাই। তবে মানুষের চিরন্তন অভ্যাস অনুসারে, নিজের দোষে কেবলই অন্যের অপকার করিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া নিরাপদ সেই অপকার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে—অবশ্য তাহার মাঝে তাহার দোষ স্বীকারের ঔদার্য্য আছেই। অস্ফুটস্বরে সে বলে, রাধা সুভদ্রার জন্যে চ'লে গেছে তা' হয় ত নাও হ'তে পারে।

তা' অবশ্যি বলা যায় না, বনমালী বলে।

নিরাপদ সমর্থন পাইয়া বলে, সেই—সেই কথাই বলছি।

একই কথার পুনরাবৃত্তি বনমালীর ভাল লাগিতেছিল না। সে বলে, তাহ'লে তুই যদি রাধার কাছে যাস ত খাওয়া দাওয়া করে যা'।

হাঁ তাই যাব, নিরাপদ বলে, কিন্তু খুঁড়িগাছি কোন্‌দিকে তা' তো জানি না।

জীবনযাত্রার ঘূর্ণায়মান চক্র তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ দিয়া যেদিকে লইয়া যায় তাহারই বাঁধাধরা রেখাটুকুর সহিত ইহারা পরিচিত। বনমালীও জানে না খুঁড়িগাছির পথ। সে বলে, শুনিছি ঐ চাঁপদানীর দিকে।

চাঁপদানীই বা কোন দিকে? অনেক সময় খরিদ্দারদের মুখে মুখে

চাপদানী প্রভৃতি জায়গাগুলির বর্ণনা শুনিয়া উহারা ওদিকটা সম্বন্ধে একটা মনগড়া কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে। মনে মনে সেই কল্পনাজাত পথের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিরাপদ বলে, দেখি সরকার মশাইকে জিজ্ঞাসা করে।

নিরাপদ উঠিয়া পড়ে। বনমালী বলে শীগ্‌গির আসিস্‌?

হ্যাঁ, বলিয়া সে চলিয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে সরকার মশায়ের নিকট হইতে পথের নির্দ্দেশ পাইয়া নিরাপদ ফিরিয়া আসে বনমালীর কাছে। উভয়ে স্নান সারিয়া আহার করিতে যায়। আজকাল আর অন্নপূর্ণা ভোজনালয় নাই। অন্য কি একটা হোটেলে খাইয়া তাহারা গাড়ী লইয়া প্রস্তুত হয়।

নিরাপদ বলে, সেই যখন বদ্দিবাটী যেতে হবে চল তোর গাড়ীতেই যাই। নিমাইতীর্থের ঘাটের কাছে নেমে পড়্‌ব!

চল্‌, বলিয়া বনমালী গাড়ী হাঁকাইয়া দেয়! গঙ্গার ধারের পথে পথে গাড়ী চলিতে থাকে। নিমাইতীর্থের ঘাটের কাছে গাড়ী আসিলে নিরাপদ নামিয়া পড়ে।

অস্তসূর্য্যের রক্তরাঙা মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া বনমালী বলে, কাল তাহ'লে ফিরিস?

হ্যাঁ, বলিয়া তসরের কাপড় ও খড়ারের বাসনের পুঁটুলিটা কাঁধে ফেলিয়া নিরাপদ চলিতে থাকে খুঁড়িগাছির দিকে। বনমালী গাড়ী ছুটাইয়া দেয় গৃহাভিমুখে।

পথ সোজা···

গঙ্গার ধারে ধারে নিমাই-তীর্থের ঘাটের পাশ দিয়া যে রাস্তাটী উত্তরদিকে আসিয়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে মিশিয়াছে তাহারই প্রায় একশত

গঞ্জ বাঁদিকে একটা কাঁচাপথ সোজাসুজি উত্তরদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পথে মাইলখানেক চলিবার পর, ঠিক নর্থব্রুক চটকলের পিছনদিকেই খুঁড়িগাছি পড়ে।

খুঁড়িগাছি জায়গাটা বেশীদিনের নয়। একদিন এখানটা নিবিড জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সেই জঙ্গল রেলপথের কল্যাণে কিছু কিছু নষ্ট হয়। তারপর গ্রামের পরিত্যক্ত ভূমির মত কিছুদিন পড়িয়া থাকে। ইহারই মাঝে বাংলা দেশের গঙ্গার ধারে ধারে ধীরে ধীরে চটকলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বণিকদের বণিকবৃত্তির দুর্ণিবার ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়োজনে একদিন এদিকটারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাই খুঁড়িগাছির ঠিক পূর্ব্বদিকেই চাঁপদানীতে কয়েকটা চটকলের সৃষ্টি হয়। চটকলের শ্রমিকরা আশে পাশে পড়ে ছড়াইয়া। ভোরবেলাকার নির্দ্দিষ্ট সময়ে কারখানায় হাজিরা দিতে হয় বলিয়া শ্রমিকরা দূরে থাকিতে পারে না। তখন আপনা আপনিই প্রয়োজন হইয়া পড়ে নিকটস্থ আশ্রয়স্থল। ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত জায়গার জঙ্গল সাফ হয় আর একটী একটী করিয়া বসতি বাড়িতে থাকে। তারপর কবে যে স্থানটার নাম হয় খুঁড়িগাছি তাহা অতটা কেহ বলিতে পারেনা।

ইহাতো খুঁড়িগাছির জন্ম-ইতিহাস। এই ইতিহাসের সহিত আরও একটা ইতিহাসের সূচনা হয় এখানকার মানুষগুলিকে কেন্দ্র করিয়া। সে ইতিহাস বিশেষ এক বক্র ইঙ্গিতে ভরা। এই ইঙ্গিত অবশ্য করে গ্রাম্য শ্রমিকের দল। কারখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ গ্রাম হইতে যে সকল লোক কাজ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু আজও গ্রামে রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ হয়ত আজও কারখানায় আসে, কেহ কেহ আসেনা। যাহারা আসেনা তাহাদের ছেলেপুলেরা আসে। রেলের গলা পুল পার হইয়া, খুঁড়িগাছির ভিতর দিয়া তাহাদের যাতায়াত করিতে হয়। গ্রামে থাকিয়া থাকিয়া তাহারা

একটা জিনিষ পাইয়াছে, জীবনের মধ্যে সততা যতখানি থাক বা না থাক আছে সততার ভাণ, পবিত্রতা যতখানি থাক বা না থাক আছে তাহার অভিনয়, ধার্ম্মিক যতখানি হোক বা না হোক আছে ধর্ম্মের ভোল। গ্রামে পৌরাণিক নাটকের উপদেশপূর্ণ যাত্রা, কথকতা, ধর্ম্মের বহুযুগচর্ব্বিত পুনরাবৃত্তি, বার মাসে তের পার্ব্বণ, দেখিয়া শুনিয়া তাহারা তদনুযায়ীই চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু জীবনসংগ্রামের অসহ্য জ্বালা তাহাদের টানিয়া লইয়া যায় আরেকদিকে। তাই কারখানার মধ্যে যখন তাহারা অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে তখন তাহাদের স্বতন্ত্র রূপ বড় একটা চোখে পড়েনা। কিন্তু বাহিরে আসিলেই অসতী কুলবধূর মত গ্রাম মোহিনীমূর্ত্তিতে তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকে। যাইবার সময় পথের দুধারে খুঁড়িগাছির কুঁড়েঘরগুলোর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া নাক-সিঁটকাইয়া চলিয়া যায়। কারণ এখানে যাহারা থাকে তাহাদের অধিকাংশই প্রায় রাধার মত।

এখানের বেশীরভাগ ঘরেই নৈতিক সুস্থতার কোন চিহ্ন নাই। এক একজন পুরুষের দুইতিনজন স্ত্রী আছে আবার এক একজন স্ত্রীলোকের দুইতিনজন করিয়া পতি আছে। প্রয়োজন মত পতি-পত্নী মনোনয়ন করিতে ইহাদের বাধেনা। তাহার জন্য ঝগড়া, মারামারি, খুনোখুনি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এসব যে ইহারা ইচ্ছা করিয়া করে তাহা নহে—এসব ইহাদের নিত্যকার জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য অঙ্গ। মানুষ আনন্দ চায়, সেই আনন্দ যদি ঠিক ঠিক না পায়, বিপথগামী হইতে কতক্ষণ! আর বিপথগামীর দল যখন চারিদিকে থৈ থৈ করিতেছে তখন সাধারণ নিয়মে এইটাই ত এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার দর্শন। প্রতিদিনকার আহারের মত এই গরল পান করিতে এখানকার মানুষ বাধ্য। এখানে কোন নিয়ম নাই তাই এত অবাধ। গ্রামে নিয়ম নাই, আছে নিয়মের কঙ্কাল, তাই সেথা মোহটা

এখনও আছে। সেই মোহের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাম-আগত মানুষগুলা খুঁড়িগাছির সম্বন্ধে বক্র ইঙ্গিত করিয়া থাকে। গ্রাম্য সভ্যতায় অভ্যস্ত নিরাপদও কি এই ইঙ্গিত করিবে নাকি ?

খুঁড়িগাছি জায়গাটার ভিতরে আসিতেই পড়ে শিবু ঘোষের মুদীখানার দোকান। সরকার মশায় নিরাপদকে এই শিবু ঘোষের দোকানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে এদিকে তাগাদা করিতে আসেন তাই তিনি শিবু ঘোষের দোকানটা জানেন। আর ইহাও তিনি জানেন যে এ তল্লাটে এক শিবু ঘোষের দোকান ছাড়া অন্য কোন দোকান নাই। সুতরাং এখানে বাস করিতে হইলে শিবুর দোকানে সওদা লইতে হইবে আর তাহাতেই দোকানদার তাহাকে চিনিবে। সরকারমশাই নিরাপদকে একেবারে ঠিক ঠিকানায় আসিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। নিরাপদ ঠিকই আসিয়াছে।

নিরাপদ শিবুর দোকানের বাহিরে পাতা বেঞ্চিটার উপর বসিয়া বসিয়া শিবুর সহিত গল্প করে, আর শিবু খক্ খক্ করিয়া কাসে। শিবু হাঁপানী রোগী। এখানে আসিয়া শিবুকে রাধার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নিরাপদ জানিতে পারে, সে কারখানায় গিয়াছে, সন্ধ্যায় ছুটী হইলে তবে ফিরিবে। শিবু নিরাপদর নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সহিত রাধার সম্পর্ক জানিয়া লইয়া, বেশ ভাব সাব করিয়া তাহার সহিত গল্প জমাইয়া দিয়াছে। এ সময়টায় তাহার দোকানে খরিদ্দার তেমন নাই। লোকজন সব কারখানা হইতে আসিলে তবে বিক্রী হইবে। ততক্ষণ নিরাপদর সহিত গল্প করিলে মন্দ হইবেনা দেখিয়া সে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়াছে।

শিবুর দোকানের সামনেই খানিকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠে অন্ধকার নামে ক্রমবিলীয়মান দিবালোকের পাশ দিয়া। আকাশের দিকে দিকে

নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে একটী একটী করিয়া। শিবুর দোকানের পূর্ব্বদিকে একটা শিউলি গাছ হইতে মৃদুভাবে আসে ফোটা ফুলের গন্ধ। এমন সময় কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠে, ভোঁ-ও-ও-ও

শিবু বলে এইবার আসবে।

নিরাপদ বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া দোকানের সামনে পথের উপর পায়চারী করিতে থাকে। শিবু গঙ্গাজল ছড়াইয়া ধুনুচিতে টীকা জ্বালিয়া ধূণা দিয়া দোকানে সন্ধ্যা দেয়। এই দোকানই তাহার অর্থাগমের একমাত্র পথ তাই দেবতাকে প্রণাম জানায় ভক্তি-ভরে। চটকলে কাজ করিয়া তাহার কি কখনও দোকানের মত আয় হইত? হায়রে, দোকানই কি করিত সে যদি না বণিক-সভ্যতা তাহার বুকের মধ্যে হাঁপানি রোগের বীজাণু আনিয়া দিত? পনেরো বৎসর বয়স হইতে একটী একটী করিয়া পাচটী বৎসর সে চটকলের মধ্যে কাটাইয়া দিয়া পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছে এই রোগটী। ধন্যবাদ এই সভ্যতাকে।

যন্ত্রের হঠাৎ-ছাড়া বাষ্পের মত শ্রমিকেরা এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসে। হাজার হাজার ক্লান্ত পদের রুক্ষ চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যায় পথের উপর। বাতাসে শোনা যায় তাহারই সকরুণ গীতি। দলে দলে আসে তাহারা, অবিরাম, অবিশ্রান্ত যেন কঙ্কালের মিছিল।

নিরাপদ স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে ঐ মিছিলের দিকে। কত লোক যায়। কাহারো হাতে কারখানার তেল দড়ি জ্বালা, অন্ধকারে দুলাইতে দুলাইতে পথ আলো করিয়া চলিয়াছে। নিরাপদ সেই আলোকে পথ-চারীদের মুখের দিকে তাকাইয়া লয়। বিশুষ্ক মুখমণ্ডল, পাণ্ডুর ছায়ায় আবৃত, গায়ে কারখানার তেল কালির একটা তীব্র গন্ধ। জন্তুর মত নিষ্প্রভ চোখের চাহনি দিয়া তাহারাও নিরাপদকে দেখে। নিরাপদর দৃষ্টিতে ঔৎসুক্যের ইঙ্গিত দেখিয়া তাহারা চলিয়া যায়। কেহ কেহ নূতন লোক দেখিয়া দাঁড়াইয়াও পড়ে।

চোয়াড়ে গোছের একজন লোক নিরাপদকে জিজ্ঞাসা করে, কোথা যাবে গো ?

নিরাপদ বলে এইখানেই !

এইখানেই ! বিস্মিত এবং অনুসন্ধিৎসুর মত সে নিরাপদর কথার আরও স্পষ্ট অর্থ শুনিতে চায়।

নিরাপদ তাহা বুঝিতে পারিয়াও পুনরায় বলে, এইখানেই।

এইখানের ত একটা মানে আছে হে, লোকটা কর্কশস্বরে বলে।

তাহার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিরাপদ কেমন হইয়া যায়। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সে চাহিয়া থাকে লোকটার দিকে। লোকটার পিছনে আরও কয়েকটা লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সেদিকে তাকাইয়া বলে, আচ্ছা লোক ত ? তারপর নিরাপদর দিকে তাকাইয়া বলে, তোমার নাম কি ?

নিরাপদ এক মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছে। শিবুর দোকানের দিকে তাকায়। শিবু কারখানা-প্রত্যাগত শ্রমিকদের জিনিষ দিতে ব্যস্ত। নিরাপদ হাসিয়া বলে নাম যদি না বলি ?

লোকটা ঝট করিয়া নিরাপদর ফতুয়াটা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বলে, বলবে না কি ?

নিরাপদ এ কি অবস্থায় পড়িয়াছে ? চারিদিকে সে নির্ব্বোধের মত তাকাইতে থাকে। হাতের তেল দড়ি জ্বালা আলোটা তুলিয়া কে অমন করিয়া তাহার দিকে তাকাইতেছে ? শুষ্ক মুখমণ্ডল, জটার মত মাথায় রুক্ষ চুল ? রাধা না ?

হ্যাঁ রাধাই। নিরাপদ তাহার দিকে তাকাইয়া কি বলিতে যায়। রাধা সম্মুখের লোকজনগুলাকে ঠেলিয়া নিরাপদর কাছে আসিয়া বলে, কখন এলে ?

যে লোকটা নিরাপদকে ঝাঁকানি দিয়াছিল সে হাসিয়া বলে, তলে তলে এত রস! তারপর চলিয়া যায়।

রাধা লোকটার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলে, না গো না মিস্ত্রী আমার ভাই হয়।

তা হবে বৈ কি, বলিয়া আরও কি একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া লোকটা চলিয়া যায়।

রাধা হাসে। তারপর দাদাকে যেন কি বলিতে যায়। নিরাপদ রাধার মুখের দিকে তাকাইয়া কি দেখে। রাধা এ হইয়াছে কি? কোথায় তাহার আগেকার সেই শ্রী? কোথায় তাহার সেই রূপসজ্জা? শরীর হইয়াছে শক্ত কাঠ, চোখগুলা কোটরপ্রবিষ্ট, মুখমণ্ডল গিয়াছে চুপষিয়া। সারাদিন বোধহয় চুলগুলা বাঁধা ছিল, কারখানা হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে খুলিয়া দিয়াছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ চুল হইতে হাওয়ার সহিত উড়িয়া যাইতেছে। তেলচিটে ময়লা একখানা কাপড় পরণে, কাপড়ের ভিতরে লাল রঙের একটা জামা। কোমরে ওটা ঝুলিতেছে কি, পাটের গাঁট কাটা ছুরী না?

রাধাকে দেখিয়া নিরাপদর মনটা বিষাদে ভরিয়া উঠে। পূর্ব্বে সে দেহের পসরা লইয়া কামাতুর মানুষের হাটে ফিরি করিত আর আজ করে শ্রমের পসরা লইয়া অর্থগৃধ্নু বণিকদের হাটে। পরিবর্ত্তন কিছুটা হইয়াছে—প্রথমে গিয়াছিল মনটা, এখন যাইতেছে দেহটা এবং দেহ ও মনের অধিকারী মানুষটাও বটে। কিন্তু সে যাহা হউক নিরাপদ যেদিন রাধাকে গণিকাবৃত্তি করিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেদিন তাহার অন্তরে যে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল তাহা আজ হয়ত তাহার মনে নাই কিন্তু আজ রাধাকে দেখিয়া যেভাবে ব্যথা পাইতেছে, তাহার মনে হয় জীবনে সে কখনও এত দুঃখ পায় নাই। কেন নিরাপদর আজ এমন মনে হইতেছে?

নিরাপদর জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয় গ্রামের আবেষ্টনীর মধ্যে। সেখানে সতী ও অসতীর মাপকাঠীতে হয় নারীর মূল্য নিরূপণ—তাহার বাহিরে নারী যে পুরুষের জীবনযাত্রার পথে কর্ম্মসহচরী ইহা সে ভাবিতে পারে না। তাই মেয়েদের মাঠে ঘাটে, কল কারখানায় পুরুষের সাথে পাশাপাশি কাজ করিতে দেখিলে তাহার কেমন কেমন ঠেকে, কষ্ট হয়। মেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় বেশ্যাবৃত্তি করুক ইহা সহ্য হইবে কিন্তু সহ্য হইবে না তাহাদের শ্রম করিতে দেখিলে—ইহাই তাহার আবেষ্টনীর মূলকথা।

দাদার মুখের রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে কোন ভাষা, রাধা তাহা বুঝিতে পারে না। সে বলে, এ্যাদ্দিন আসনি কেন ?

নিরাপদ বলে, দেশে গেছলুমরে !

দেশে ? জিজ্ঞাসা করে রাধা।

যেখানে আমরা জন্মেছিলুম, নিরাপদ বলে।

ওঃ—তারপর, রাধা যেন ব্যস্তভাবে বলে, আজ থাকবে ত ?

নিরাপদ আজ থাকিবে বলিয়াই ত আসিয়াছে। কতদিন বোনটীর সহিত তাহার দেখা হয় নাই, কত কথা বলিবে সে। কিন্তু আশ্চর্য্য রাধার এই ব্যবহার। নিরাপদর মনে পড়ে একদিন এই রাধা তাহাকে পথের মাঝখান হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল ঘরে, আর আজ ? আজ রাধার কি হইয়াছে সে এমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে থাকিবে কি না ? ইহা কি তাহার জীবনের পরিবর্ত্তনের সাথে আসিয়াছে, এই অনাত্মীয়ের মত থাকা না থাকার কথা জিজ্ঞাসা করা ? কই যতদিন সে শেওড়াফুলিতে ছিল একদিনও ত এমন করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই ? তাহার সেই ভক্তি-শ্রদ্ধা-স্নেহ-দয়া-মায়া-ভালবাসা কি অন্তর হইতে উঠিয়া গিয়াছে ? এসব কথা ভাবিতে ভাবিতে নিরাপদ ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হ্যাঁ থাকিবে।

রাধা বলে, দাঁড়াও তবে দোকানে জিনিষের কথা বলে যাই।

তারপর সে দোকানের দিকে আগাইয়া যায়। নিরাপদও যায় পিছন পিছন। দোকানের বেঞ্চিতে তাহার পুঁটুলিটা আছে।

রাধা শিবুকে লক্ষ্য করিয়া বলে, অ' দোকানি আমাকে সওদা' দাও তো গা ?

ব্যস্ত শিবু রাধার দিকে না তাকাইয়াই বলে, বল কি দিতে হবে ?

সুজী, চিনি আর চা-ও দিও, বলিয়া রাধা দাদার দিকে তাকায়। নিরাপদ পুঁটুলিটা বগলে তুলিয়া লয়। রাধা বলে ওসব কি ?

কাপড় চোপড় আছে, বলিয়া নিরাপদ পুনরায় পথে আসিয়া দাঁড়ায়। রাধা শিবুকে বলে, দোকানি ঘি-এর জায়গা আনিনি যে কি করে দেবে।

জায়গা নিয়ে এসো, বলিয়া শিবু কাসিতে কাসিতে জিনিষপত্র ওজন করিতে থাকে। রাধা বলে, তবে বাপু তুমি ওগুলো দিয়ে রাখ ঘি-এর যায়গা নিয়ে এসে একেবারে নিয়ে যাব।

সেই ভাল, শিবু বলে।

রাধা বলে, তাহলে সব পাঁচ ছটাক পাঁচ ছটাক দিও—চা-টা শুধু এক পয়সার—

তারপর দাদাকে ডাকিয়া লইয়া রাধা চলিতে থাকে।

নিরাপদর যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে! এ সে কোথায় আসিয়াছে ? কোথায় তাহার সেই ভগিনী রাধা! এ যাহার সহিত সে চলিয়াছে এ ত' তাহার পূর্ব্বেকার ভগিনী নয়। সে ছিল কোমল, এযে রুক্ষ কর্কশ! তবে কি এখানকার জীবনযাত্রার রীতিই এই। ঐ যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে তাহার ফতুয়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়াছিল ঠিক সেই লোকটার মতই। উঃ লোকটা কি রুক্ষ স্বভাবের!

পথে চলিতে চলিতে রাধা বিশেষ কথা বলে না। নিরাপদ চলে চিন্তান্বিতভাবে। এক জায়গায় পথের পাশে খানিকটা পোড়ো-জমি,

কাহাদের একটা খোলার ঘর হুম্‌ড়ি খাইয়া সেখানে পড়িয়া আছে। বাঁশের ঠেক্‌নো দিয়া দুয়ারের চালটাকে খানিকটা খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। নিরাপদ তেল-দড়ির আলোয় দেখিতে পায় কয়েকটা ছেলে ঘরের দুয়ার হইতে লাফ দিয়া ঘরের পিছন দিকে পালাইয়া গেল!

পিছনে দাদা আছে জানিয়া রাধা বলিয়া উঠে, কারারে কারা!

একটা আট দশ বছরের মেয়ে ঘরের পশ্চিম দিক দিয়া ছুটিয়া পালাইতে পালাইতে বলে, বড় হই আগে মুখপোড়ারা বড় হই আগে।

ছেলেগুলো অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে মেয়েটার পিছন পিছন দৌড়ায়।

রাধা তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলে, তা' যা' ঘরে যা!

নিরাপদ চমকাইয়া উঠে। এ-সব গ্রামেও আছে কিন্তু এতখানি নগ্নতা সেখানে নাই। ঐ ত কচি কচি ছেলেগুলো!

বাঁ দিকে রাধার খোলার ঘরখানা। পথ হইতে নামিয়া পড়িয়া রাধা উঠানের আগড় খুলিয়া দাদাকে বলে, এসো। তারপর পেটকাপড় হইতে চাবী বাহির করিয়া ঘরের তালা খোলে। তেল-দড়ির আগুনে লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঘর হইতে চটকলের চট আনিয়া দাওয়ার উপর বসিতে দেয় দাদাকে। তারপর একটা চায়ের কাপ লইয়া লণ্ঠনটা দরজার কাছে বসাইয়া রাখিয়া দুয়ারের এক কোণে জলের একটা জালা দেখাইয়া বলে, ঐখানে মগ আছে জালা থেকে জল নিয়ে হাতমুখ ধুও—আমি দোকান থেকে আসি।

রাধা সত্যই বদলাইয়া গিয়াছে। কেন রাধার এমন কি কাজ যে সে মগে করিয়া জল আনিয়া নিরাপদকে দিয়া বলিতে পারিল না—দাদা হাতমুখ ধোও? এমন ত সে আগে করিয়াছে। কে জানে এখানে আসিয়া রাধার কি হইয়াছে!

রাধা চলিয়া গেলে নিরাপদ হাতমুখ ধোয়। তারপর পাতা চটের উপর বসিয়া কত কি ভাবিতে থাকে। আকাশবিস্তৃত রাত্রির অন্ধকার। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ছড়াইয়া আছে দিকে দিকে। আর কোথাও কিছু বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সম্মুখে ওটা কি আকাশে হাত তুলিয়া বিরাট এক কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিরাপদর দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়াছে নাকি? না ওটা চটকলের ধূমনিষ্কাশনের চিমনি, এ রাজ্যের রাজা। বড় বড় গাছ যেমন করিয়া ঝড়ের বেগে মেঘ টানিয়া আনে, ওটা তেমনি টানিয়া আনে মানুষ। ওই রাধাকে টানিয়া আনিয়াছে এখানে!

রাধা দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া দুয়ারের এক-দিকে উনুনটায় আগুন জ্বালে। নিরাপদ পুটুলীটা খুলিয়া কাপড়খানা রাধাকে দেখায়। রাধা কাপড়খানার দিকে তাকায়। দৃষ্টিতে তেমন ঔৎসুক্য নাই। নিরাপদ কাপড় দিবে ভগ্নিকে, আর ভগ্নি তাহার আহ্লাদ করিয়া উৎসাহের সহিত লইবে না ইহা অসহ্য নিরাপদর। তাই সে রাধার মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিবার জন্য বলে, কুড়ি বাইশ টাকা দাম!

রাধা কাপড়খানার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে কি যেন সে ভাবে। রাধা কি ভাবে বহুদিন, বহুযুগ আগে যখন সে স্বামীগৃহে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপে তুলসীতলায় প্রদীপ দিত তখনকার দিনের কথা? সেই মধুময় দিনগুলিতে কি একদিনও তাহার এমনিতরো কাপড়ের লোভ জাগে নাই? সেদিন যদি লোভ হইয়া থাকে আজই বা হইবে না কেন? কে জানে তাহার মনের কথা! সে বলে, বেশ কাপড় ত!

নিরাপদ কাপড়খানার লালটকটকে পাড়ের উপরের জমিটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে ঘষিতে ঘষিতে রাধার দিকে তাকাইয়া বলে, তসরের—

রাধা পুটুলীটার দিকে তাকাইয়া বলে, ওগুলো কি?

বাসন, নিরাপদ বলে।

রাধা যেন খানিকটা উৎসুক হইয়া উঠে। নিরাপদ তাড়াতাড়ি পুঁটলী খুলিয়া তাহাকে দেখায়।

রাধা বলে, অনেক পয়সা খরচ করেচ ত ?

না না কিচ্ছু হয়নি, বলিয়া নিরাপদ সরকার মশাই ও করুণাময়ীর গল্প বলে। তারপর আসে তিনখানা কাপড়ের কথা। এই প্রসঙ্গে সে কাঁদনের কথা বলে, সুশীলার কথা বলে।

রাধা হালুয়া ও চা তৈরী করিয়া দাদাকে খাইতে দেয়। নিরাপদ চায়ে অভ্যস্ত নয়, মাঝে মাঝে সখ করিয়া খাইয়াছে বটে এবং সখ করিয়া চা খাইবার বাসনা তাহার সব সময়ই আছে। চা খাইতে তাহার যেমন লজ্জা করে তেমনই ভয় হয়। লজ্জা করে গরম চা' খাইতে খাইতে তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া যায় বলিয়া, হয়ত লোকে তাহার অনভ্যাসের কথা লইয়া আলোচনা করিবে। ভয় করে জিব্ পুড়িয়া দুই তিনদিন যন্ত্রণা হইবে আর সে খাইতে পারিবে না বলিয়া। নানারূপ কায়দাকরণ করিয়া এক সময়ে সে হালুয়া ও চা' খাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। রাধাও একদিকে খাইতে বসে।

নিরাপদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়া বলে, রাধা তুই ওখান থেকে চ'লে এলি কেন ?

রাধা অর্থশূন্য উদাস দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকায়। নিরাপদ বলে, এখানে এসে তোর সুবিধাটা কি হ'য়েছে ?

রাধা এইবার যেন নিরাপদর কথায় সচকিত হইয়া উঠে। বলে, সুবিধা আর কি !

তবে এলি কেন, বলিয়া নিরাপদ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে রাধার দিকে তাকাইয়া থাকে।

কেন এলুম, রাধা বলে। তারপর সে যেন তাহার এখানে আসার কাহিনীটুকু ভাবিতে থাকে। নিরাপদর জিজ্ঞাসুদৃষ্টির সম্মুখে সে মুখ

তুলিয়া বলে, কি করি সুভদ্রাটা পেছনে লাগল। তারপর দেখলুম, কি শুধু শুধু পরের মুখ চেয়ে দিন কাটাব তারচেয়ে বরং খাটব খাব, তাই চলে এলুম এখানে !

সুভদ্রা খুব গোলমাল করেছিল নাকি, নিরাপদ অনুসন্ধিৎসুভাবে জিজ্ঞাসা করে।

রাধা বলে, না সে আর কি করবে—আমিই চলে এলুম।

সেই লোকটা গেল কোথায়, নিরাপদ প্রশ্ন করে।

রাধা বলে, কে জানে।

তারপর উঠিয়া পড়িয়া সে চায়ের পেয়ালা হালুয়ার বাটী প্রভৃতি তুলিয়া লইয়া ধুইতে বসে। নিরাপদ বিড়ি ধরাইয়া দুয়ারের নীচে নামিয়া উঠানে পায়চারী করিতে থাকে।

রাধা বদলাইয়া গিয়াছে বলিয়া যে মরিয়া গিয়াছে তাহা নহে। তাহার উঠানের একদিকে কয়েকটা গাঁদা গাছের চারা, বেড়ার ধারে ধারে রজনীগন্ধা, সরিসৃপের মত জড়াইয়া জড়াইয়া তরুলতার সরু দেহ বেড়ার উপর গিয়াছে ছাইয়া। নিরাপদ দেখিয়া ভাবে রাধার সখ আছে।

রাধা তসরের কাপড় ও বাসনগুলা তুলিয়া রাখিয়া হাতের চেটোয় খানিকটা খৈনী দলিয়া লইয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। তারপর রন্ধনের সরঞ্জাম বাহির করে।

নিরাপদ হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠে। কে একজন আগড় ঠেলিয়া বুঝি ভিতরে আসিতেছে।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দেয়। নিরাপদ দেখে স্ত্রীলোক, সে সরিয়া দাঁড়ায়। রাধা দুয়ারের উপর হইতে বলিয়া উঠে, কেরে ?

কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীলোকটী নিরাপদর পাশ কাটাইয়া দুয়ারের দিকে আগাইয়া যায়। আলো পড়ে তাহার শরীরের উপর, রাধা চিনিতে

পারে পরক্ষণেই চমকাইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠে, তোর কপালে রক্ত কেনরে গঙ্গা ?

ও রক্ত কেন ঝরিতেছে তাহা কি জানেনা রাধা ? তবু বিস্ময়কর ঐ রক্তক্ষরণ তাই রাধা জিজ্ঞাসা করে।

গঙ্গা আসিয়া ধপ করিয়া দাওয়ায় বসিয়া পড়ে। কপাল দিয়া তাহার দর দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। তাড়াতাড়ি রাধা ছেঁড়া ন্যাক্ড়া আনিয়া জলে ভিজাইয়া রক্তটা মুছাইয়া দিতে যায়। গঙ্গা দুয়ারের উপর শুইয়া পড়িয়া পা' ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে চিৎকার করিতে থাকে।

নিরাপদ বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে দুয়ারের নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকে। রাধা গঙ্গার কপালটা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া মুছাইয়া দিয়া একটুকরা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেয়। গঙ্গা চিৎকার করিতে করিতে বলে, হতচ্ছারা মিনষের কি মায়াদয়া আছে রে ভাই ?

গঙ্গার কপাল দিয়া রক্ত ঝরিতেছে কিন্তু হইয়াছিল কি ? নিরাপদ ভাবে।

রাধা বলে, কি দিয়ে মারলে ?

ওরে ভাই কয়লাভাঙ্গা হাতুড়ীটা ছুঁড়ে ধাই ক'রে মেরে দিলে, বলিয়া গঙ্গা উঠিয়া বসে।

রাধা বলে, তুই কি বলিছিলি ?

আমি আর কি বলবরে ভাই, বলিয়া গঙ্গা আরও জোরে জোরে কাঁদিতে থাকে।

পুনরায় আগরের শব্দ হয়। দুই হাতে দুইটা ছেলেকে ধরিয়া হিড হিড় করিয়া টানিতে টানিতে আসে একজন চোয়াড়ে চেহারার পুরুষ। ছেলেগুলা দিগম্বর অবস্থায় তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। তাদের ঠেলিয়া দিয়া রুক্ষস্বরে লোকটা বলে, এই মাগি তোর কোন বাবা আছে যে ছেলে আগ্লাবে ?

তারপর হাত দুইটা ফাঁক করিয়া লোকটা বাহিরে যাইতে উদ্যত হয়। রাধা বলে, আরে এই দুলো, বউকে এমন ক'রে মেরেছিস্ কেন ?

মারবে না তো কি, মুখ ভ্যাঙ্গচাইয়া দুলো বলে।

মারবে বৈ কি, গঙ্গা চেঁচাইয়া বলে।

দুলো ঝগড়া করিতেই আসিয়াছিল। তাই সে ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার কাছে দাঁড়াইয়া গঙ্গাকে শাসাইয়া বলে, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব পুনরায় যদি কথা কইবি ?

দিবি বৈ কিরে খুনে মিন্‌ষে, গঙ্গা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলে।

দুলো দাঁত মুখ খিঁচাইয়া আসে গঙ্গাকে মারিবার জন্য। রাধা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিয়া উঠে, ছ্যাখ্ দুলো এ তোদের মাগ ভাতারের কুলুক্ষেত্রের জায়গা নয় ?

দুলো থামিয়া যায়। ছেলেগুলা গিয়া তাদের জননীকে ঘিরিয়া বসে। রাধা জিজ্ঞাসা করে, তোদের হ'য়েছে কি বলত ?

গঙ্গা বলে, হবে আর কি যা' রোজ হয়।

যা রোজ হয়, মুখ ভ্যাঙ্গচাইয়া দুলো বলে, তারপর রাধার দিকে তাকাইয়া বলে, জানিস ভাই কারখানা থেকে এলুম তেতে পুড়ে এক গেলাস জল দেবে তাও পারেনা।

হঁ৷ ও জলই চেয়েছিল শুধু, গঙ্গা শ্লেষের সহিত বলে।

তর্জ্জনী নাড়িয়া দুলো বলে, চুপ ক'রে থাক্ বল্‌ছি ?

গঙ্গা দুলোর কথা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য বলে, তুমি জল চেয়েছিলে শুধু ?

চাইনি ! চোখ রাঙাইয়া দুলো বলে।

হ্যা চেয়েছিল, গঙ্গা বলে, মিথ্যুক জিব যে প'সে যাবে ?

দুলো বলে, তারপর শোন্ রাধা ! বল্‌লুম, শুধু জলটা, বাতাসা-টাতাসা দু'খানা নেই ? ঝাঁঝিয়ে উঠে বল্‌লে কি—পাব কোথায় ?

আমি বললুম—এক পয়সার ত আনিয়ে রাখতে পার? অমনি বললে কি—পয়সা আনব কি উপায় ক'রে? বেশ পয়সা কি আমি উপায় করিনা?

গঙ্গা বলে, তারপর কি বলেছিলুম?

তারপর বলবে—জুতিয়ে লবেজান ক'রে দোব যদি কথা কইবি, বলিয়া ভুলো শাসায় গঙ্গাকে। গঙ্গা বলে, শোনরে রাধা, ও হপ্তায় যা হপ্তা পেলে সব মদ তাড়িতে বাবু উড়িয়ে দিলে! সারাটা হপ্তা করি কি বলত?

রাধা গঙ্গাকে বলে, জানিসত সারাদিন খেটে খুটে আসচে, কোন এক পয়সার এনে রেখেছিলি?

আরে শোন শোন, গঙ্গা বলে, এদিকে দোকানে ধার হ'লে বাপান্ত ক'রে মারবে। আর আমিই কি করি বল্‌ত? সারাদিন ছেলেগুলো ছট্‌ফট্‌ করেছে খিদের জ্বালায়—মারধর করে ওদের থামিয়ে রেখেচি। আমারই কি মাথার ঠিক আছে?

কোন লাট সাহেবের চাকরী করতে হয় তোকে যে মাথার ঠিক থাকেনা, বলিয়া ভুলো ফুঁসিতে থাকে। তাহার রাগ এখনও পড়ে নাই।

রাধা বলে, আর তোকেও বলি ভুলো, ঐ রকম করে কি মারতে হয় যদি একটা বে-জায়গাতেই লেগে যেত? মানুষের মরতে কতক্ষণ!

মুস্কিল এই যে ইহাদের বে-জায়গায় লাগেওনা আর মরেও না। রাধা বলে, যা গঙ্গা বাড়ী যা'—গিয়ে রান্নাবান্না ক'রগে। ঝগড়া মারামারি করিস্‌নি!

হ্যাঁ ওর হাতে খাবে—বেজন্মা মেয়েমানুষ কোথাকার, বলিয়া ভুলো হাত দুইটা ফাঁক করিয়া চলিয়া যায়।

গঙ্গা চেঁচাইয়া বলে, দ্যাখ গালাগালি দিওনা বলচি?

আর গালাগালি! গালাগালির কথা উচ্চারণ না করিয়া মনের

অসন্তোষ প্রকাশ করা যায় কি করিয়া? খানিক পরে রাধা গঙ্গাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

নিরাপদ এইবার রাধার দিকে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। রাধা দাদার এই দৃষ্টি যেন বুঝিতে পারে। বলে, সকল ঘরেই এই এক অবস্থা।

নিরাপদকে খাইতে দিয়া রাধাও খাইতে বসে। প্রায় একসঙ্গেই উভয়ের আহার শেষ হইয়া যায়। নিরাপদ হাতমুখ ধুইয়া দুয়ারে বসিয়া বিড়ি ধরায়। রাধা বলে, দাদা শুয়ে পড আবার ভোরে উঠতে হবে আমায়।

হ্যাঁ, নিরাপদ শুইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

ঘরে একটা তক্তপোষের উপর রাধা দাদার বিছানা করিয়া দেয়, নিজের বিছানা করে মেঝের উপর। নিরাপদ ঘরে আসিয়া ঘরটাকে ভাল করিয়া দেখে। ফুলকাটা একটা আয়না দরজার সামনাসামনি দেয়ালে টাঙ্গানো। দুপাশে কতকগুলো বিদেশী দেয়ালপঞ্জীর নগ্ন-স্ত্রীমূর্ত্তি। এই সবের নীচে একটা ছোট চৌকীতে কয়েকটা চায়ের পেয়ালা ও কতকগুলা কৌটা সাজানো। একদিকের দেয়ালে চটকলের কোন মিস্ত্রীর হাতের তৈরী একটা ব্রাকেট টাঙ্গানো। তাহাতে কয়েকখানা কাপড় ও জামা।

নিরাপদ শুইয়া পড়ে। রাধা শুইয়া পড়িয়া আলো নিভাইয়া দেয়।

রাত্রি ধীরে ধীরে গভীর হয়। নিরাপদর নূতন জায়গায় আসিয়াছে বলিয়া ঘুম হয়না। তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু কুলায় তাহাতেই মনে মনে এখানকার সহিত গ্রামের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে থাকে। রাধার আসার কয়েকমুহূর্ত্ত আগে সেই যে লোকটা তাহার ফতুয়া ধরিয়া টান দিয়াছিল তাহার রুক্ষ কর্কশ ব্যবহার, অনাত্মীয়ের মত রাধার সম্ভাষণ, পথে আসিতে আসিতে সেই কচি-কচি ছেলেগুলার বিশ্রী

পরিণতি ডুলো ও গঙ্গার কলহপূর্ণ জীবনযাত্রা—এসব প্রত্যক্ষ করিয়া নিরাপদর মন যেন কি এক যন্ত্রণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে পড়ে গ্রামে অপরিচিত কাহাকেও দেখিলে লোকে জিজ্ঞাসা করে বটে সে কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায় যাইবে কিন্তু এখানকার লোকের মত এমন মেজাজ দেখায়না। আর রাধা? এই রাধাই আগে কি রকম ছিল আর আজ কি হইয়া গিয়াছে। সেদিন রাধা এমন করিয়া তাহার জীবনের সবকিছু হারাইয়া ফেলে নাই! আজ যেন ভক্তি শ্রদ্ধা দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা দেখানোটা তাহার কাছে অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। অথচ এগুলি তো তাহার ছিল একদিন!

এইসব চিন্তা করিতে করিতে এই জায়গার উপর কেমন বিতৃষ্ণা জাগে তাহার মনে, গ্রাম্য শ্রমিকের জীবনধারা হইতে এই বস্তীর শ্রমিকজীবনে যেন একটা পার্থক্য আছে। নিরাপদ সেই পার্থক্যটুকু ডিঙ্গাইয়া কিছুতেই এখানকার জীবনযাত্রার ধারাটুকুকে ভালবাসিতে পারেনা, উপরন্তু অসন্তুষ্ট হইয়াই উঠে।

ধীরে ধীরে কখন তন্দ্রা ঘনাইয়া আসে নিরাপদর চোখে। তারপর গাঢ় ঘুমে যায় অচেতন হইয়া। পথ হাঁটিয়াছে, অনেকদিন পরে রৌদ্রের উত্তাপ লাগিয়াছে, পরিশ্রান্ত দেহটা তাহার বিশ্রাম চায়।

কিন্তু কি একটা চীৎকারে নিরাপদর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ঘুম ভাঙ্গিতেই একটা অস্ফুট গোঙানি শুনিতে পায়। ভীত সন্ত্রস্তচিত্তে উঠিয়া বসে কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না। শুধু একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, লোক রয়েচে যে!

নিরাপদ বালিশের নীচ হইতে দিয়াশলাইটা বাহির করে।

রাধার কণ্ঠস্বর না? নিরাপদ তাড়াতাড়ি দিয়াশলাই জ্বালে। কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত একটা লোক রাধাকে ঘরের দেয়ালের সহিত চাপিয়া ধরিয়াছে। রাধা নিরুপায় হইয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে।

নিরাপদ কাঠিঠা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রগতিতে রাধার দিকে যায়। সেই কৃষ্ণকায় লোকটা বাঘের মত একলাফে আসিয়া তাহার ঘাড়টা চাপিয়া ধরে। লোকটার মুখ হইতে মদের ঝাঁঝালো গন্ধ বাহির হইয়া আসে। নিরাপদ ধস্তাধস্তি করে।

রাধা বলে, দাদা চলে যাওনা ?

লোকটা নিরাপদর ঘাড় ছাড়িয়া দিয়া বলে, ওহে পালোয়ান তোমাকে কেউ মাতব্বরী করতে ডাকেনি, যাও ঘুমোওগে। এক ঠেলা দিয়া নিরাপদকে সে তক্তপোষের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

দাদা তুমি শোও আস্‌ছি, বলিয়া রাধা লোকটার সহিত ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়।

কি যেন হইয়া গেল। নিরাপদ বিস্ময়ে নির্ব্বাক। সে ক্লান্ত, যেন বহু পরিশ্রম করিয়াছে সে। বিছানায় দেহটা বিছাইয়া দেয়, প্রকৃতিস্থ হউক সে।

ভোরে বাজিয়া উঠে কারখানার বাঁশী, ভোঁ ও-ও-ও।

নিরাপদর ঘুম ভাঙিয়া যায়। শুনিতে পায় কাহার হাতমুখ ধোওয়ার শব্দ। দরজা দিয়া বাহির হইতে একটুখানি আলো আসিয়া ঘরে পড়িযাছে। নিরাপদ ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে, মেঝেয় রাধা নাই। রাধারই হাতমুখ ধোওয়ার শব্দ তাহা হইলে! সে উঠিয়া বসে। মনে পড়িয়া যায় রাত্রির বীভৎস ঘটনাটা!

রাধা আলো লইয়া ঘরে আসে।

কারখানার সুদীর্ঘ দমওয়ালা বাঁশীটা তখনও বাজিতে থাকে। নিরাপদ বলে, কাজে যাবি নাকি ?

হ্যাঁ, বলিয়া রাধা আলোটাকে মেঝের উপর বসায় নিরাপদ বলে, আমিও যাব!

এখুনি ? রাধা বলে।

নিরাপদ বলে, হ্যাঁ কাজ আছে।

রাতের ঘটনা তাহাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। এত বীভৎস, এত ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে এখানকার মানুষের জীবনে নিরাপদ ইহা জানিতনা! একতিলও তো আর এখানে থাকিতে পারিবেনা!

সে না রাধাকে ভালবাসে? কই তাহার সে ভালবাসা? যে আবেষ্টনীর মাঝে সে মানুষ, যে মিথ্যামায়ায় তাহাকে পথ চলিতে হয়, তাহার ভগিনীপ্রেম সেখানে একটা আদর্শস্থানীয় বটে কিন্তু তাই বলিয়াই যে নিজের সংস্কারে যাহা বাধিতেছে তাহা কাটাইয়া উঠিয়াও সে ভগিনীকে ভালবাসিতে পারিবে এমন শক্তি নিরাপদর নাই। অন্ততঃ এখন নাই, ভবিষ্যতের কথা কে জানে!

প্রথমতঃ রাধার মন তাহাকে আঘাত দিয়াছে, তারপর এখানকার সমাজ সম্বন্ধে মন তাহার তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর রাত্রির ঘটনায় সে আরও বেশী আঘাত পাইয়াছে এইজন্য যে, রাধা এখানে স্বেচ্ছায় আসিয়া এই সকল অত্যাচারকে বরণ করিয়া লইয়াছে। সে যেদিন পতিতাবৃত্তি করিতে গিয়াছিল তখন তাহার ভিতরে ছিল একটা দারুণ বিক্ষোভ। স্বামীগৃহের অত্যাচারের মধ্যে জীবনকে সে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই এবং সে তাহার দোষও নয়। সুতরাং সে বেশ করিয়াছিল পতিতালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কলের কুলীগিরি করিয়া, কে তাহাকে অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইতে বলিয়াছিল যে সে এখানে আসিয়া এমনি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছে? ইহা তাহার ভাল লাগে? এই ভাল লাগা নিরাপদর অসহ্য। তাই সে এখানে আর থাকিতে চাহে না।

রাধা বলে, বেশ তাহলে আবার এসো!

নিরাপদ ঘাড় নাড়ে।

তারপর দুই ভাই বোনে পথে বাহির হয়। ভোরের আকাশ,

রাত্রির জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে ; পথে পড়িয়াছে তাহার ছায়া। আরও বহু লোক যায়। নিরাপদ তাহার সহিত চলিতে থাকে। পথ যেখানে ভিন্নমুখী হইয়াছে, সেইখানে উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে লয় বিদায়।

নিরাপদ পিছন ফিরিয়া একবার চটকলের উঁচু চিমনীটার দিকে তাকায়। উঃ এখানে মানুষ মানুষের কি করিয়াছে!

আশুবাবুর স্বপ্ন যেমন করিয়াই হউক বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। সেদিক দিয়া তাঁহার অসুবিধা কিছু নাই অদ্বৈত আছে ভয় কি!

কলিকাতা হইতে একজন সুদক্ষ নক্সা-চিত্রণকারীকে আনা হইয়াছে। সে ভদ্রলোক আশুবাবুর সমস্ত জমিদারীর মোটামুটি কয়েকটা নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। উপরের একটা ঘর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। দিনরাত যখন ইচ্ছে তিনি কাজ করিবেন। তাঁহার সহিত ফুরণে চুক্তি হইয়াছে—সমস্ত কাজ করিয়া দিলেই টাকা। সে ভদ্রলোক কেবলই পুরাতন দলিলপত্র দেখিয়া জরীপের কাগজপত্রের হিসাব লইয়া এক একটা বড় বড় মহলের নক্সা প্রস্তুত করিতেছেন।

বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। শরতের শেষ বেলাতে পল্লীপ্রকৃতি যেন অপরূপ সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া উঠিয়াছে। নিবন্ত সূর্য্যের রক্তিম-আলোকে স্বপ্নময়ী প্রকৃতি যেন হাসিতেছে।

আশুবাবু তাঁহার ঘরে বসিয়া জমীদারীসংক্রান্ত কতকগুলি চিঠি লইয়া কি সব দেখিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একখানা খামের উপর পরিচিত হাতের লেখা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া উঠেন। উষার লেখা চিঠি না? তাড়াতাড়ি তিনি চিঠিটা টেবিলের একদিকে সরাইয়া রাখিয়া

কাজের চিঠিগুলা দেখিতে থাকেন! সমস্ত চিঠিগুলা পড়া হইয়া গেলে, তাড়া বাঁধিয়া তিনি টেবিলের ভিতরকার দেরাজে রাখিয়া দেন। তারপর টেবিলের একদিক হইতে সরাইয়া রাখা চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া খামটা ছিঁড়িয়া ফেলেন। উষাই লিখিয়াছে। আশুবাবু বহুদিন পরে কন্যার চিঠি বোধকরি একটু মন দিয়াই পড়িতে থাকেন। উষা লিখিয়াছে—

—আশ্বিন

কলিকাতা

বাবা, এতদিন পরে হঠাৎ যে কেন আপনাকে চিঠি লিখতে বসলাম তার একটা সুন্দর কৈফিয়ৎ আছে। পূজো এসে গেছে, আকাশে-বাতাসে গাছ-পালায়, পাখী পাখালির ডাকে—চারিদিকে পড়ে গেছে পূজোর সাড়া। সর্ব্বত্র একটা পূজো পূজো ভাব, পূজো পূজো গন্ধ। অনেকদিন পর আজ রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতাটা আবার খুলেছি। কিন্তু পড়তে গিয়ে সেই পরিচিত লাইনটাই চোখে পড়ল—'মায়ের গন্ধ আসে যেন পূজোর গন্ধ হয়ে।' কি যেন মনে হল, মায়ের কথা মনে পড়ল। জানিনা চোখের কোণ অলক্ষ্যে কখন ভ'রে উঠেছিল জলে, টস্ টস্ ক'রে ফোঁটাকয়েক ঝরে পড়ল বইয়ের পাতায়। পদ্মের মত চোখের জল সারা কাগজের ওপর যেন নীল হয়ে এল। ভাবলাম এ বুঝি ব্যথার নীলোৎপল! এরই ভেতর লুকিয়ে আছে বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘযুগের হাহাকার। এই কথাটাই মনে হল বলে বসলাম চিঠি লিখ্তে, তা না হ'লে এতদিন পর যখন চিঠি না লেখার কষ্ট সহ্য করতে পেরে গিয়েছি তখন কোন প্রয়োজনই ছিল না এর।

বাবা, আমি এ যুগের কোলে লালিত হ'য়েছি। এ বড় ভয়ঙ্কর যুগ। দিশেহারা মানুষ অন্ধকার প্রান্তরে পথ হারিয়ে ফেলেছে, এসে দাঁড়িয়েছে ধ্বংসের প্রান্তদেশে। মনে হয় সৃষ্টি যেন রসাতলে যাবে। একদিকে মানুষের অকুণ্ঠ প্রতারণা, আরেকদিকে মানুষের বিশ্বজোড়া বেদনা—

দু'য়ে মিলে জগতের আকাশ-বাতাসকে আবিল করে তুলেছে আজ। সেই আবিলতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে যখন তাকাই তখন দেখতে পাই, আমি সব পেয়েছি পাইনি কেবল বিশ্বের বেদনাহত মানুষের সাথে হাত ধরাধরি করে চলবার শক্তি, তাদের যাত্রাপথের সঙ্গীতের সাথে কণ্ঠ মিলাবার অনুভূতি! আমার জীবনে ভোগবিলাস, স্বাচ্ছন্দ আর প্রাচুর্য্যের কোন অভাব ঘটে নি। জীবনের পানপাত্র আমার ভরে উঠেছে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে। আকাশ আমার কাছে টুকরো হয়ে দেখা দেয়নি, উদারবিস্তৃতি তার দিবারাত্রির রঙ্গের খেলা নিয়ে আমার সামনে দেখা দিয়েছে; নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসেনি, প্রচুর স্নিগ্ধবাতাস ক্ষণে ক্ষণে আমাকে গেছে সঞ্জীবিত করে। আমার জগত নিখিলের বেদনার্ত্ত মানুষের কাছে স্বপ্নের নন্দন-কানন! অথচ আমি তা' পেয়েছিলাম। আর এইটুকু পাওয়ার জন্যই সকল দিক দিয়ে আমার ঘটেছে ব্যর্থতা। তাই আজ জীবনের ব্যর্থতার সাগরতটে দাঁড়িয়ে সম্মুখে প্রসারিত বেদনার লবণাম্বুধির বুকে যে তরঙ্গ উঠতে দেখি তার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি না, পা বেঁধে যায় চোরাবালির চরে। ভয়ে ভয়ে আমায় ফিরে আসতে হয়।

বলতে গেলে সহরেই আমি মানুষ। এইখানেই আমার সত্যিকারের চোখ খুলেছে। মানুষের জীবন এখানে জটিল। গ্রামের মত কাঙালপণা এখানে নেই, এখানে আছে অসহিষ্ণুতা, রুক্ষতা, জীবনভরাতিক্ততা! উর্দ্ধায়িত উষ্ণনিশ্বাসের বাষ্প-বারিতে এখানকার আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত। অতি সহজ ভাবেই এটা উপলব্ধি করা যায়। আমিও তাই পেরেছি আর পেরেছি বলেই এতকথা লিখছি। সেই সঙ্গে আমায় একথাও বলতে হবে, উপলব্ধি করতে পেরেই বা আমি কি করব? তবু আমি এই দৃষ্টি নিয়ে সব কিছু দেখ্‌বার চেষ্টা করেছি।

সহর ছেড়ে যেদিন গ্রামে গেলাম মনে সেদিন অনেক আশা ছিল যে

সহর-সভ্যতার কোলাহলমুখর কর্ম্মব্যস্ত জীবনের থেকে কিছুদিন অন্ততঃ বিশ্রাম পাব। আর সেই বিশ্রামের মধ্যে জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করবার কোন সুযোগ পাইনি, তা সঞ্চয় করে নেব। শুধু কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই গিয়েছিলাম? না, যাক সে কথা। প্রথম দর্শনেই পল্লী-গ্রামকে আমি ভালবেসেছিলাম। বিস্তীর্ণ মাঠের পরে নীল বনরেখার ওপর প্রভাতের সূর্য্যোদয় আমাকে আকুল করে তুলত, নিস্তব্ধ দুপুর তার উদাসরুক্ষ রূপ দেখিয়ে আমার মন ভুলাতো, অস্ত সূর্য্যের রক্ত কিরণ আমার মনে কি যেন এক রঙের খেলা লাগিয়ে দিত, নিঃসীম নীলিমার নিথর নীলসন্ধ্যা কাজল-রেখা টেনে দিত আমার চোখে, আমি অবাক হয়ে যেতাম। সেদিন আমাকে ভাব্‌তে হয়েছে, কেন এতদিন ভুল ক'রে বসেছিলাম ইটপাথরের পাষাণকায় সহরে? পৃথিবীতে এসেছি, দেখবনা পৃথিবীর এই শ্যামস্নিগ্ধ মনোমুগ্ধকররূপ? কেমন লাগে এর আকাশ-বাতাস, ফসলভরা সবুজ মাঠ, বেতসবনের ছায়ায় ঘেরা পথ আর দিগন্তহীন ধূ ধূ করা প্রান্তর? মন সায় দিয়ে উঠল। অরণ্যের নিবিড় সবুজের কোলে কেটেছিল আমার শৈশব, সেই শৈশব-স্মৃতি নতুন করে ভবিষ্য জীবনের পাথেয় গীতিকা রচনা করতে লেগে গেল। জীবনের পথে সে আমায় চির শিশু করেই রাখতে চাইল। বাস্তবিক পৃথিবীর বুকে নবাগত শিশুর চোখ আর তার অনুভূতি দিয়েই আমি সেদিন পাড়াগাঁকে দেখলাম, বুঝলাম।

শিশু যেমন পৃথিবীর কোলে দিনে দিনে বড় হয়, আমার মনের শিশুও একদিন পাড়াগাঁয়ের কোলে তেমনি করে বেড়ে উঠল। শিশু যেমন তার স্বচ্ছ চোখ দিয়ে পৃথিবীর নিত্যনূতন রূপ দেখে বিস্মিত হয় আমিও তেমনি বিস্মিত হয়েছি পাড়াগাঁকে দেখে। এর বিস্তৃত উদার আকাশের নীচে স্নিগ্ধ কোমল শস্যশ্যামল পল্লীগ্রাম, একে আমার মনে হয়েচে যেন কোন স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা কি একটা রহস্যময় ব্যাপার।

কিন্তু এই রহস্যের যবনিকা একদিন আমার চোখের সামনে থেকে উঠে গেল, বিস্ময় গেল কেটে। মায়ের কোল থেকে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে শিশু ভাবে কি এক অফুরন্ত রহস্যের উৎসটাকে সে বুকের মধ্যে আকড়িয়ে ধরতে চাইছে, অথচ সেটা ধরা দিচ্ছে না! এ ধরা যে সে দেয় না আর ওটা যে রহস্যেরও উৎস নয় এটুকু জানবার মত বয়স যখন শিশুর হয় তখন কি আর সেখানে বিস্ময় বলে কিছু থাকে? ঠিক তেমনি ভাবেই গেছে আমার সে বিস্ময়ের ভাব। আমি জেনেছি পল্লীগ্রামে রহস্যময় কিছু নেই, সবই উন্মুক্ত, কেবল আমাদের অজ্ঞতা এ সম্বন্ধে জন্মগত বলেই আমরা আজও রহস্যময় করে দেখি।

যাক্ সেকথা। দূর থেকে ভাবপ্রবণ লেখকদের উপন্যাস প'ড়ে আর গ্রাম সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তি শুনে শুনে আগে থেকেই আমার কেমন একটা ধারণা হয়েছিল। এই ধারণা নিয়েই প্রথম দিকে আমি গ্রামের সব কিছুকে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। তারপর অবিশ্যি এ ধারণা আমার কেটে যেত শীগ্‌গির কিন্তু যায়নি শুধু আপনাদের জন্যে। তখনও আমি পল্লীগ্রামের সাথে ভাল করে পরিচিত হতে পারিনি। তখনও আপনাদের দৃষ্টি দিয়ে আমায় পল্লীগ্রামকে দেখতে হ'ত। অথচ কি আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়েই না আমি গ্রামে গিয়েছিলাম। আজ দুঃখ হয় সজাগ দৃষ্টি আর সজাগ মন না নিয়ে কেন আমি গ্রামে গিয়েছিলাম। অন্যের চোখের ছায়ায় কোন বস্তুকে দেখার মধ্যে সার্থকতা কোথায়? আয়নায় প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের মধ্যে খাঁটী কিছু আছে কি?

মনে পণ ছিল আর কিছু না হোক পল্লীজীবনে অভ্যস্ত হয়ে নির্ব্বিবাদে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দেবো, ভালবাসব পল্লীর মাটীকে, ভালবাসব তার লক্ষ্মীশ্রীকে, তাহলেই আমার যথেষ্ট হবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল আমার স্বপ্ন ও আমি বুঝতে পারলাম যে-স্বপ্ন আমি গ্রামে আসবার আগে দেখেছিলাম তা অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত। কাজে

কাজেই একটা আফশোষ আমার মনে জেগে উঠল। এই অবস্থায় আপনারা কিন্তু আমার মনের ভাবটুকু লক্ষ্য করতে ভোলেন নি, কেবলই আপনাদের পল্লীগ্রামকে আমার চোখের সামনে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কেন তা' ক'রেছিলেন তা' আমার অজানা নেই।

আজ একথা আমি অস্বীকার করব না যে আপনাদের দৃষ্টি দিয়ে পল্লীগ্রামকে দেখতে গিয়েই আমি সত্যিকারের পল্লীগ্রামের সন্ধান পেয়েছি। সহরে মানুষেব কর্ম্মচঞ্চল রূপ দেখে দেখে আমার মন বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল তাই বিশ্রাম করতে আবার পাড়াগাঁয়ে আমার যাওয়া কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনাদের মাঝে প'ড়ে আমি যা দেখলাম তা' হচ্ছে আপনাদের ধনলিপ্সা, আপনাদের সম্পত্তি অর্জ্জনের তীব্র ক্ষুধা। সহরে এ নোংরামি চোখে পড়ে, অতি তীব্রভাবেই চোখে পড়ে কিন্তু সহরের সবটুকুই তা নয়—এখানে আছে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার একটা দুর্নিবার বাসনা আর এইটাই সহরের প্রাণ। পাড়াগাঁয়ে এ জিনিষ নেই কেননা সেখানে আছে অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টের সিংহাসনে বসে আপনারা সমস্ত পল্লীবাসীদের করেন শাসন আর শোষণ। আপনাদের সাথে মিশে আমাকেও এসব করতে হয়েছে। কিন্তু সেই পথেই গ্রাম-বাসীদের যে অদৃষ্ট-প্রসূত হাহাকার তা' আমার চোখে পড়ে। তাইতেই আমার চোখ খুলে যায়। এবং যেদিন এটা ঘটল সেই দিনই আমায় নিতে হল গ্রাম থেকে বিদায়। এ বিদায় কেন নিলাম জানেন, সম্পত্তি আপনাদের চোখে এতবড় যে তার কাছে স্নেহ-দয়া-মায়া-মনুষ্যত্ব অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে বলে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ—আমাকে আপনি ত্যাগ করতে পেরেছেন কিন্তু সম্পত্তিকে পারেন নি। অনর্থক নিজের মনকে আমি তিক্ততায় ভরিয়ে তুলতে চাইনা। আজ আমি সহরে বসে আছি কিন্তু কেবলই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে পল্লীগ্রামের সেই রোগজীর্ণ অসহায় মানুষগুলার মূর্ত্তি। আমার দুঃখ হয় আমি ধনীর

ঘরে জন্মেছি ব'লে। আমার জীবনযাত্রার সবটুকু জুড়ে এমন একটা আভিজাত্য শিকড় বিস্তার করেছে যে আজ আমি ঐ অসহায় পল্লীবাসীদের ভাল করতে পারিনা, ইচ্ছে থাকলেও কাজে পরিণত করতে পারিনা। আজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে সেখানকার মানুষের ভাল করতে গেলে তারা আমায় অবিশ্বাস করবে। যেন বহুদিন আগে বসন্তরোগ আমাকে ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করেছিল, আজ অবশ্য সে রোগ নেই, আমি মুক্তি পেয়েছি তার হাত থেকে কিন্তু তবু যেন এখনও কি ঘটতে বাকী রয়েছে বলে মনে হয়। রোগ সেরেছে বটে কিন্তু বসন্তের দাগ মিলায়নি। ঐশ্বর্য্যের আভিজাত্যের মাঝে আমি মানুষ, তার চিহ্ন রয়েছে সর্ব্বদেহে। বসন্ত রোগের মত আমার মুখের উপর আভিজাত্যের দাগ দেখে তারা আমায় সহজেই চিনতে পারবে, আমি তাদের নই, তারা দূরে সরে যাবে।

অথচ এটা যে ভয়ঙ্কর যুগ একথা আমি ভুলতে পারিনা। মানব-সভ্যতার এ যে এক ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন তা যেন প্রতিনিয়তই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছি। এই যুগে আমরা যারা নিজেদেরকে শিক্ষিত শিক্ষিতা বলে ভেবে থাকি তাদের ত নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না। তাই কেবলই মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, কিছু করতেই হবে, তা না হলে সংসারের সমস্ত যাত্রা-পথটা ফাঁকি দিয়েই সারা হবে। অন্যের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখা যায় কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে আড়াল করে রাখব কি করে? এ সততাটুকু যদি না থাকে তাহলে আমাদের মানুষ হয়ে না জন্মানোই উচিত ছিল! তাই চুপ করে থাকতে পারিনে। উন্মাদ কল্পনা আমাকে বিপর্য্যস্ত করে দেয় কিন্তু কি করব অধীর আগ্রহে শুধু নিজের হাতই কামড়ে মরি!

তবুও আমাদের যেতে হবে তাদের মাঝে। জীবনের সমস্ত কিছু অতীতকে মুছে ফেলে, সব কিছু ঔদ্ধত্য, আভিজাত্য জলাঞ্জলি দিয়ে,

তাদের সাথে মিশে যেতে হবে। আপনারা যেভাবে গ্রামে গেছেন সে ভাবে নয়। পল্লীগ্রামে ফিরে যাওয়া আপনাদের ধন-আহরণের চেষ্টায়। গ্রামের মঙ্গল যতখানি হোক বা না হোক আপনাদের মঙ্গল হলেই হ'ল। আজকে খবরের কাগজ খুললেই, কোন একখানা নভেল উপন্যাস পড়্তে গেলেই, শিক্ষিত লোকদের গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত—এই কথাটাই নানাযুক্তি তর্ক ভাবপ্রবণতার আড়াল থেকে উঁকি দেয়। কিন্তু শিক্ষিত লোকদের ত এমন করে গেলে চলবে না; এতে যে ধ্বংসোন্মুখ পল্লীকে আরও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হবে। তাই আমি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র জেনেও, নিজের অক্ষমতার কথা বুঝতে পেরেও আজ চঞ্চল হ'য়ে পড়ি কেমন করে পল্লীগ্রামে যাব, কেমন করে কাজ সুরু করে দেব কিন্তু আধুনিক সভ্যতা যে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের চলার পথে এমন কণ্টক বিস্তার করে রেখে দেবে এটা কে জানত! আজ তাই নিজেকে নিজেই অভিশাপ দিয়ে মনের জ্বালা মিটাই।

বাবা, চিঠিটা প'ড়ে হয়ত আপনি ভাব্বেন, মেয়ে কাব্য করছে। যদিও আমি কাব্য করতে বসি নি, তবুও ব'লে রাখি জীবনে যারা দুঃখ পেয়েছে তারাই পারে এমনিতরো করে বলতে, এর ভাষা কাব্য নয়, রূঢ় গদ্য। এরপর আপনাদের কুশল সংবাদ পেলে সুখী হব। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন, ইতি—আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিনী আপনার—উষা।

চিঠিটা পড়া হইয়া গেলে আশুবাবু মনে মনে একটু হাসেন বোধ হয়। ভাবেন চিঠিটা অদ্বৈতকে পড়াইবেন, তাই টেবিলের দেরাজ খুলিয়া চিঠিটা রাখিতে যান আবার কি মনে হয়, দেরাজটা ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া দেন। না, অদ্বৈতকে পড়ানো ঠিক হইবে না। তিনি নিজেই একদিন অদ্বৈত ও উষার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কাজেই চিঠি পড়িয়া অদ্বৈতর মনে যদি সেরকম কিছু উদয় হয় তাহা হইলে সমূহ ক্ষতি হইবে। গল্পে উপন্যাসে এরকম ত অনেক আছে শোনা যায়, ভালবাসার

কাছে ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সব তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে! এ চিঠি পড়িয়া যদি উষার কথা তাহার মনে হয় আর তাহার জন্য যদি সব কিছু অদ্বৈতর কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়! তার চেয়ে চিঠিটা অদ্বৈতকে না দেখানোই ভাল।

এমন সময় কাহার যেন পায়ের শব্দে তিনি চমকাইয়া উঠেন। তাড়াতাড়ি চিঠিটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া টেবিলের নিচে নষ্ট কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেন।

অদ্বৈত প্রবেশ করে।

আশুবাবু তাহার দিকে তাকাইয়া বলেন, কি খবর অদ্বৈত?

অদ্বৈতর হাতে একখানা কাগজ। সেটা দেখাইয়া সে বলে, আজ সমস্ত রতনপুর আমাদের করতলগত হ'ল।

বল কি অদ্বৈত, টেবিলে হাত ঠুকিয়া আশু বাবু বলিয়া উঠেন।

অদ্বৈত বাঁ'হাতে কাগজখানা ধরিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া দেখাইয়া বলে, এই দেখুন সব জমিদারের সই—দক্ষিণ পাড়ার সব জমিদারই সই ক'রেছে।

এতদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে এক দক্ষিণপাড়া ছাড়া সমস্ত রতনপুরটাই আশুবাবুর হস্তগত হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, দক্ষিণ পাড়াটায় কোন অধিকার না থাকায় অন্তরে তিনি একটা খোঁচা অনুভব করিতেন। অনেকদিন ধরিয়া অবশ্য জল্পনা কল্পনা চলিতেছে কি করিয়া দক্ষিণপাড়া করতলগত করা যায়। আজ অদ্বৈত তাহা করিতে পারিয়াছে দেখিয়া আশু বাবু অত্যধিক আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। তাড়াতাড়ি অদ্বৈতর হাতের কাগজখানার দিকে তাকাইয়া দেখেন, একে একে দক্ষিণ পাড়ার সব জমিদারগুলিই কাগজে দস্তখত করিয়াছে। রায়েরা, বর্ম্মণেরা, সিংহিরা, বেরারা, মল্লিকরা কেহই বাদ যায় নাই। আশু বাবু অদ্বৈতের মুখের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখেন।

তারপর বলেন, এক্সপেরিমেণ্ট সাক্‌সেসফুল। অদ্বৈত কাগজখানাকে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলে, যতদিন আমার মাথাটুকু থাকবে ততদিন আমি কাউকে ভয় করিনা, কোন কিছুই আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। যদি আমি বিদেশে জন্মাতাম, মুসোলিনি কিম্বা হিটলার হ'তে পারতাম। অমন কত আবিসিনিয়া কত রাইনের উপর দিয়ে আমার বিজয় রথ চ'লে যেত! তারপর বোধ হয় সে আত্মপ্রসাদের অহঙ্কারেই একটু হাসে।

আশু বাবু অদ্বৈতর মুখের দিকে তাকাইয়া একটা প্রতিভারই ছাপ দেখিতে পান। কি সুন্দর ঐ আর্য্য-আর্য্য প্রশস্ত ললাট, চোখ দুইটা হইতে বিচ্ছুরিত একটা তীব্র দীপ্তি, ছুঁচোলা নাসিকার তীক্ষ্ণতা! পাশের চেয়ারখানা দেখাইয়া আশু বাবু অদ্বৈতকে বসিতে ইঙ্গিত করেন। তারপর বলেন, অদ্বৈত এইবার বলত কেমন ক'রে এসব করলে? সেদিন বলেছিলে এটা এক্সপেরিমেণ্টাল!

অদ্বৈত চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া অল্প একটু হাসে এবং বলে, ব্যাপারটা আর অমন কিছুই নয়, যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে· সেই বলবানের বিক্রম ও মস্তিষ্ক-প্রসূত বুদ্ধিরই সদম্ভ প্রকাশ। অদ্বৈতর দক্ষিণপাড়া করতলগত করার সম্বন্ধে যে একটা বিশেষ মতলব ছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বাগ্দী পাড়ার সেই দশধারার মামলায় জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ আসামীদিগের সাহায্যে দক্ষিণপাড়ার সমস্ত কলাবাগান গুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। রাতারাতি, সমস্ত কলাগাছগুলিকে কাটিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। সমস্ত গ্রামময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কে এমন করিয়া সমস্ত কলাগাছ কাটিয়া নিল? চৌকীদার আসে, পুলিশ আসে, কে এমন করিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া চারিদিকে নানারকম আলোচনা হইতে থাকে। কেহ কেহ এমনও অভিমত প্রকাশ করে যে সে সবই জানে কেবল শত্রু

বাড়াইয়া লাভ নাই বলিয়া বলেনা। তারপর আরও পাঁচটা ব্যাপার যেমন চাপা পড়িয়া যায়, কলাবাগান নষ্ট করার ব্যাপারটীও তেমনি চাপা পড়িয়া যায়।

অদ্বৈত টেবিলের উপর দক্ষিণপাড়ার জমিদারদের দস্তখত করা কাগজখানা দেখাইয়া বলে, আমার পরিচিত যে-সব লোক ছিল এদের সেরেস্তায় তাদের ব'লে দিলাম যেন তারা সবাই জমি বিক্রি করার কথা তাদের মনিবকে বলে। ও-দিকে তারা বলতে লাগল আর এ দিকে আমি লোক মারফৎ খবর পাঠাতে লাগলাম—যে ছোট লোকের জায়গা! ও জমি রাখতে পারবেননা আপনারা, মিছি মিছি লোকসানই দেবেন! তা ছাড়া আমরা গ্রামে থাকি, আমরা যতখানি ছোট লোকদের সায়েস্তা ক'রে রাখতে পারব আপনারা তা সহরে থেকে পারবেননা—জমিটা আমাদেরই ছেড়ে দিন তার চেয়ে। প্রত্যেক জমিদারকে আলাদা আলাদা খবর পাঠালাম, সকলেই রাজী হ'ল। আজ সকালে তাদের সবাইকে মিলিয়ে এই কাগজখানায় সই করিয়ে নিলাম এই ব'লে যে, আমার মনিব হয়ত টাকাটা দিতে চাইবেন না, সেই জন্যে আপনারা সবাই মিলে একটা লিখে দিন, তাঁর বিশ্বাস হবে। আর কাল টাকাটা নিয়ে গিয়ে একেবারে আদালতে রেজেষ্ট্রী ক'রে নেব। সবাই-ই সই ক'রে দিলে।

আশুবাবু উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, অদ্বৈত, তুমি গত জন্মে নিশ্চয়ই আমার ছেলে ছিলে!

অদ্বৈত বিনয় প্রকাশ করিয়া বলে, আশীর্ব্বাদ করুন যেন সত্যি সত্যি আপনার ছেলের মত হতে পারি। তারপর সে আশুবাবুর পদধূলি লইতে যায়।

আশুবাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠেন, অদ্বৈত আমার একটীমাত্র মেয়ে, সে মানুষ হ'লনা! তুমিই আমার ভরসা—

অদ্বৈত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে!

আশুবাবু নীরবে ঘরের জানালা দিয়া দূর-মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া যেন কি ভাবেন।

শরতের শস্যভরা সবুজ মাঠ। গোধূলি বেলার ধূসর দীপ্তিতে কি যেন ছায়া পড়িয়াছে সে মাঠে। ঐশ্বর্য্যশালিনী ঐ যে মাঠ, উহা কাহার জন্য এবং কিসের জন্য?

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি যদি মানবী হইতে ত এ যুগে ধনলোভীদের কাছে তোমাকে রক্ষিতা হইয়া থাকিতে হইত!

আশুবাবু বলেন, চল অদ্বৈত ওঘরে যাই—নক্সাগুলো কতদূর এগুলো দেখিগে।

নক্সাকারী ভদ্রলোক কাগজপত্র গুছাইয়া উঠিবার উদ্যোগ করেন। বেলা পড়িয়া যাইতেছে, সূক্ষ্ম কাজ, দিবালোক ছাড়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

আশুবাবু ও অদ্বৈতকে ঘরে আসিতে দেখিয়া ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়ান। বলেন, আজ আমি পাততাড়ি তুললাম, এখন আর কাজ চলবেনা।

আশুবাবু বলেন, বেশ—কতদূর এগুলো?

টেবিলের একদিকে কয়েকখানা কাগজ দেখাইয়া ভদ্রলোক বলেন, ঐ যে ক'খানা হয়েচে।

আশুবাবু কাগজগুলা তুলিয়া লইয়া জানালার ধারে যান। এক একখানা করিয়া কাগজ তুলিয়া তুলিয়া দেখেন। হঠাৎ একখানা কাগজ সমস্ত কাগজগুলার উপরে লইয়া আশুবাবু বলেন, অদ্বৈত ছ্যাখো?

অদ্বৈত আশুবাবুর দিকে সরিয়া যায়। আশুবাবু আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলেন, এই যে পূর্ব্বদিকে রেললাইন দক্ষিণে পশ্চিমে রেললাইন আর সোজা উত্তরে চ'লে গেছে জমি, এটা কত বলতে পার?

অদ্বৈত আশুবাবুর আরও কাছ ঘেঁসিয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখে।

আশুবাবু বলেন, অদ্বৈত এই জমিটার ওপর আমার মায়া প'ড়ে গেছে।

অদ্বৈত বলে, এ তো আমাদের নয়!

তা' আমি জানি, আশুবাবু বলেন, এই বিস্তীর্ণ জমিদারী যদি আমার হ'ত অদ্বৈত তাহলে আমি অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে তাদের জমিদারী কেড়ে নিতাম।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ এমনি!

অদ্বৈত হাসিয়া উঠে।

আশুবাবু বলেন, এই বিশাল জমিদারী কার অধিকারে আছে জান?

অদ্বৈত জিজ্ঞাসুভাবে আশুবাবুর দিকে তাকায়। আশুবাবু বলেন, একজন নাবালকের সম্পত্তি এ—এখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসে।

তাই নাকি, অদ্বৈত বলে।

হ্যাঁ, আশুবাবু বলেন, আমি এর একটা নক্সা করিয়ে রাখছি। মনে আশা আছে একদিন এর প্রতিটী ইঞ্চিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করব। নাবালকত্বের বিরুদ্ধে সাবালকত্ব প্রমাণ করবার জন্য এই জমির অধিকারীদের দিযে মামলা করাব। তারপর তাদের হাতে সবকিছু এলে দেখা যাবে একবার।

অদ্বৈত বলে, তখন ত একেবারে সোজা হ'য়ে যাবে।

আশুবাবু বলেন, অদ্বৈত, টাকা তোল যেমন ক'রে পার। এখন প্রচুর টাকার প্রয়োজন। আমার স্বপ্নকে আমি সার্থক ক'রে তুলবই।

অদ্বৈত বলে, এবার তা'হলে একপয়সাও খাজানা বাকী রাখলে চল্‌বেনা।

হ্যাঁ, আশুবাবু বলেন, যে খাজানা না দেবে তার ধান আটকাও—পয়সা আমার চাই, পয়সার অনেক দরকার।

অদ্বৈত বলে, খাজনা কোথাও বাকী রাখবনা তবে যা' অবস্থা তাতে কদ্দূর কি হয় বলা যায় না।

কোন কথা শুনবেনা, আশুবাবু বলেন পাষাণ হতে হবে তবেই উন্নতি তা না হ'লে নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার যেন সারা পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চায় তখন। ধীরে ধীরে তাহার ভয়াল বিস্তৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঘরেও পৌঁছায় তাহার ছায়া। অন্তরের উগ্রবাসনা ব্যক্ত করিতে করিতে আশুবাবু অদ্বৈতর সাথে বাহিরে চলিয়া যান।

দেখিতে দেখিতে পূজা চলিয়া যায়।

একদিন গ্রামে পূজার উৎসব হইত বটে। আজ আর সেদিন নাই, পূজাও তেমন হয়না। দু'একঘর বাড়ীতে প্রতিমা আসে, তাহাতেই গ্রামের লোক বারটা দিন আনন্দ করিয়া লয়। এ আনন্দও যেন আজকাল যন্ত্রণার আনন্দ হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েরা কাঁদে নূতন জামাকাপড় পায় না বলিয়া। ভাল কাপড় পরিয়া লোকের সাথে মিলিয়া-মিশিয়া ঠাকুর দেখিতে যাইতে পারেনা বলিয়া স্ত্রী স্বামীর সাথে ঝগড়া করে। বেচারা স্বামীই বা কি করিবে? হিসাব লইয়া এসো, সারাবছর হয়ত বেচারা স্বামী হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়াও এক পয়সা সঞ্চয় করিতে পারে নাই। খাইতেই পায়না তা' সঞ্চয় করিবে কি?

সুবিধা হইয়াছিল কাঁদনের। তবু যাহা হউক নিরাপদ অমরপুর হইতে তসরের কাপড়খানা আনিয়াছিল বলিয়া সে পরিয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু লোকে তাহাকে উপহাস করিয়াছে বড়। ও কাপড় নাকি পূজারিণীদেরই পরা সাজে। এমনি সাধারণভাবে ঠাকুর দেখিতে গেলে কেহ তসরের কাপড় পরেনা।

যাহাদের পয়সা আছে তাহারা কত রকমের সাজ পোষাক করিয়াছিল, কাঁদন তাহাদের সাজসজ্জা দেখিয়া মনে মনে আশা করিয়াছিল, হে ভগবান তাহাদের যেন একদিন পয়সা হয় আর অমনিতরো করিয়া সে সাজ-পোষাক করিতে পারে। মেয়েদের সাজ-পোষাকের দিকে কেমন একটা বিশেষ টান আছে বলিয়া কাঁদনের এই আকাঙ্ক্ষাকে হয়ত কেহ উড়াইয়া দিবে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিও, সেও মানুষ, আরও পাঁচজনার মত তাহারও সাধ-আহ্লাদ আছে। কাঁদনের জন্য দুঃখ হয় নিরাপদর। কাঁদন যখন ঠাকুর দেখিয়া আসিয়া নানারকম গল্প করিয়াছিল তখন নিরাপদ বলিয়াছিল যে সে যাহোক একটা কাজ জুটাইয়া লইতে পারিলেই কাঁদনকে বেশ ভাল দেখিয়া একজোড়া কাপড় কিনিয়া দিবে।

আর কাঁদন নিরাপদকে ইহার উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিল, তাহলে বৈঁচিপুতার মিহিলাল মাঝির মেয়েকে কাপড় দেবে কে ?

নিরাপদ বলিয়াছিল, তুমি !

কাঁদন তামাসা করিয়া বলিয়াছিল, বিয়ে ক'রব কি আমি ?

বিয়ে ! নিরাপদ বেশ একটু গাম্ভীর্য্যের সহিতই মনের ভাবটুকুকে ব্যক্ত করিয়াছিল, কাজ মিললে হয় আগে তারপর মিহিলাল মাঝির মেয়ে কেন, অমন কত মেয়ে বে করা যাবে !

হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই ছ্যাখ—বিয়ে থা দিয়ে তোমায় সংসারী করি, কাঁদনও গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিয়াছিল।

কিন্তু মজা এমনি, কোন কাজই নিরাপদ পায় নাই। আর কাঁদনকে নিরাপদর কাপড় দেওয়া এবং নিরাপদকে কাঁদনের বিবাহ দেওয়া উভয়ের কাহারও আশা সফল হয় নাই। কার্ত্তিক গিয়াছে, অগ্রহায়ণ গিয়াছে, পৌষও যায় যায় নিরাপদ বেকার বসিয়া আছে।

এদিকে বনমালীর দিন আর চলেনা। তাহার মজুরী কমিয়া গিয়াছে। আজকাল আর ইচ্ছা করিলেই অন্য কাহারও কলাবাগানে

কাজ করিতে পারা যাইবেনা কারণ রতনপুরে এক আশুবাবুর কলাবাগান ছাড়া আর কাহারও বাগান নাই। কাজে কাজেই মজুরী বাড়ানোর জন্য যে চট করিয়া কেহ অন্য কোথাও কাজে লাগিবে সে উপায় নাই। তাই আশুবাবু আপন খেয়ালমত তাঁহার কলাবাগানের সমস্ত কৃষাণদের মজুরী কমাইয়া ছ'টাকা করিয়া দিয়াছেন। ছ'টাকায় তিনটা মানুষের কি একমাস খাওয়া পরা চলে?

চলেনা বলিয়াই ত কাজ বাড়িয়া গিয়াছে কাঁদনের আর কাঁদনের মত গাঁয়ের আর-আর বৌয়েদের। সারাদিন ধরিয়া এ পুকুর সে পুকুর হইতে গুগ্‌লি ঝিনুক, ছোট ছোট চাঁদা, বাটা মাছ ছাঁকনি জাল দিয়া ধরিয়া আনে। যে পুকুরে হিংচা কলমী শুষ্‌নি শাক জন্মায় সে সকল পুকুর হইতে ওসবও তুলিয়া আনে। শাকান্নে করে জীবিকা নির্ব্বাহ।

এতদিন যাহারা বাড়ীর বাহিরে আসিত না আজ তাহাদের জীবন-সংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য আসিতেই হয়।

সেদিন গ্রামের পূবদিকে জলাভূমির মাঝে একটা ডোবায় কাঁদন, কালীর বউ, দুর্গা, দুর্গার মা, কৈবর্ত্ত পাড়ার আরও কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে মাছ ধরিতে আসিয়াছিল। নিরাপদ বেকার বলিয়া উহাদের সাথে সেও আসিয়াছিল। পরণের আট হাতি মলিন কাপড়টা সে মাথায় পাক বাঁধিয়া, একখানা গামছা পরিয়া, ছাঁকনি জাল লইয়া ডোবাটার একদিকে ছাঁক্‌না দিতে সুরু করিয়া দেয়। শীতের বেলা, কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন নিভিয়া যাইবে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশের ম্লান আভার করুণ দীপ্তিতে চারিদিক গিয়াছে ছাইয়া ডোবার জল যেন ঠাণ্ডা বরফ, তবু তাহারই মাঝে ছোট ছোট ছেলেগুলা ধুপ ধাপ্‌ করিয়া পা ছুঁড়িয়া সাঁতার কাটিতে থাকে। মেয়েরা কদাচ দু'একটা মাছ পাইয়া উল্লাসভরে সেটাকে কোঁচড়ে পুরিয়া আবার ছাঁক্‌নী দেয়। বেশীর ভাগই উঠে গুগ্‌লী আর ঝিনুক!

কাঁদন বলে, হে ভগবান ঝিনুকের ভেতর থেকে একটা মুক্তো বেরোয়না ?

মেয়েদের মধ্যে একটা হাসি পড়িয়া যায়। নিরাপদ বলে বৌঠানের আমাদের আশা কম নয় !

বাস্তবিকই আশা তাহার একটু বেশীই। ঐ যে সে একটা ঝিনুকের কবাটের মত খোলা-দুইটা দুইবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়া খুলিতে চেষ্টা করিতেছে না ? হায়রে !

ছেলেগুলা কাঁদনের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। কেউ বলে, মুক্তো বুঝি ?

কাঁদন যখন সত্যই মুক্তা পাইলনা তখন ছেলেগুলা সবাই মিলিয়া লাফ দিয়া চিৎ হইয়া জলের উপর শুইয়া পড়ে। পুনরায় উল্টাইয়া গিয়া সকলে হাত দিয়া জলের উপর থাব্‌ড়াইতে থাব্‌ড়াইতে চীৎকার করিতে থাকে—

তাক তেরে কাটি
পুকুরে প্যাকাটি
গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাই
ঝাই ঝাই ঝাই !

মুহূর্ত্তমধ্যে ডোবাটা ঘোলাইয়া একেবারে দই হইয়া উঠে। কাঁদন চটিয়া গিয়া বলে, ছেলেগুলা পাজীর পা-ঝাড়া একেবারে !

মুক্তা না পাইয়া বোধহয় কাঁদনের রাগ হয়, তাই ছেলেগুলার উপর অমন চটিয়া যায়। ছেলেগুলা কাঁদনের রাগ-রাগ ভাব দেখিয়া আরও জোরে জোরে ডোবা ঘোলাইতে থাকে আর তাহাদের গৎটী তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে আওড়াইতে থাকে। দুর্গার মা ঝাঝিয়া উঠিয়া বলে, শোলোক শিখেছে পোড়ারমুখরা—তোদের মায়েরা নুড়ো জেলে দিতে পারে না ঐ মুখে।

দুর্গার মার চেহারাখানি বেশ। ছেলেগুলাও বোধ করি জানে তাহার এ চেহারার কাহিনী। তাই তাহারা তাহাকে ভয় করেনা, কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। দুর্গার মা ছাঁকনি জাল তুলিয়া লইয়া তাহাদের মারিতে যায়। একটা ছেলে তাহার বাঁহাতের চেটোর উপর ডানহাতের কনুইটা রাখিয়া কব্জি নীচে দিকে করিয়া দক্ষিণে ও বামে নাড়িতে নাড়িতে বলে বক দেখেচো?

দুর্গার মা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠে, যা না হতচ্ছাড়ারা হাতীশুঁড়ের ঘাট আলো কর্‌গে যা না?

ছেলেগুলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে!

দুর্গার মার এত রাগ হয় কেন? বিধবা হইবার পর সর্ব্বদাই যেন সে এমনিতরো ক্ষেপিয়া আছে। ছেলেগুলা খেপাইতেছে বলিয়া যে সে রাগিয়া যাইতেছে তাহা নহে। ইহা তাহার অভ্যাস; কখনও দুর্গার মার মুখে কেহ ভাল কথা শোনে নাই। এই অভ্যাসের পিছনে অবশ্য কারণ আছে। দুর্গা যখন তিন বছরেরটী তখন তাহার স্বামী মারা যায়। সেই দুর্গা আজ বারো বছরেরটী হইয়াছে, সামনে তাহার বিবাহ দিবার তাগিদ অথচ সে ভয়ানক অর্থাভাব হেতু সঠিকভাবে কিছু করিতে পারিতেছে না। শুধু এইজন্যই সে এত রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তাহাও নহে। তাহার কন্যার বিবাহ দিবার তাগিদ না হয় আজকাল হইয়া পড়িয়াছে—ইহার আগে ত কন্যা বড় হয় নাই। তবে সেদিনগুলিতেও তাহার এমনিতরো রুক্ষতা চোখে পড়িয়াছে কেন? কে জানে সে কথা। হয়ত ফুল তাহার পাপড়ি মেলিতেছিল বসন্তের বনে, সেদিন মিতালী ছিল তার ভ্রমরের সাথে—হঠাৎ একদিন ভ্রমর গেল উড়িয়া, বসন্তও গেল তার সাথে—পড়িয়া রহিল শুধু রৌদ্রদগ্ধ বিষাক্ত নিশ্বাস ভরা কি এক জ্বালাময় কাল। ফুল উঠিল বিবর্ণ হইয়া।

দুর্গার মাকে লোকে জানে নষ্ট বলিয়া, এবং ইহা ঢাকিয়াই চলিতে

চায় সে। ইহার জন্য কি তাহার কম যন্ত্রণা। এমনিই রুক্ষতা আসে নাই দুর্গার মার জীবনে।

ছেলেগুলাকে নিরাপদ ধমক দিয়া চুপ করাইয়া দেয়।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। কালীর বউ কাঁদনকে বলে, দিদি চলো জাড় করচে বড্ড—শেষকালে নিমুনি হয়ে মরব।

হ্যাঁ এইবার যাই, বলিয়া কাঁদন জালটা ঝাড়িতে থাকে।

নিরাপদ বলে, না আজ আর কিছু হবেনা—চল সব।

তারপর সবাই একে একে ডাঙায় উঠিয়া আসে। ছেলেগুলা হল্লা করিতে করিতে দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়। নিরাপদ কাপড় ছাড়িয়া মেয়েদের সাথে গল্প করিতে করিতে চলে। মেয়েরা চলে ভিজা-কাপড়ে সপ সপ করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে।

ইহাও জীবনের এক সুনিশ্চিত পরিণতি। ইহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। নিরাপদ যাহা কোনদিন আশা করিতে পারে নাই আজ তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। জীবনযাত্রার পথে মানুষকে চলিতে হইলে নারীও যে পুরুষের সাথে চলিবে—এটা যেন নিরাপদকে দেখাইবার জন্যই ভগবান কাঁদনকে এমন অবস্থায় ফেলিয়াছেন। আহা খাটিয়া কাঁদনের শরীর যেন শুকাইয়া গিয়াছে। এ যুগে বাস করিয়া তবে কি সকলকেই এমনিতরো শুকাইয়া যাইতে হইবে? হায় ভগবান কে জানে সে কথা!

নিরাপদ যেন ভাবিতে শিখিয়াছে! শিখিবে বৈ কি! ইহা যে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল! যে কণ্টকময় পথ দিয়া সে জীবনের দীর্ঘদিনগুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সেই পথে কত কাঁটা তাহার পায়ে বিঁধিয়াছে, তার কি কোন সংখ্যা আছে? সেই কাঁটার যন্ত্রণা যে তাহাকে একদিন চিন্তা করিতে শিখাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে!

তবে কেন সে রাধাকে কারখানায় কাজ করিতে দেখিয়া অমন করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল ? রাধার কারখানায় কাজ করাটাকে সে ত এমন দরদ দিয়াই সমর্থন করিতে পারিত ! কিন্তু তখনও সে অভ্যস্ত হয় নাই এসব দেখিতে। তাহার বিশ্বাসের মূলে, সংস্কারের মূলে, তখনও এমন করিয়া আঘাত লাগে নাই—তাই সে বিরক্ত হইয়াছিল !

কিন্তু সে আঘাতই বা কি ? নিরাপদ কি তাহা বুঝিতে পারে ? পারে বৈ কি ! এত বিশাল দারিদ্র্যময় জগত লুকাইয়া থাকিবে কোথায় ! অজ্ঞানেরও চোখের সম্মুখে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে !

পৌষের ম্লান সন্ধ্যায় সর্পিল পথ যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়া আছে। ধূসর সন্ধ্যায় বিস্তৃতির মাঝে গ্রামের গাছপালা সব একাকার হইয়া গিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে নিরাপদ কখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। হঠাৎ চমকভাঙে তাহার সুশীলাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া। কাঞ্চন গাছটা অন্ধকারে ডালপালা মেলিয়া এক কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; নিরাপদ একবার সেদিকে তাকায়। এপথ দিয়া চলিলেই নিরাপদের যেন মনটা কি একরকমের হাহাকারে ভরিয়া উঠে। সুশীলা কি ফিরিবে না ? তাহার ইচ্ছা করে এইখানে সে একটু দাঁড়ায়। কিন্তু দাঁড়াইলে পাছে কেহ কিছু মনে করিয়া বসে সেই ভয়ে সে চলতি সঙ্গিনীদের সহিত চলিতে থাকে। বুকের ভিতরটায় কি যেন একটা ভারী পাথর আটকাইয়া আছে, নামিতে চায় না।

খানিকপর তাহারা বাড়ির নিকটে আসে। আর যে যাহার বাড়ির দিকে চলিয়া যায়। কাঁদন ও নিরাপদ বাড়ীতে প্রবেশ করে। কাঁদন আলো জ্বালাইয়া ভিজা কাপড়েই মাছ বাছিতে বসে। মাছগুলা বাছা হইলে ঝিনুক খুলিয়া বাহির করে। ঝাল ঝাল লাগিবে মন্দ নয়। কাঁদন বলে, ঠাকুর পো আজ বেশ হবে গো !

কি ঝিনুক, নিরাপদ জাপানী-খদ্দরের চাদরটা গায়ে জড়াইয়া বলে।

কাঁদন বলে, বেশ হবে না?

নিরাপদ বলে রাঁধনা?

কাঁদন বলে, বেলেপুকুর না হলে ঝিনুক মেলেনা—দ্যাখ-দিকিনি কত ঝিনুক?

নিরাপদ বলে, হুঁ!

তারপর নিরাপদ কাঁদনের মাছ বাছার কাছে আলোটা হইতে একমুঠি খড় জ্বালাইয়া লইয়া কলিকায় দিয়া হুকা টানিতে টানিতে দুয়ারে আসিয়া বসে। কাঁদন মাছবাছা শেষ করিয়া পুকুর ঘাটে যাইয়া ধুইয়া আনে। তারপর ভিজা কাপড় ছাড়িয়া রাঁধিতে বসে।

কিছুক্ষণ পরে, কর্ম্মান্তে বনমালী আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরাপদকে মুড়ি-সুড়ি দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠে, কিরে অমন করে বসে আছিস্?

নিরাপদ বলে, বড় জাড় করচে।

কেন, বনমালী যেন ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করে। কে জানে জ্বর আসিতে কতক্ষণ।

নিরাপদ বলে, জলার ডোবায় মাছ ধরতে গেছলুম বিকেলে।

তা' তামাক খা না, বলিয়া বনমালী দাওয়ার একদিকে বসিয়া পড়ে।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, তুই খাবি?

বনমালী বলে, সাজলে আর না খাব কেন?

তবে সাজি দাঁড়া, বলিয়া নিরাপদ তামাক সাজিতে বসে।

কাঁদন যেন আজকাল কি হইয়া গিয়াছে। আগে স্বামী কাজ হইতে ফিরিয়া আসিলেই সে গাড়ু করিয়া জল আনিয়া দিত, গামছা দিত আগাইয়া। এখন আর সে এসব করেনা। তাহাকেও সারাদিন এধার

ওধার খাটিতে হয় বলিয়া ক্লান্তিবশতঃ বোধ হয় সে ওসব কাজগুলি আর তেমনভাবে করিতে পারে না। বনমালীই বা চাহেনা কেন? স্ত্রীর উপর কি কোন টান নাই তাহার? আছে বলিয়াই ত চাহেনা। দুইজনেই পরিশ্রমক্লান্ত, কে কাহাকে আদেশ করিবে! কিন্তু যেদিন আদেশ করে সেদিন লাগিয়া যায় ঝগড়া। আজ অবশ্য বনমালী কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত আছে বলিয়াই জল গামছা চাহেনা। কি কাজে সে ব্যস্ত?

নিরাপদ তামাক সাজিয়া আনিয়া বনমালীর হাতে দিয়া বলে, খা!

বনমালী জিজ্ঞাসা করে, তুই খাবিনা?

নিরাপদ বলে, আমি এই খেলুম—তুই খা না তারপর খাব'খন।

বনমালী হুকায় টান লাগাইয়া ধোয়া ছাড়িয়া বলে, চল্ তামাক-টামাক্ খেয়ে একবার কৈবর্ত্ত পাড়ার ওদিকে যাই। কি সব গণ্ডগোল হয়েছে শুন্‌ছিলুম—

কি গণ্ডগোল হ'ল আবার, নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে। বনমালী বলে, কি জানি—শুনলুম ত মারধর হয়েছে নাকি!

বটে, নিরাপদ বিস্ময়ান্বিত ভাবে বলে।

বনমালী জোরে জোরে হুকায় টান লাগাইয়া হুকাটা নিরাপদর হাতে দেয়। বলে, টেনে নে শীগ্‌গির!

নিরাপদ হুকা টানিতে স্বরু করে।

এমন সময় বাড়ীর দরজায় কে যেন ডাকে, বনমালী—বনমালী?

বনমালী কাণ পাতিয়া শোনে! তারপর হাঁকিয়া বলে, কে?

বাইরে এসো না—আমি অতুল, বাহির হইতে আওয়াজ আসে।

অতুল কি কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছে না কি? বনমালী ও নিরাপদ মুখ চাওয়াচায়ি করে।

অ বনমালী, অতুল পুনরায় ডাকে।

বনমালী দাওয়া হইতে নামিয়া দরজার দিকে যায়। হ্যাঁ অতুলই ত!

অতুলের ডানহাতে একটা লণ্ঠন—বাঁহাতে একখানা খবরের কাগজ! সে বলে, শুনেছ?

বনমালী বলে, কি মারামারি?

না—না, অতুল বলে, শোননি—চল তবে শোনাই।

এসো এসো, বলিয়া অতুলকে পথ দেখাইয়া বনমালী দাওয়ার উপরে আনিয়া বসায়। নিরাপদ বলে, কি অতুল কবে এলে?

অতুল কলিকাতায় এক বেনেতি মশলার দোকানে কাজ করে। কলিকাতাতেই সে থাকে, মাঝে মাঝে পাঁচ-সাতদিন ছুটী লইয়া গ্রামে আসে। এবার অনেক দিন পরে সে আসিয়াছে। সেই আসিয়াছিল অমূল্য যেদিন তাহার বউকে খুন করিয়াছিল। অতুল বলে, আজই সকালে এলুম ভাই।

বনমালী বলে, তোমাদের ওদিকে কি সব মারামারি হয়েচে বলত?

মারামারি, খবরের কাগজখানা মেলিয়া অতুল বলে কি সব মারামারি?

কি সব শুন্‌লুম যে, বনমালী বলে।

অতুল বলে, তা তো জানিনা!

হ্যাঁ হয়েচে, বনমালী বলে, আমরা সব যাব ভাব্‌ছিলুম!

চল তবে একসঙ্গেই যাব, অতুল বলে, খবরটা পড়ে নিই ততক্ষণ!

নিরাপদ বলে, কি ভাই?

শোননা—শোননা, অতুল লণ্ঠনটা তাহার বিছানো খবরের কাগজটার কাছাকাছি আনিয়া বলে, পড়্‌ছি—দাঁড়াওনা!

অতুল এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক। কলিকাতায় সে যে দোকানে কাজ করে, সেই দোকানে রোজ সংবাদপত্র লওয়া হয়। অবসর সময়ে রোজই অতুল একবার করিয়া খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইয়া লয়। গতকল্য রাত্রিতে দোকান বন্ধ হইয়া যাইবার পর অতুল দোকান হইতে

সংবাদপত্রটী বাসায় লইয়া যায়। আহারাদি সারিয়া নিত্যকারের অভ্যাসমত সে পড়িতে বসে। এমন সময় তাহার চোখে পড়ে অমূল্যর মামলার কথা। তাড়াতাড়ি সে আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিয়া যায়। পড়িবামাত্র মনে পড়িয়া যায় গ্রামের কথা। গ্রামে ত কেহ এ খবর জানে না। সেখানে সংবাদপত্র কে-ই বা পড়ে। তাই সে কোন রকমে খবরের কাগজখানা লইয়া গ্রামে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। পরদিন অর্থাৎ আজ সকালে দোকানের মালিককে বলিয়া কহিয়া ছুটি লইয়া সে আসিয়াছে। এবং আসিয়াই হাত মুখ ধুইতে তাহার যতটুকু সময় গিয়াছিল, তারপর সে প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া খবরের কাগজখানি খুলিয়া অমূল্যর কথা সকলকে শুনাইয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের লোক এতদিন যাহাকে ভুলিয়াছিল আবার নূতন করিয়া তাহাকে মনে করিতেছে।

সংবাদপত্রের আইন আদালতের পাতাটি খুলিয়া সে বলে, অমূল্যর দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

নিরাপদ বলে, খবরের কাগজে লিখেছে নাকি ?

হ্যাঁ, সেই জন্যেই ত নিয়ে এসেছি কাগজখানা, বলিয়া একটু হাসে।

অমূল্যর কথা খবরের কাগজে লিখিয়াছে! কাঁদনও পায়ে পায়ে আসিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়ায়। অমূল্যর কথা শুনিবার তাহারও আগ্রহ কম নয়।

অতুল পড়ে—হুগলীর দায়রা জজ মিঃ এইচ, কে, হালদার আই, সি, এস অমূল্য ধাড়া নামক এক ব্যক্তিকে নরহত্যার দায়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ১২ই এপ্রিল বুধবার রাত্রি প্রায় একটার সময় আসামী তাড়ি খাইয়া বাড়ী আসে। এতরাত্রে মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য তাহার স্ত্রী মালতী তাহাকে তিরস্কার করে।

এই সময় আসামীর সহিত মালতীর বচসা হয়। কিছুক্ষণ পরেই এ বচসা থামিয়া যায়। আবার খানিক পরে সেই বচসা আরম্ভ হয়। এমন সময় আসামী খেজুর গাছ কাটা দা দিয়া মালতীর ঠিক গলার উপর আঘাত করে। ইহার ফলে ক্ষণকাল পরেই মালতীর মৃত্যু ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অমূল্যকে ৩০২ ধারা মতে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেয়।

প্রথমে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাথমিক ভাবে মামলাটি গ্রহণ করেন। পরে তিনি মামলাটী দায়রা জজের আদালতে স্থানান্তরিত করেন। আসামী তথায় এক স্বীকারোক্তি করে। স্বীকারোক্তিতে আসামী বলে যে, ইচ্ছা করিয়া সে স্ত্রীকে হত্যা করে নাই। স্ত্রীকে হত্যা করিবার ইচ্ছা তাহার কোনদিনই ছিলনা। সে একজন ভূমিহীন কৃষক, পরের জমিতে মুণীষ খাটিয়া তাহার দিন চলিত। সংসারে অভাব অনটনের জন্য প্রায়ই স্ত্রীর সহিত তাহার বচসা হইত। অনেক সময়ে স্ত্রীকে ধরিয়া সে মারিয়াছে কিন্তু হত্যা করিবার স্পৃহা জাগে নাই। ঘটনার দিন রাত্রে সে অত্যধিক ভাবে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া কি রকমভাবে আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে।

আরও আসামীপক্ষ হইতে এই প্রার্থনা করা হয় যে অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড বলিয়া আদালত যেন আসামীকে চরম দণ্ড না দেন। দায়রা জজ মিঃ হালদার জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে চরম দণ্ড না দিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। মিঃ জি, মুখার্জ্জি সরকারপক্ষ এবং এন, সেন আসামীপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

সব শুনিয়া বনমালী বলে, স্বীকার ক'রেছিল তাহলে?

নিরাপদ বলে, আর স্বীকার! এখন দ্বীপান্তরে যেতে হবে ত?

অতুল বলে, তা' যেতে হবে বৈ কি।

অস্ফুট স্বরে কাঁদন জিজ্ঞাসা করে, দ্বীপান্তরে গেলে মানুষ ফেরে?

প্রশ্নটা নিরাপদর মনেও উঠিয়াছিল। সে তাকাইয়া থাকে অতুলের দিকে। বনমালীরও ঠিক জানা নাই তাই সেও তাকায় সেদিকে। অতুল সহর বাজারে থাকে, কাজেই জ্ঞানটা যে তাহার বেশী, এসম্বন্ধে উহাদের সবারই এক ধারণা। কিন্তু অতুলই কি ছাই জানে? তবে পাছে সে ইহাদের কাছে খেলো হইয়া যায়; সেই ভাবিয়া বলিয়া উঠে, কেন ফিরবে না?

নিরাপদ বলে, ফেরে?

ফেরে বৈ কি, অতুল বিজ্ঞের মত বলে।

অমূল্যর সম্বন্ধে আরও কত কি আলোচনা হয়। মালতীর দুর্ণামটা তাহা হইলে সত্য নয়। হে ভগবান তাহাই যেন হয়—কাঁদন মনে মনে প্রার্থনা জানায়।

বনমালী বলে, নীরো ওঠ—চল শীগ্‌গির।

হ্যাঁ, অতুল বলে, দাঁড়াও খবরের কাগজটা তুলে নিই—আমিও যাব।

তারপর অতুল খবরের কাগজটা ভাঁজ করিয়া ঠিক করিয়া লইয়া বনমালী ও নিরাপদর সাথে পথে বাহির হইয়া পড়ে।

খানিক পরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কৈবর্ত্তপাড়ার দিকে আসিয়া উপস্থিত হয়। পথে দুই একজন লোকের সহিত তাহাদের দেখা হয়। তাহাদের নিকট এদিকের গণ্ডগোলের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। কৈবর্ত্তপাড়ার দক্ষিণ দিকে খানিকটা আবাদী জমি আছে, গণ্ডগোলটা হইয়াছে সেই দিকেই। আরও খানিকটা চলিয়া তাহারা ঘটনাস্থলের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। একটু দূরে কয়েকটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। সেখানে বহুকালের পুরাতন একটা বটগাছ অনেকটা জায়গা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছের উপর দিক হইতে ঝুড়ি নামিয়া নামিয়া

শিকড়ে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আরও অসংখ্য সরু ঝুরি জটার মত ঝুলিয়া আছে। তাহারই একটা ঝুরি ধরিয়া কে যেন ঘোড়ার উপরে বসিয়া রহিয়াছে। আশে পাশের লণ্ঠনের আলো আসিয়া পড়িয়াছে অশ্বারোহীর চশমার উপর, চিক্ চিক্ করিতেছে চশমা জোড়া। লোকটাকে দূর হইতে চেনা যায় না। আশেপাশে দেখা যায় লোকে লোকারণ্য।

বনমালী, নিরাপদ ও অতুল জোরে জোরে পা' চালাইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ে। ঘোড়ার উপর ও লোকটী হইতেছে আশুবাবুর ম্যানেজার অদ্বৈত! এখানে হইয়াছে কি? ভিড় ঠেলিয়া তাহারা দেখিতে যায় ব্যাপাবটা কি! অদ্বৈত হাতের টর্চ্চলাইটটা খচ্ করিয়া একবার জ্বালাইয়া লইয়া অনেকটা দূর অবধি দেখিয়া লয়। তারপর পাশে নীচের দিকে তাকাইয়া বলে, গোবিন্দ তোরা সব ওকে নিয়ে আয়।

তারপর সে টর্চ্চ জ্বালাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়।

সকলেই সেই দিকে তাকায়। কিন্তু নিরাপদ, বনমালী ও অতুল— ইহারা পরে আসিয়াছে বলিয়া আসল ব্যাপারটা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে গোবিন্দ এবং আরও দুইটা দারোয়ান শঙ্করকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কি হইয়াছে শঙ্করের?

আসল ঘটনাটা হইতেছে এই: ঐ যে কতকগুলা লোক পাশের ঐ ক্ষেত হইতে কাটা ধানের আঁটী করিয়া বোঝা বাঁধিতেছে, ও ধানগুলা হইতেছে শঙ্করদের। উপরি উপরি তিন বৎসর ধরিয়া তাহারা খাজানা দিতে পারে নাই বলিয়া জমিদার আশুবাবু এবার ক্ষেত হইতে তাহাদের ধানগুলা লইয়া যাইতেছেন। প্রথমে লোক পাঠাইয়া ধান লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা না পারাতে আশুবাবুর কাছে ফিরিয়া যায়। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সহিসকে ঘোড়া আনিতে বলিয়া

অদ্বৈত আসিবার জন্য প্রস্তুত হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে অদ্বৈত প্রস্তুত হইয়া ঘোড়ায় চাপিয়া এখানে আসিয়া পড়ে এবং কৃষাণদের ধান তুলিতে আদেশ দেয়। শঙ্করের বাবা বুড়া মহেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া অদ্বৈতর পায়ে পড়ে; বলে, সোঁৎবছর খেতে পাবে না বাবু—অনেকগুলি প্রাণী খেতে—

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে অল্প একটু হাসিয়া অদ্বৈত বলে, খাজানা না দিলে এমনই হয়।

মহেন্দ্র পুনরায় মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে, আপনি রাজা—আপনি মা-বাপ, আপনার কাছে কিছু লুকোবোনা। হুজুর, আমরা খেতে পাইনা, খাজানা দিব কি ক'রে?

হেঁ-হেঁ, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া অদ্বৈত ভারিক্কি চালে হাসে।

অদূরে শঙ্কর বসিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল আর রাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে দুঃসাহসী ছেলে, ভয়-ডর তাহার একটু কম। মহেন্দ্র অঝোর ধারে কাঁদিতেছিল, তাহাকে দেখাইয়া অদ্বৈত বলে, হাঁরে গোবিন্দ এ-ই তোকে মারবে বলে ভয় দেখিয়েছিল না?

গোবিন্দ মাঠের সারি সারি কাটা ধানগুলাকে আঁটী বাঁধিতে বাঁধিতে অদ্বৈতর দিকে তাকায়। ঘাড় নাড়িয়া বলে, হ্যাঁ হুজুর!

মহেন্দ্র অদ্বৈতর পা দুইটাকে আরও জড়াইয়া বলিয়া ওঠে, হুজুর ওরা জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যাবে বলছিল তাই রাগের মাথায় বলে ফেলেছিলুম! হুজুর অপরাধ নেবেন না—আমি গরীব!

গরীব! অদ্বৈত লাথি মারিয়া মহেন্দ্রকে ফেলিয়া দিয়া বলে, নেমকহারাম শুয়ারকা বাচ্ছা, খাজানা দেবার কথা মনে থাকেনা।

মহেন্দ্র মাটীতে শুইয়া পড়ে, লাথিটা জোরেই লাগিয়াছিল তাহাকে। শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারেনা। পিতাকে তাহার সম্মুখে এতখানি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে? সে কি মরিয়া গিয়াছে নাকি? ঝপ্

করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সে নক্ষত্রবেগে দারোয়ান দুইটার কাছে আসিয়া পড়ে। তাহাদের একজনার হাত হইতে সজোরে টান দিয়া লাঠিখানা কাড়িয়া লয়। ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলে, বাবা সরে এসো ওর পায়ের কাছ থেকে! ক্ষেত থেকে ধান কে তোলে একবার দেখি!

তারপর শঙ্কর লাফাইতে লাফাইতে ক্ষেতে নামিয়া পড়ে। হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠে, যে শালা ধানে হাত দেবে তার শির্ নোব আজ!

সভয়ে গোবিন্দের দল পিছাইয়া আসে। মহেন্দ্র বেয়ার ক্ষেতের ধান আটক হইতেছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই গ্রামের অনেক লোক আসিয়া ক্ষেতের চারিপাশে জড়ো হইয়াছিল। তাহারা শঙ্করের মূর্ত্তি দেখিয়া চমকাইয়া উঠে।

শঙ্কর ক্ষেতের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে থাকে, সোঁৎ বছরটা শালা গায়ের রক্ত জল করে ফসল লাগালুম—আজ নিয়ে যাবে কেড়ে? কে কত মায়ের দুধ খেয়েছো এসো দেখি আজ সামনে! শঙ্কর কি ক্ষেপিয়া গেল নাকি? বুড়া মহেন্দ্র হাউমাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। যা' রাগী ছেলে—হয়ত ও খুনই করিয়া বসিবে? মহেন্দ্র চিনে পুত্রকে। সম্বোধন করিয়া বলে, ওরে বাবা ফিরে আয়—চলে আয় শীগ্গীর!

শঙ্কর আর সে শঙ্কর নাই, এখন সে উন্মাদ! রোষে গর্জ্জন করিতে করিতে বলে, কোম্পানীর রাজত্বে বাস করি খাজানা না দিতে পারি নালিশ করবে—ধান আটক করবার কেহে তুমি?

মহেন্দ্র বুড়া চীৎকার করিয়াই মরে। বলে, ও শঙ্কর অমন করে বলিস্নি বাবা? ওরা আমাদের রাজা—মনিব!

বাবা সরে যাও—সরে যাও, বন্ বন্ করিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে শঙ্কর বলে, আজ হয় এস্পার না হয় ওস্পার!

ওদিকে কিছু হইবেনা দেখিয়া বুড়া মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া অদ্বৈতর

পায়ে পড়ে। বলে, বাবা ও ছেলেমানুষ কিছু জানেনা! ওকে বুঝিয়ে শান্ত করে দিচ্ছি! কিছু বোলোনা হুজুর।

অদ্বৈত রোষান্ধ দৃষ্টিতে বুড়ার দিকে একবার তাকায়। এতক্ষণ সে শঙ্করের মতলবটা লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার হাঁকে, রঘুবীর!

রঘুবীর বাঁহাতে লাঠিটা লইয়া অদ্বৈতর সামনে আসিয়া সেলাম করিয়া বলে, হুজুর?

অদ্বৈত বলে, দেখ্‌ছ কি?

বুড়া মহেন্দ্রের কাতরোক্তির বিরাম নাই। জীবন ভরিয়া সে শিখিয়াছে এই একটী মাত্রই কায়দা। এই তাহার বাঁচিয়া থাকার পন্থা, অনিবার্য্য বিপদকে ঠেকাইবার অস্ত্র। তাই সে বলে, হুজুর ও ছেলেমানুষ!

অদ্বৈত সেদিকে না তাকাইয়া বলিয়া উঠে, একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবে—যা হয় আমি আছি।

ইহা যে একেবারে চরম আদেশ! সমস্ত জনতা শিহরিয়া উঠে। রঘুবীর পাকা লাঠিয়াল, কে না জানে তাহার লাঠির শক্তির কথা! অদ্বৈত আশুবাবুর ডান হাত, আর রঘুবীর বামহাত! সে যখন চরম আদেশ পাইয়াছে বোধ করি…হে ভগবান! সমস্ত জনতা প্রার্থনা করে

আর শঙ্কর? বুড়া হীরু বাগ্‌দীর নিকট তাহার লাঠি শিক্ষা। হীরু যে কত বড় লাঠিয়াল তাহা এ অঞ্চলের কাহারও অবিদিত নাই। তাহার শিষ্য শঙ্কর! হীরুর কিছুই হয়ত সে পায় নাই কিন্তু পাইয়াছে তাহার সাহস। সেই বা ভয় পাইবে কেন? সেও হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠে, জয় গুরু —হয় জেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না হয় এখানে মর্‌ব!

রঘুবীর হুঙ্কার দিয়া মাঠে নামে। তারপর যেন দুইটা পাগ্‌লা হাতীতে লড়াই হইতে থাকে। সমস্ত জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, অচেতন জড়

পদার্থের মত তাহাদের বীভৎস সংগ্রামের সামনে থাকে দাঁড়াইয়া। কিছুতেই রঘুবীর কাবু করিতে পারিতেছেনা শঙ্করকে। অদ্বৈত চঞ্চলভাবে এদিকে ওদিকে পায়চারী করে। রঘুবীরটা কি? কি করিতেছে ও? হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া অদ্বৈত হাঁকে, রামদীন্ —রামদীন্?

যে দরোয়ানটীর হাত হইতে শঙ্কর লাঠি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারই নাম রামদীন্। সে সামনে আসিয়া সেলাম করে।

অদ্বৈত বলে, আমার বন্দুক—বন্দুক নিয়ে এসো!

একি! প্রজার ধান কাড়িতে বন্দুক আসিবে! জনতা আরেকবার শিহরিয়া উঠে। কিন্তু আর ভয় নাই ঐ দেখা যায় রঘুবীরের লাঠির আঘাতে শঙ্করের হাতের লাঠি ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়াছে আর রঘুবীর তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে; সমস্ত জনতা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। কেন যে হাঁপ ছাড়ে তা তাহারাই জানে! অদ্বৈত বলে, বেঁধে ফ্যালো!

তারপরের ঘটনা অতি সংক্ষেপ। জয় যেদিকে জনতাও সেদিকে। শঙ্করের অবস্থা দেখিয়া তাহার ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে বিশ্রী ইঙ্গিত করে। তাহার করুণ অবস্থা দেখিয়া তাহারা হাসে।

কিন্তু ইহারই মাঝে পিপীলিকার সারির মত লোক আসিয়াছিল। কেমন করিয়া খবর পায় কে জানে। বনমালী, নিরাপদ অতুল ইহারা আসিয়াছে কিছু বিলম্বে, জনতার নিকট হইতে সব শুনিয়া লয়।

নিরাপদ বলে, ধান ত ঐ তুলে নিয়ে যাচ্ছে—তারপর খাবে কি ওরা?

পাশে ছিল কালী। সে বলে, তারই জন্যে ত এত কাণ্ড হ'ল।

তাই নাকি, নিরাপদ বলে।

বনমালী বলে, তবে আর শুন্‌লি কি বাপু?

জনতার তখন ফিরতি মুখ। আগে আগে শঙ্করকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে। নিরাপদ, বনমালী, কালী, গোপাল, বিপিন দক্ষিণ পাড়ার লোকগুলি চলে পিছন পিছন। আরও কত লোক চলিয়াছে মাঝখানে।

প্রজার ধান কাড়িয়া লওয়া যে একটা ভয়ানক বে-আইনী ব্যাপার—একথা গ্রামের লোক অধিকাংশই জানেনা। যাহারা জানে তাহারা প্রতিবাদ করিতে পারেনা। হয় তাহাদের স্বার্থে আটকায় নয়ত কাপুরুষতা ইহাদের মজ্জাগত বলিয়া। জীবনযাত্রার পথে ইহাকে আরও পাঁচটা দুর্ঘটনার মত অধিকাংশ লোক মানিয়া লইয়াছে। তাই সম্মুখে যখন জমিদারকে অপর কাহারও ধান লুঠ করিয়া লইয়া যাইতে দেখে তখন ইহারা ভাবে হয়ত তাহাদেরও ক্ষেত খামারে একদিন এমনি ভাবে লুঠতরাজ চলিবে! ভয়ে শিহরিয়াও উঠে কিন্তু জীবনের নিষ্ঠুর নিয়তি ইহাদের এমনই নীচে নামাইয়া লইয়া গিয়াছে যে অন্তরের বেদনা দুঃখ ও লজ্জাকে ঢাকিতেই ইহারা ভালবাসে; ভালবাসে ইহারা বক্রহাসি দিয়া নিজেদেরই অত্যাচারিত ভাইটীকে অবহেলা করিতে কারণ যদি ইহাতে তাহাদের কোন একটু সুবিধা হয়। সমবেদনা সহানুভূতি এখানে নাই। শুধু ইহাই নয়, ইহারা এটুকু পর্য্যন্ত জানে যে ভূস্বামী তাহাদের উপর কোনই করুণা প্রদর্শন করিবেনা। তবু—তবু একটা ক্ষীণ আশা, অবশ্যম্ভাবী নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষার এতটুকুও অপচেষ্টা! কি করিবে ইহারা—এই আত্মসর্ব্বস্ব সভ্যতার শিক্ষাই যে এই!

চলিতে চলিতে নিরাপদ বলে, এমনধারা হলে ত গাঁয়ে বাস করা দায় হয়ে উঠবে।

পাশ হইতে বিপিন বলে, করবেই বা কি বাপু?

ভাবিবার মত কথা বটে! সমস্ত জনতা নীরবে পথ চলে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। মাঝে মাঝে কাহারও হাতের হারিকেনের

আলোয় কাহারও কাহারও মুখের চেহারা দেখা যায়। একটা ভয়ের ছায়া সে মুখগুলিতে যেন পরিস্ফুট।

গোপাল বলে, করা কি কিছু যায় না,—যায়! কিন্তু আমার বিপদে তুমি হাস তোমার বিপদে আমি হাসি! আমাদের মধ্যে কি কোন মিল আছে?

আবার বিপিন কথা বলে। অন্ধকারের ভিতর হইতে তাহার কণ্ঠস্বর পাওয়া যায়। সে বলে, হ্যাঁ মিল? মিলের কথা আর বোলোনা গোপাল! বলে মাগ্‌-ভাতারে যাদের মিল নেই তাদের আবার মিল? আরে—রামোঃ!

এই সব কথা শুনিয়া কালী তাচ্ছিল্যভরে বলিয়া উঠে, যাঃ যাঃ বাপু—জমিদারের বগলের নীচে যাদের বাস করতে হয় মিল করেই বা তাদের কি হবে? চাপ দিলে কোথায় থাকে তার ঠিক নেই—হ্যাঁ!

জীবনের সমস্ত অতীত যেন নিরাপদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। সে বলে, তা যদি বল্‌লি তবে আমি বলি বাপু জমিদারের বগলের নীচে থেকে চাপটা আর লাগাইনি কবে?

একথাটাও ভাবিবার মত!

বিপিন বলে, তা যা' বলচো সত্যি কথা।

কালী বলে, তার জন্যেই কি মিল করতে হবে?

এ্যা, নিরাপদ এমনিই জিজ্ঞাসা করে। বিপিন বলে, আরে বাপু ও আমাদের চাষা-জাতের কিছু হবে না—কিছু হবে না! লোক সব সুবিধের নয়। ঐ ত শঙ্করের অবস্থা দেখলে কেউ কি গিয়ে ওকে সাহায্য করলে?

তা' বটে—নিরাপদ ভাবে। দুঃখের দিনেও কি এই চাষা জাতটা এক হইবে না। এই ত কালী, কালীর দাদা, ওর বড়দাদা হারু—তিনজনে এত ঝগড়া যে কেউ কাহারও মুখ দেখে না। অথচ একজন

মারা গেলে আর দু'জন নিশ্চয়ই কাঁদিবে! ভাই মরিলে যদি ভাই কাঁদে, হে ভগবান, চাষী মরিলে চাষী কাঁদিবে না কেন? কথাটা নিরাপদ বলিয়া ফেলে।

বনমালী এতক্ষণ নীরবেই চলিতেছিল। নিরাপদর কথায় এবার সে বলিয়া উঠে, এতক্ষণে নীরো একটা কথা বলেচে!

নিরাপদ তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করিয়া পল্লী প্রচলিত প্রথানুযায়ী বলিয়া উঠে, অবিশ্যি ভগবান না করুণ, এমনও তো হতে পারে? আর তাই যদি হয় তবে চাষীর বেলাতে হবেনা কেন?

বিপিন বলে, কে বলে নীরো বোকা-বোকা মানুষ!

বনমালী বলে, কথাটা ঠিকই!

গোপাল বলে, নিশ্চয়ই!

কি করিয়া যে ইহাদের মাথায় এসব কথা আসে! এমনি করিয়াই আলোচনা করিতে করিতে তাহারা সারাপথটুকু চলে। যতই হউক, আজ দুঃখ পাইয়াছে ইহারা, আঘাত পাইয়াছে, ভয়ও হইতেছে—কে জানে কি আছে তাহাদের ভাগ্যে। গ্রামে জীবন একটা দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভরা!

ঘরে ঘরে সেদিন বোধ করি শঙ্করের কথাই লোকে আলোচনা করে। কাঁদন শুনিয়া অবাক হইয়া যায়। তাহাকেও আকুল করিয়া তোলে কি এক ভয়ের আভাষ!

শীতকাল বলিয়া নিরাপদর শোবার জায়গাটী জুটিয়াছে বেশ। বনমালীর ঘরের দাওয়ারই একদিকে খুঁটির সাথে বাঁখারি বাঁধিয়া তাহার ফাঁকে ফাঁকে তালপাতা দিয়া কোন রকমে একখানি ঘরের মত করা হইয়াছে। এইখানেই নিরাপদ আজকাল রাত্রিতে শুইয়া থাকে।

ঘরের মধ্যে থাকে কাঁদন ও বনমালী। বাহিরে পৌষের কন্‌কনে শীতের রাত্রি পড়িয়া থাকে। মাঝে মাঝে হিমেল হাওয়া আসিয়া

নিরাপদর শয়ন কক্ষের তালপাতাগুলিকে নাড়া দিয়া যায়। নিরাপদ তাহারই মাঝে মুড়ি দিয়া অঘোরে ঘুমায়।

পরদিন সকালেই এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

বনমালী তখন কাজে চলিয়া গিয়াছে; নিরাপদ বাড়ীর উঠানে বসিয়া বসিয়া বাখারির উপর তালপাতা দিয়া আগড় না কি একটা প্রস্তুত করিতেছিল। হঠাৎ বাড়ির বাহিরে অপরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বরের মত কাহার আহ্বান শোনা গেল।

কাঁদন রান্নাঘরের দুয়ারে কতগুলি কঞ্চির বোঝা থরে থরে সাজাইতেছিল—একটু পরেই রান্না করিতে হইবে। দরজার বাহিরে কাহার ডাক শুনিতে পাইয়া সে নিরাপদর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। নিরাপদও অনুরূপ ভাবে তাকায় তাহার দিকে।

কাঁদন জিজ্ঞাসা করে, কে বলদিকি ?

নিরাপদ বলে, জানিনিতো।

—ত্যাখ না।

—দেখ্‌ছি, বলিয়া নিরাপদ উঠিয়া যায়।

বাহিরে গিয়া সে যাহা দেখে তাহাতে বিস্মিত হইয়া যায়। বাড়ীর পাশে যে আমগাছটা তাহার ওদিকে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেটে-পথের উপর কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের এক জনের হাতে কাস্তে ও হাতুড়ী চিহ্নিত একটী লাল পতাকা, আরেকজনের হাতে অনুরূপ একটা লাল কাপড়ে কি সব লেখা। সেদিকে তাকাইতেই দেখে সরকার মশাই তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। নিরাপদ পথে নামিয়া পড়িয়া চক্ষের পলকে সরকার মশায়ের কাছে ছুটীয়া যায়। তাঁহার একখানা হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠে, উঃ আজ আমাদের কি সৌভাগ্য !

পিছনের সঙ্গীদের দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া সরকার মশাই

বলেন, আর সৌভাগ্য—তোমাদের বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে ভাই আমরা কাবু হয়ে গেছি !

কেন, সবিস্ময়ে নিরাপদ প্রশ্ন করে।

আর কেন, সরকার মহাশয় বলেন, পথঘাট চিনি না—নতুন জায়গা !

অভিমানে ক্ষুব্ধস্বরে নিরাপদ বলে, একটা খবর দিলে হ'ত ত ?

সরকার মশায় তাঁহার স্বাভাবিক হাসিটী হাসিয়া বলিয়া উঠেন, কি করে খবর দোব ভাই—হঠাৎ এসে পড়্তে হ'ল যে—

নিরাপদ সরকার মশায়ের সঙ্গীগুলির দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে যেন কি জিজ্ঞাসা করিতে যায়। সরকার মশাই বলেন, কিছুই ঠিক ছিল না। শুধু অবস্থা ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে বলেই ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

ওরা কারা, নিরাপদ প্রশ্ন করে।

—সব চটকলের মজুর।

আরও কি যেন নিরাপদ জিজ্ঞাসা করিতে চায়। সরকার মশাই তাহা বুঝিতে পারিয়া বলেন, ঐ দেখছো কাস্তে আর হাতুড়ীর চিহ্ন দেয়া লাল পতাকা—ঐ পতাকা হচ্ছে মজুরদের। ঐ লালের ওপর কাস্তে আর হাতুড়ী হ'চ্ছে—চাষী আর মজুরের চিহ্ন। চাষী আর মজুর দুনিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে—তাই তাদের জন্যে সারা দুনিয়ায় আজ ঐ পতাকার সম্মান।

নিরাপদ বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টিতে লাল পতাকার দিকে তাকাইয়া থাকে। সরকার মশাই বলেন, ভাই নিরাপদ এবার তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে গাঁয়ের চারিদিকে। কিছু চাল ডাল তরী-তরকারী যা পার তুলে দিতে হবে। চটকলে ভয়ানক জোর ষ্ট্রাইক হ'য়েছে।

সরকার মশাই এই জন্যই এখানে আসিয়াছেন। প্রায় তিন সপ্তাহ হইল গঙ্গার ধারের চটকলগুলির শ্রমিকগণ একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

বহুদিন হইতেই তাহাদের মজুরীর হার কমিয়া শ্রমের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছিল। ইহা ছাড়া যখন তখন কাজে জবাব দেওয়া মারধর, জরিমানাতে শ্রমিকদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল—এই সবের প্রতিকারার্থেই এই ধর্ম্মঘট। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদিগের গৃহে অন্ন নাই, অথচ কারখানার নানারকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের দাবী করিতে হইলে ধর্ম্মঘট ভিন্নও আর পথ নাই। কাজে কাজেই ধর্ম্মঘট করিলে যে না খাইয়া থাকিতে হইবে—ইহা জানিয়া শুনিয়াও তাহারা ইহা করিয়াছে এবং ইহার ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা স্বল্পবিত্তর সকলকেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। একদিকে হাজার হাজার ধর্ম্মঘটী শ্রমিক, আরেক দিকে তাহাদের অসংখ্য পোষ্যের দল। একমুষ্টি অন্নের অভাবে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেছে। এ অবস্থায় শ্রমিকসঙ্ঘ হইতে সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইল। কিন্তু সাহায্য ভাণ্ডারের এমন অর্থ কোথায় যাহাতে সেখান হইতে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষগুলিকে সাহায্য করিবে? সেইজন্য সাহায্যভাণ্ডারের কর্ম্মীদিগকে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতে হইতেছে এবং কর্ম্মীগণ তদনুযায়ী হাটে-বাজারে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। একদিন এই কর্ম্মীদল সরকার মশাইদের আড়তে কিছু সাহায্য পাইবার আশায় আসিয়াছিল। সেই সময় তিনি শ্রমিকদিগের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। হাজার হাজার লোকের মনুষ্যত্বের দাবী—তিনি শুনিবামাত্রই নিজের যথাসাধ্য দিয়া সাহায্য করেন এবং যাহাতে আরও সাহায্য পাওয়া যায় তাহারও বন্দোবস্ত করেন। এই জন্যই তিনি কর্ম্মীদের লইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। এখানে যখন নিরাপদ, বনমালী তাঁহার বন্ধুরা রহিয়াছে তখন তিনি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সাহায্য পাইবেন।

বনমালী কোথায়, সরকার মশাই জিজ্ঞাসা করেন।

—কাজে বেরিয়েচে।

—ও!

—আচ্ছা বেশ তুমিই চল, বলিয়া সরকার মশাই একবার পিছনের বন্ধুগুলির দিকে তাকাইলেন।

ষ্ট্রাইক কি—সে সম্বন্ধে নিরাপদর কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। মাঝে মাঝে কথাটা শুনিয়াছে বটে। গ্রামের লোক সকল সময়েই নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশা, অভাব-অভিযোগ লইয়া ব্যস্ত থাকে, সহরে শ্রমিকদের কেমন করিয়া দিন কাটে, তাহা ইহারা জানে না এবং জানিতে চাহে না। তবু ষ্ট্রাইক যেন কি একটা গণ্ডগোলে ব্যাপার এবং চটকল সম্বন্ধীয়ই ব্যাপার।

নিরাপদর মনে পড়িয়া যায় ভগ্নী রাধার কথা। তাহা হইলে এই গণ্ডগোল ত তাহাকেও স্পর্শ করিবে।

নিরাপদকে খানিকটা চিন্তান্বিত দেখিয়া সরকার মশাই বলিয়া উঠেন, ভাই হাজার হাজার লোক কাজ বন্ধ করে বসে আছে। তারাত খেতেই পাচ্ছে না, তা ছাড়া তাদের মা বোন ছেলেমেয়েরাও না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে। কি ভয়ানক অবস্থা বল ত? তাই আজ লোকের কাছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে আমরা ঘুরছি। ঐ যে পতাকার মত আরেকটা লাল কাপড় দেখছো—ওতে লিখে দিয়েছি সে সব কথা।

তাহা হইলে রাধাও এমনি অবস্থায় পড়িয়াছে। নিরাপদর মনে পড়িয়া যায় একদিন রাধার বাসা হইতে সে ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া আসিয়াছিল। তারপর আর বোনটির কোন সংবাদ লয় নাই। কে জানে কাজ বন্ধ করিয়া সে বসিয়া কি করিতেছে! নিরাপদর বুকের ভিতরটায় কে যেন একটা তীব্র মোচড় দিল। সে এমনই নিষ্ঠুর যে এতদিনের মধ্যে একবারও বোনটির খোঁজ লয় নাই! অনুশোচনায় অন্তর তাহার হাহাকার করিয়া উঠে। একমাত্র ভগ্নী আজ না খাইতে পাইয়া কষ্ট

পাইবে—ইহা তাহার সহ্যের বাহিরে। তাই তাড়াতাড়ি সে প্রশ্ন করিয়া বসে, কতদিন এমনিভাবে চল্‌ছে?

প্রায় কুড়ি একুশ দিন, সরকার মশাই বলেন।

কুড়ি একুশ দিন! নিরাপদ চমকাইয়া ওঠে। এতদিন কাটিয়া গিয়াছে, রাধা অনাহারে অনশনে দিন কাটাইতেছে আর সে চুপ করিয়া আছে? উদ্বিগ্নচিত্তে সে পুনরায় প্রশ্ন করে, যারা কাজ বন্ধ ক'রে ব'সে আছে তাদের এখন ঠিক অবস্থা কি রকম?

সরকার মশাই বলেন, ঐত বললুম ভাই। হাজার হাজার লোক শুধু দু'মুঠো অন্নের জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কন্‌কনে শীতে তাদের ঘরের ছেলেগুলো না খেতে পেয়ে ঠাণ্ডায় মাটি আঁকড়ে কুঁকড়ে প'ড়ে আছে। হয়ত আর দু'দিন পরেই এদের সবাইকে মরণের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

নিরাপদ ভয়ে শিহরিয়া উঠে। বলে, আর কতদিন এরকমভাবে থাকতে হবে সরকার মশাই?

তার কি কোন ঠিক আছে, যতদিন না তাদের মনুষ্যত্বের অধিকার মালিকরা মেনে নেয়!

এরজন্যেই বুঝি সকলে কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে, বলিয়া নিরাপদ সরকার মশায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

সরকার মশাই বলেন, এর জন্যেই ত! মালিকরা তাদের উদয়াস্ত নাকে দড়ি দিয়ে খাটাবে, উচিত মত মজুরী দেবেনা, গালাগালি মারধর অপমান করবে, যখন তখন চোখ-রাঙাবে, ইচ্ছেমত কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে, চাকরী দেয়ার নাম ক'রে ঘুষ নেবে, সন্তানসম্ভবা মেয়েদের বিনাবেতনে ছুটী দেবে—এসব জবরদস্তি বন্ধ করবার জন্যেইত এই ষ্ট্রাইক। এবার মালিকরা বুঝুক গরজ শুধু মজুরদেরই নয়। ঘরে অন্ন নেই বলে তারা মজুরদের ওপর যা-ই কিছু ক'রে থাকুক, তা' আগে

শোভা পেয়েছে আজ আর নয়। আজ মজুররা মরণপণ ক'রে লেগেছে —হয় তারা মরবে নয়ত চিরদিনের জন্যে সমস্ত অত্যাচারের অবসান ঘটাবে। মালিকদের মেনে নিতেই হবে এ-দাবী!

সরকার মশাই দুঃখী মানুষ, তার উপর হৃদয়টায় তাঁহার সমবেদনার অনুভূতি অত্যন্ত প্রগাঢ়। সুযোগ পাননা তাই মনের ভাব কখনও ব্যক্ত করিতে পারেন না। আজ নিরাপদর সম্মুখে শ্রমিকদের দুঃখময় সংগ্রামের কথা বলিতে পারায় তাঁহার হৃদয়ের সবটুকু দরদ ভাষায় ফুটিয়া উঠিতেছে। আর নিরাপদ? নিরাপদ কখনও এমন কথা শুনে নাই, সে সরকার মশাইকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতেছে। শ্রমিকদের এই ধর্ম্মঘটের উপর সরকার মশায়ের ধারণা শুনিয়া নিরাপদ বলে, মালিকরা যদি মেনে না নেয়?

নিতেই হবে মেনে, সরকার মশাই বলেন, না নিয়ে উপায় নেই। যাদের জন্যে মালিকরা ফুলে ফেঁপে উঠেছে তারা যদি কোন সঙ্গত দাবী করে বসে তাহলে তা' উড়িয়ে দেবার জো নেই। আর তা' ছাড়া এই দাবী করার পথটাকে তারা বেশ ভয় করে। এক একটা ষ্ট্রাইকে মালিকদের যে কত ক্ষতি হয় তার ইয়ত্তা নেই। সেইসব ক্ষতিকে বাঁচাবার জন্যে অন্ততঃ তারা মেনে নেবে মজুরদের এই দাবী।

মালিকরা মানিয়া নিক আর নাই নিক, এখন যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এই লোকগুলি বাঁচিবে কি করিয়া ইহাই নিরাপদর সমস্যা। আরও তাহার ভাবনা, রাধার অবস্থাই বা কি হইবে। সাধারণ মানুষ সে, ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্ক দিয়া জগতের দুঃখ সুখের বিশাল ব্যাপ্তির মাঝে তাহাকে দিক নির্ণয় করিতে হয়। চারিদিকে যখন চটকলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে তখন তাহার যথার্থ ফলাফল জানিবার জন্য নিরাপদ অতখানি আগ্রহান্বিত হইবে কেন? রাধাও উহাতে যোগদান করিয়াছে বলিয়াই ত! কবে মালিকগণ

শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইবে, তাহা ভাবিয়া নিরাপদর মন এক অজানা আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

সরকার মশাই বলেন, হয়ত মালিকরা মজুরদের কোন দাবীই মেনে নেবে না—অবশ্যি অনেকবারই এটা দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু এবারেও যদি তা হয় তবে এর ফল হবে সাঙ্ঘাতিক। কেননা আজকের দিনে ত সবাই অল্প বিস্তর বুঝতে শিখেছে।

ইহার ফল আবার ভয়ানক হইয়া উঠিতে পারে? নিরাপদ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সরকার মশায়ের দিকে তাকায়। তিনিও ঐভাবে তাকান নিরাপদর দিকে। নিরাপদ কি যেন ভাবে। ভাবিয়া কি সে কূল পাইবে?

কূল পায়না। সে শুধু ভাবে—রাধার যেমন কষ্ট হইতেছে তেমনি কষ্ট ত আর সকলেরও হইতেছে। কিন্তু এই অবস্থায় সেই বা কি করিতে পারে। সরকার মশাইকে সে একথা জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, ভাই, যে যা পারে সে তাই দেবে এসব কাজে গরীব লোকেরাই দিয়ে থাকে—তাই বেশী কিছু আমাদের দাবী নয়। অনেকের সহানুভূতিতে অনেকগুলো প্রাণরক্ষা হবে—এইটুকুই আমাদের কাছে বড়।

তবে আসুন বাড়ীর ভেতরে আমরাও কিছু দোব, বলিয়া নিরাপদ সরকার মশায়ের দিকে তাকায়। সরকার মশাই বলেন, না ভাই আর বাড়ীর ভেতর যাবনা—দেরী হয়ে যাবে।

না না এমন আর কি দেরী হবে, নিরাপদ বলে।

ও গেলেই দেরী হবে, সরকার মশাই বলেন, যেদিন হোক এর পরে একদিন আসব'খন—আজ আর নয়।

সে কি কথা হয়—

হ্যাঁ হ্যাঁ হয়—যাও তুমি কি আনবে নিয়ে এসো, বলিয়া সরকার মশাই তাকে বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য ইঙ্গিত করেন।

নিরাপদ বলে, দেখুন দিকি কি ব্যাপার!

ব্যাপার আর কিছু নেই, সরকার মশাই বলেন, এখন আমাদের সারা গ্রামখানা ঘুরতে হবে—

অগত্যা নিরাপদ একাকীই বাড়ীতে যায়। কাঁদনকে বলে, বৌঠান আমাদের ঘরে আনাজ কোনাজ কি আছে বলদিকি?

কাঁদন ইতিপূর্ব্বেই দরজা দিয়া বার কয়েক উঁকি মারিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়াছিল। এমন ঘটনা সে মাঝে মাঝে দেখিয়াছে। দুর্ভিক্ষ হইলে জলপ্লাবন হইলে ভলান্টিয়ারের দল সব হারমোনিয়াম বাজাইয়া, গান গাহিয়া এমনি করিয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাই পূর্ব্বেই সে সব যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা থালায় এক থালা চাল আর কয়েকটা আলু বসানো ছিল। কাঁদন সেদিকে ইঙ্গিত করিয়া অল্প একটু হাসিয়া বলে, আমি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখে দিয়েচি।

নিরাপদ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, তুমি বুঝলে কি করে?

আমি যে দেখলুম উঁকি মেরে, বলিয়া টানিয়া টানিয়া কাঁদন হাসে। তারপর আবার বলে, হ্যাঁ ঠাকুরপো বহু লোক কাজ বন্ধ করে বসে আছে?

তাও শুনেচো বুঝি!

ওমা আমি যে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম গো!

তাই নাকি?

হ্যাঁ—

আচ্ছা আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলুম সে কে বলদিকি, বলিয়া নিরাপদ মিট মিট করিয়া হাসে।

কাঁদন বলে, তা' কি করে জানব।

উনি হচ্ছেন আমাদের সেই সরকার মশাই, নিরাপদ সগর্ব্বে বলে।

তাই নাকি, কাঁদন চমকাইয়া উঠে তারপর বলে, বাড়ীতে নিয়ে এলেনা কেন ?

এখন কাজ আছে—এদিক-ওদিক ঘুরবেন তাই এলেন না, বলিয়া নিরাপদ চালের থালাটা তুলিয়া লয়।

কাঁদন বলে, কিন্তু আসতে বলে দাও আরেক দিন।

তাকি আর না বলব, বলিয়া নিরাপদ বাহিরে চলিয়া যায়। কাঁদনও পিছন পিছন যায় দরজার দিকে।

নিরাপদ বাহিরে আসিলে সরকার মশাই তাঁর একজন সহকর্ম্মীকে থলে লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করেন। তাহাকে দেখিয়াই নিরাপদ চিনিতে পারে।

সরকার মশাই বলেন, তুলাল এই আমার বন্ধু—নাম নিরাপদ ভূঁইয়া। চেন একে ?

তুলাল নিরাপদর মুখের দিকে তাকায়। সরকার মশাই এবার নিরাপদর দিকে তাকাইয়া বলে, ভাই নিরাপদ এই তুলালটী হচ্ছে মজুর ইউনিয়নের একজন খুব উৎসাহী কর্ম্মী। তুমি নিশ্চয়ই একে জাননা।

নিরাপদ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠে, নিশ্চয়ই জানি।

নিরাপদর এই কথায় সরকার মশাই ও তুলাল উভয়েই বিস্মিত হয়। নিরাপদ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলে, উনি ত খড়িগাছিতে থাকেন ?

আরও বিস্মিত হইতে হয় উহাদের তুজনকে।

সরকার মশাই বলেন, বাঃ সবই ত জান দেখচি !

কি ক'রে জানলেন আপনি, তুলাল জিজ্ঞাসা করে।

ওখানে যে আমার বোন থাকে, তারই বাড়ীতে একদিন রাতে আপনাকে দেখেছিলুম।

তা হবে—ওখানে কে আপনার বোন বলুন ত, তুলাল জিজ্ঞাসা করে। নিরাপদ রাধার কথা বলে। তুলাল সবিস্ময়ে বলে, আরে রাধা আপনার বোন।

হ্যাঁ, বলিয়া ঘাড় নীচু করে নিরাপদ। বোনের ত পরিচয় দিবার মত কিছু নাই !

দুলাল বলে, তারই বাড়ীতে বুঝি আমাকে দেখেছেন !

—হ্যাঁ

—তা হবে আমার মনে নেই।

মনে থাকিবার কথাও নয়। যখন নিরাপদ দুলালকে দেখিয়াছিল তখন সে ছিল স্ত্রীর সহিত ঝগড়ায় মত্ত। কাজে কাজেই সে সময়ে কাহাকেও চিনিয়া রাখিবার মত শক্তি তাহার ছিল না। অবশ্য নিরাপদের পক্ষে শুধু ঐ কারণেই চিনিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে।

উহাদের দুইজনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সরকার মশাই বলিয়া উঠেন, দুলাল যখন তোমার পরিচিতই তখন আর নতুন ক'রে পরিচয়ের দরকার নেই কিন্তু ভাই দুলাল তুমি আমার এই বন্ধুটীকে ভুলোনা যেন—

আবার, দুলাল বলে, এবার পরিচয় পাকাপাকি হয়ে রইল।

সরকার মশাই বলেন, নাও এবার তবে থলেটা পাতো—আজকে আমাদের বৌণীটা ভাল হবে !

দুলাল থলেটা পাতিলে নিরাপদ ধীরে ধীরে থালাটা উপুড় করিয়া দিয়া বলে, কিন্তু আমাদের বৌঠান থেকে যাবার কথা বলছিল সরকার মশাই !

—কে বনমালীর বউ ?

এমন সময় দরজার একটা কবাট নড়িয়া উঠে। সরকার মশাই তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন।

তাই তিনি বনমালীর স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, আজ চলি মা—বড় তাড়াতাড়ি আছে। আর একদিন আস্‌ব'খন।

তারপর সরকার মশাই দুলালকে চলিতে নির্দ্দেশ দেন। নিরাপদ দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া কাঁদনের হাতে থালাটা দিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়। সরকার মশাই বলেন, তাহ'লে এবার চল নিরাপদ !

—হ্যাঁ চলুন

—আগে কোনদিকে যাওয়া যাবে ?

—পশ্চিম পাড়ার দিকে চলুন

বেশ—তুমি আগে আগে চল, বলিয়া সরকার মশাই নিরাপদকে পথ ছাড়িয়া দেন। নিরাপদ আগাইয়া যায়।

দুলাল ইতিপূর্ব্বেই কয়েক পা আগাইয়া গিয়াছিল। পথের উপরে উঠিয়া নিরাপদ তাহার কাঁধে হাত দিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, রাধা কেমন আছে ?

দুলাল উত্তর দেয়, কেন সেতো ভালই আছে !

—কোন কষ্ট হয়নি তার ?

—কষ্ট হবে কেন একলা মানুষ !

তাহ'লে ভালই আছে কেমন, আনন্দিত ভাবে নিরাপদ বলে।

চটকলের শ্রমিকদিগের এক সপ্তাহের মজুরী মালিকগণ হাতে রাখিয়া দেয়। তাহার উল্লেখ করিয়া দুলাল বলে, হাতের হপ্তাটা সে পেয়েছে এখন তার ভালই কাটবে। তা' ছাড়া সে একলা মানুষ বরাবরই তার কিছু না কিছু জমে। কাজেই কষ্ট হবে কেন ?

তা' নয়, নিরাপদ যেন আরও কি বলিতে যায়। কিন্তু তখন সরকার মশাই হাকডাক করিয়া তাঁহার সঙ্গী-সাথীদের তাড়াতাড়ি চলিবার নির্দ্দেশ দিতেছিলেন বলিয়া সে আর কোনরকম কথা না কহিয়া জোরে জোরে পা ফেলিতে থাকে।

যে শ্রমিকটির হাতে লাল পতাকা ছিল সে হাঁকিয়া উঠে, চাষী-মজুর কী জয় !

আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া অমনি সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে ঐ বাণী ! লালপতাকা ও লোকের ভিড় দেখিয়া ও ঐ ধ্বনি শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া পড়ে। আশেপাশের বাড়ীগুলি হইতে মেয়েরা উঁকি

দেয়। যাহারা শ্রমিকদের কাছে আসিয়া জড়ো হয় তাহারা আবার সকলেই ইহাদের সাথে চলে। কোথায় গেলে বহু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ হইতে পারে তাহারাই তা' বলিয়া দেয়। অনেকে আবার লাল পতাকার মর্ম্ম বুঝিতে চায়। সরকার মশাই তাহা বিষদ ভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ঐটুকু একটুক্‌রা লাল পতাকার মধ্যে পৃথিবীর নিপীড়িত মানবাত্মার সংগ্রাম কাহিনী লুক্কায়িত আছে শুনিয়া লোকে অবাক হইয়া যায়। তাহারা সকলে গ্রামের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সম্মুখে শ্রমিকগণের সুসংবদ্ধ সংগ্রামের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। যাহার যা আছে, সে-ই তাহা থালা ভরিয়া আনিয়া দেয়। এমনি করিয়া যখন সমস্ত থলেগুলা ভরিয়া যায় এবং এদিকেও ট্রেনের সময় হইয়া আসে তখন সরকার মশাই নিরাপদকে ডাকিয়া বলেন, ভাই এবার আমরা চলি।

সূর্য্য তখন মাথার উপরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গ্রাম প্রান্তরের ফসলশূন্য মাঠগুলিতে চরাই করিয়া ফিরিতেছে চড়াই, ছাতার, ঘুঘু পাখীর দল। উৎকণ্ঠিত নর নারীর দল চাহিতেছে বাড়ী ফিরিতে। শীত-মধ্যাহ্নের দম্‌কা মেঠো হাওয়া মাঝে মাঝে শরীরকে কাঁপাইয়া দিয়া বহিয়া যাইতেছে দূর প্রান্তরের দিকে। চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইয়া নিরাপদ বিনীত ভাবে বলে, যাবেন না—

না ভাই বুঝতে পারছ ত সব, বলিয়া সরকার মশাই তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইয়া থাকেন। নিরাপদ হতাশ ভাবে বলে, তাহলে আর কি বলব বলুন ?

আর একদিন ত আসব বলেছি ভাই, সরকার মশাই বলেন।

নিরাপদ বলে, তবে চলুন।

তুমি আর কদ্দূর যাবে ভাই, বলিয়া সরকার-মশাই তাহাকে বাড়ী

ফিরিতে অনুরোধ করেন। নিরাপদ তবুও বলে, চলুন না ইষ্টিশান পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি—

না ভাই দরকার হবেনা, বলিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া সরকার মশাই পুনরায় বলেন, বেলা হ'য়ে গেছে—যাও খাওয়া-দাওয়া করগে।

তা'কি হয়, নিরাপদ নিজের কর্ত্তব্যবোধে একটু হাসে।

সরকার মশাই বলেন, হয়। তারপর জোর করিয়া তিনি নিরাপদকে বাড়ী যাইতে বাধ্য করেন। অগত্যা সে চলিয়া যাইবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়ায়। কি যেন একটা কথা উহাদের বলা হয় নাই বলিয়া মনে হয়—তাই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া ডাকে, দুলাল দা—অ দুলাল দা?

দুলাল থামিয়া গিয়া চাহিয়া দেখে। নিরাপদ কয়েক পা আগাইয়া গিয়া তেমনি ভাবে চীৎকার করিয়া বলে, রাধাকে একবার ব'লে দেবেন—শীগ্‌গিরই একদিন যাব।

দুলাল ঘাড় নাড়িয়া জানায়, আচ্ছা!

আরও কি বলিতে যায় নিরাপদ কিন্তু সরকার মশাই হাত নাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করেন—নিরাপদ আবার ঘুরিয়া দাঁড়ায়।

সম্মুখে কতকগুলা ছেলে তখনও দাঁড়াইয়াছিল। ইহারাও শ্রমিক-সঙ্ঘের সাহায্যভাণ্ডারের কর্ম্মীদিগের সহিত গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়াছে। এখন উহারা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ইহারাও ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। যাইবার পূর্ব্বে শ্রমিকদের নিকট হইতে শেখা "চাষী মজুর কী জয়" ধ্বনিটি ইহারা আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করে। নিরাপদকে ফিরিতে দেখিয়াই ইহারা হাঁকিয়া ওঠে—"চাষী মজুর কী জয়।" এই প্রকার ধ্বনি কেমন করিয়া আবৃত্তি করিতে হয় তাহা ইহারা জানেনা, অনভ্যস্ত কণ্ঠগুলি হইতে উত্থিত শব্দরাশি বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া যায় আগুপিছু। তবু শুনিতে ভাল লাগে। নিরাপদ সেদিকে তাকাইয়া ছেলেগুলোকে বলে, তোরা যে সব শিখে নিয়েছিস্ দেখছি।

ছেলেগুলো আবার হাঁকিয়া উঠে। তারপর সব হল্লা করিয়া বাড়ীর দিকে দৌড়াইতে থাকে। নিরাপদ পড়ে পিছাইয়া।··

দূরপথে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ছেলেগুলো মাঝে মাঝে হাঁকিয়া ওঠে, 'চাষী মজুর কী জয়!' তাহাদের দিকে তাকাইয়া নিরাপদ ভাবে, ইহা কি সম্ভব? সম্ভব হ'ক বা না অপমানিতের দল আজ যে একযোগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু গ্রাম যে আজও পদদলিত, অত্যাচারিত। এখানে কি মাথা তুলিয়া দাঁড়াবার চেষ্টা কোনদিনই হইবেনা? বাস্তবিক তাহাদের মত মেরুদণ্ডহীন মানুষ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। স্বার্থপরতা ও ভীরুতা, কলহ ও মারামারি পরস্পরের প্রতি হিংসা ও দ্বেষ, অত্যাচারিতের প্রতি এতটুকু সহানুভূতির অভাব—এইসবই যেন তাহাদের অমানুষ করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ঠেলিয়া কি মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো সম্ভব? অথচ এমনিতরোই ত ছিল শ্রমিকদের অবস্থা! ঐত দুলাল এতদিন কি অমানুষের মতই স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়াছে! কিন্তু আজ? ··জাগরণ যখন আসে তখন এমনি করিয়াই আসে, সকলদিক দিয়া মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে এক নবীন প্রেরণায়! ভগবান এমন দিন কবে আসিবে?

চলিতে চলিতে তাহার মনে পড়িয়া যায় গতকল্যকার ঘটনা। কোন্ অধিকারে জমিদারের লোক অমন করিয়া শঙ্করদের ধানগুলা লইয়া গেল? এমনি করিয়া শোষণ করাই কি পৃথিবীর রীতি? আরও তাহার মনে পড়িয়া যায় ব্রজর কথা, হীরুর কথা এবং অমূল্যর কথা। অমূল্য অভাবের তাড়নায় হত্যা করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় নাই, ব্রজ দেশ ছাড়িয়াছে এবং হীরু গিয়াছে জেলে। তারপর দক্ষিণপাড়ায় তাহার ও তাহার প্রতিবেশীগুলির কথাও বাদ দেওয়া যায় না—যেন তাহাদের যাঁতাকলে পিষিয়া মারা হইতেছে। যে দিকেই তাকানো যায় সেইদিকেই শুধু দুর্ব্বল শোষণ করার একটা অন্যায় পদ্ধতি সদম্ভে বিরাজ করিতেছে।

ক্রমশঃ নিরাপদ উত্তেজিত হইয়া উঠে। সারা জীবনের দুঃসহ যাতনা আজ যেন বাহিরে আছড়াইয়া পড়িতে চায়। চীৎকার করিয়া তাহার বলিতে ইচ্ছা করে, ওরে মরামানুষের দল···তোরা ওঠ··জেগে ওঠ···দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার রোধ কর! উত্তেজনায় তাহার ললাটে এই শীতেও ঘাম ফুটিয়া উঠে। দ্রুতপদে সে বাড়ীর দিকেই চলিতে থাকে।

দিনের পর দিন সপ্তাহ, মাস কাটিয়া যায়, প্রকৃতির ঋতু পরিবর্ত্তন হয় যথানিয়মে—তবু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ দুর্দ্দশার সমাপ্তি ঘটেনা। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত শীত ও বসন্ত একে একে আসে আর চলিয়া যায়—মানুষের অভিজ্ঞতার পাতায় লিপিবদ্ধ রাখিয়া যায় একটা বৎসরের হিসাব-নিকাশ। এই হিসাব-নিকাশ শত-সহস্র ব্যর্থতার গোপন অশ্রুজলে ভরা, আর ভরা জীবনের সুমুখপথের অসীম-অন্ধকারের নৈরাশ্যে। প্রথম দিনে জগতের আলোকময় পথে দাঁড়াইয়া মানুষের বিস্ময় কিছুতেই কাটিতে চাহেনা, তারপর যখন সে-বিস্ময়ঘোর স্বপ্নের মত হঠাৎ টুটিয়া যায় তখন মানুষ বুঝিতে পারে পৃথিবীর পথে আছে অজস্র আলো, অসীম প্রাচুর্য্য, আছে অনন্ত সুখলাভের ইঙ্গিত কিন্তু তাহার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে প্রচুর। সুরু হয় সংগ্রাম। হয়ত এই সংগ্রামের পথেই একদিন দেখা যায়, নিষ্ঠুর আঘাতে সংগ্রামরত মানুষটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তারপর শত দুঃখ-রাত্রির অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস আর হতাশার মর্ম্মভাঙ্গা ক্রন্দন হয় জীবনের সাথী। নিত্যকার এই সাথীগুলি মানুষকে জড়, পাষাণের মত স্থবির করিয়া দেয়, চেতনা শক্তিকে দেয় বিলুপ্ত করিয়া, দৃষ্টিশক্তিকে দেয় সঙ্কীর্ণপথে চালাইয়া। দুর্ব্বল অদৃষ্টবাদী মানুষ নিজের জ্বালায় নিজেই মরে চীৎকার করিয়া।

সম্মুখে আলো নাই, পথ নাই, নাই বিশ্রাম, নাই শান্তির এতটুকু আভাষ —শুধু দুস্তর মরুময় প্রান্তর চলিয়া গিয়াছে দিগন্তে বিলীন হইয়া।

অদ্ভুত এই পৃথিবী আর আশ্চর্য্য এখানকার মানুষ! আপাত-সুখের মিথ্যা আশায়, মেঘের দিকে চাহিয়া চাতকের মত মরিতে ইহারা ভালবাসে!

সংগ্রাম করিতে ইহারা যেন জানেই না। ধন্যবাদ সেই চটকলের শ্রমিকদের, যাহারা একদিন লালপতাকা লইয়া এখানে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। সংগ্রাম করিতে তাহারাই জানে!

নিরাপদ এসব বুঝিয়াছে।···

একটীর পর একটী করিয়া দিন কাটিয়া যায় তাহার স্বভাব হইয়া উঠে রুক্ষ, তিক্ততায় সারা-অন্তর উঠে বিষাইয়া। এতদিন যাহা সে চাহিয়াছে তাহা ত পায় নাই বরং যাহা কিছু ছিল সে-সকলই সে হারাইয়াছে। চাকুরী হারাইয়াছে, হারাইয়াছে সুশীলাকে, আর হারাইয়াছে সৎসাহসের উৎসটুকু!

শীত চলিয়া গিয়াছে···

প্রকৃতির প্রাঙ্গণ ঘেরিয়া নামিয়াছে বসন্ত। মধুর দক্ষিণাবাতাস গ্রামের উপর দিয়া কোন সুদূরে বহিয়া যায়, পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলের দিকে দিকে ডাকিয়া উঠে কোকিলের দল, পথের ধারে ধারে ফুটিয়া উঠে বনফুলের সারি। কোথাও কোথাও গাছের মাথার উপর দেখা যায় শুধুই সাদা আর শুধুই লাল। সুশীলাদের বাড়ীর সামনে কাঞ্চন গাছটায় এবার ফুল ফুটিয়াছে খুব, দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলাও ভরিয়া গিয়াছে ফুলে।

একটা বৎসর যেন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল!

নিরাপদ সেদিন দুপুরবেলা মাছ ধরিয়া সুশীলাদের বাড়ীর সামনেকার পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। চলিতে চলিতে এমনি এক দুপুরবেলার কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। সম্মুখে

সুবিস্তৃত চৈত্রদগ্ধ রুক্ষ মাঠগুলি, পাশে একটা আমবাগান! আমবাগানের চ্যুত আম্র মুকুলের মদির গন্ধ, বাতাসের সহিত ভাসিয়া আসিয়া প্রবেশ করে নিরাপদর নাসারন্ধ্রে, নাসিকা যেন বন্ধ হইয়া আসে। মৌমাছির দল গান ধরিয়া কেবল এদিকে-ওদিকে উড়িতে থাকে। কোথায় যেন ঝরামুকুলের বুকে সঞ্চিত মধু গোপনে রহিয়া গিয়াছে, উহারা খুঁজিয়া পায়না। এসময়টায় পল্লীগ্রামের চারিদিকেই এমনিতরো একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। নিরাপদ দাঁড়াইয়া দেখে। কিন্তু সে কি যে দেখে তাহা সেই জানে। ভিজা কাপড়ে কাঁধে ছাঁকনি-জাল লইয়া দাঁড়াইয়া থাকায় কি সুখ পায় সে?

মানুষের জীবনের দুইটা দিক; একদিক তাহার সামাজিক জীবনের বেদনা ও দুঃখ, লজ্জা ও গ্লানি, আশা ও আকাঙ্খায় ভরা, আরেকদিক ভরা নিজের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খায়। নিরাপদর জীবন কোনদিকেই তেমন উজ্জ্বল নয়। সামাজিক জীবনে আর সকলের মত সে দুঃখী, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাই। বাহিরে তাহার তিক্ততা আর অন্তরে তাহার জ্বালা! অন্তরে ও বাহিরে আজ নিরাপদর রহিয়া রহিয়া জ্বলে ধূমায়িত বহ্নি। তবু যে আশায় মানুষ জানিয়া শুনিয়াও জীবনের দুঃখরাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে কৃষ্ণবর্ণ আকাশের কঠিন আবরণের দিকে হাত বাড়াইয়া প্রার্থনা জানায়, যে-আশায় মানুষ তাহার আকাঙ্খিত দুর্লভ বস্তুটার সন্ধান জানিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া উঠে—সেই আশায় নিরাপদ সুশীলাদের বাড়ীটার দিকে তাকায়।...এই বাড়ীটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন লুকাইয়া রহিয়াছে কত বিস্মৃত-সন্ধ্যার অসংলগ্ন-প্রলাপ, একটা মধ্যাহ্নের অস্বস্তিকর দুর্ব্যবহার, এক দুরন্ত কামনা ও অবরুদ্ধ বেদনা।...তারপর...সেই নিশি-পাওয়ার রাত—ঐ কাঞ্চন তলায় বসিয়া বসিয়া অঝোরধারায় কান্না।...হায় ভগবান আর একটাবার সে তেমন করিয়া কাঁদিতে পারেনা?...হঠাৎ নিরাপদর চক্ষুদুইটা ছল ছল করিয়া

উঠে আরেকটী সন্ধ্যার কথা স্মরণ করিয়া। এতবড় ঘটনা এই বাড়ীটাকে কেন্দ্র করিয়া আর কখনও ঘটে নাই।

সেদিন সে রাধার বাড়ী খুঁড়িগাছি গিয়াছিল। তাহার মনে পড়ে সেই হাটে যাওয়ার রাত—গরুর গাড়ী চাপিয়া বনমালীর সাথে শেওড়াফুলী আসার কথা। সেই সারি সারি গাড়ী চলা, জোনাকির মিছিলের মত গাড়ীর নীচে লণ্ঠন-জ্বালা, গরুগুলার গলার টিং টিং করিয়া ঘণ্টা-ধ্বনি! উপরে রাত্রির অন্ধকারময় আকাশে মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে অসংখ্য নক্ষত্র। শীতরাত্রির কন্‌কনে হাওয়া বহিতেছিল হু হু করিয়া। সকাল বেলা পৌছিল হাটে। তারপর সেখান হইতে সে গেল খুঁড়িগাছি। খুঁড়িগাছিতে তখন রাধা ছিল না কি একটা যায়গায় নীলকণ্ঠপুর না কি নাম, সেখানে গেছে। তখনও তাহাদের ষ্ট্রাইক পূরাদমে চলিতেছে। তাই কোন একটা কাজের উদ্দেশ্যে সে নীলকণ্ঠপুর গেছে। নীলকণ্ঠপুর কোনদিকে তাহা নিরাপদ জানিত না। তাই সে দুলালের খোঁজ করিল। দুলাল তখন সাহায্য-ভাণ্ডারের কাজে ভয়ানক ব্যস্ত তাহারও দেখা মিলিল না। অগত্যা নিরাপদকে ফিরিতেই হইল। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। বনমালী ও সব কলা বিক্রেতার দল গাড়ী লইয়া বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গিয়াছে। তখন ট্রেণ ভিন্ন রতনপুরে ফিরিবার আর কোন উপায় নাই। ট্রেণে করিয়া সিঙ্গুর ষ্টেশনে আসিয়া হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল মাঠের পথ দিয়া সে হাঁটিয়া হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিবে।

মাঠের পথ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূব দিককার জলা পার হইয়া এক সময়ে গ্রামের পথে আসিয়া উঠিল। খানিকটা আসিতেই সুশীলাদের বাড়ী। বাড়ীটার সামনে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিন্তু

বাড়ীটার দিকে তাকাইতেই সেদিন সে এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখিল। সুশীলারা চলিয়া যাইবার পর হইতে বরাবরই বাড়ীটার দরজায় তালা লাগানো থাকিত—কিন্তু সেদিন কি জানি কেন খোলাই ছিল। ইহা দেখিয়া নিরাপদর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তবে কি এতদিনে তাহার সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। নিশ্চয়ই সুশীলারা ফিরিয়াছে এবং দরজার তালা খুলিয়াছে। বুকের মধ্যে হৃদ্পিণ্ডটা তাহার রহিয়া রহিয়া কাঁপিতে লাগিল। শরীরের প্রতিটী শিরায় নাচিয়া উঠিল রক্তধারা। কম্পিত পদে সে আগাইয়া গেল দরজার দিকে। জীবনে অনেকবার সে অনেক কিছু আশা করিয়াছে কিন্তু কিছুই সফল হয় নাই এবং সে জানে তাহার অন্তরের সকল আশা আকাঙ্খার মূলে কেমন একটা ব্যর্থতার খোঁচা রহিয়া গিয়াছে। তাই পাছে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে সেই আশঙ্কায় সে হৃদয়ের সবটুকু চাঞ্চল্যকে সংযত করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজায় ঠেলা মারিল। অনেক দিন বন্ধ থাকায় দরজার কব্জাগুলায় মরিচা পড়িয়া গিয়াছিল বোধহয় তাই দরজাটা বেশী খুলিল না। ইহার পর নিরাপদ আরও একটু জোরে ধাক্কা দিল, আরও খানিকটা খুলিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া সে তাকাইল ভিতরের দিকে। কোথাও কিছু নাই, বাড়ীটার উঠানখানা শুধু সন্ধ্যার অন্ধকারে খাঁ খাঁ করিতেছে। তবে কি সুশীলারা আসে নাই? পাঁচুখুড়োত আজকাল কালীদের বাড়ীতেই থাকে। এমনিতরো নানা রকমের কথা চিন্তা করিতে করিতে সে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকটা দেখিতে লাগিল। অতর্কিতে একবার তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, সু-শী-লা?

কোথায় সুশীলা আর কেই বা তাহাকে উত্তর দেবে? নিজেরই কণ্ঠস্বরে নিজে লজ্জিত হইয়া আরও কয়েক পা আগাইয়া গেল দুয়ারের কাছে। তাকাইয়া দেখিল ঘরের দরজা খোলা আছে কিনা। দরজা

কি পাঁচুর ইহাই একমাত্র কাম্যবস্তু ছিল? তারপর বনমালী ও নিরাপদর নিজের কথা। যদি প্রতিবেশী কাহারও স্ত্রী কাহারও দ্বারা অপহৃত হয় তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাহাদের কি করা উচিত? পাঁচুর সংসারে যখন এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল তখন বনমালী ও নিরাপদর কি উচিত ছিলনা পাঁচুর এই দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া? অবশ্য মৌখিকভাবে সান্ত্বনা দেয় নাই তাহা নয় কিন্তু এক্ষেত্রে মৌখিক সান্ত্বনাইত সব নয়। পাঁচু তাহার নিজের জীবনের এই কলঙ্কময় দুর্ঘটনাকে উপেক্ষা করিয়াও কতদিন শুধু একা একা স্ত্রী ও কন্যার খোঁজ করিয়া বেড়াইয়াছে। বেশী হৈ চৈ করিতে লোকটা কোনদিনই ভালবাসিত না, তাই সেকথা সে কাহাকেও তেমন ভাবে জানায় নাই কিন্তু এই সময়ে কি তাহাদের উচিত ছিলনা বেচারীকে এতটুকুও সাহায্য করা? ইচ্ছা করিলেই তাহাদের কেহ না কেহ ইহা করিতে পারিত। অথচ দেখা যাইতেছে কেহই ইহা করে নাই। তাহাদের সকলের এই রকম খানিকটা ছাড়া ছাড়া ভাব দেখিয়া পাঁচুর ত মন ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে। সকল মানুষেরই যে এসব সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে এমন ত নয়। তাহা ছাড়া জীবনের বাকী দিনগুলি যাহার প্রতিনিয়তই এই একই খোঁচা ফিরিয়া ফিরিয়া লাগিবে, মরণকে আলিঙ্গন করা ছাড়া তাহার আর উপায় কি? তাই সে হতভাগ্য লোকটা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। তাহার এই মৃত্যুর জন্য প্রতিবেশী আর কেহ নিজেকে দায়ী করুক বা না করুক কিন্তু নিরাপদ করে।

আরও একটা কথা আজকাল নিরাপদর মনে পড়ে। সুশীলাকে ভালবাসে বলিয়া মনে মনে তাহার বেশ একটু গর্ব্ব ছিল কিন্তু সুশীলার এই বিপদের দিনগুলিতে কি একটী দিনের জন্যও সে তাহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে? সে কেবল নিশ্চেষ্টভাবে আপনার মনে মনে আশা করিয়াছে, যেন সুশীলা ফিরিয়া আসে। হায়রে এই কি ভালবাসা?

প্রণয়িনীর বিপদের দিনে দূরে সরিয়া থাকিয়া যে কেবল বিপদের ঝড় কাটিয়া যাইবার অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, সে কি সত্যই তাহার প্রণয়িনীকে ভালবাসে? ইহাত ভালবাসা নয়। যাহারা শুধু নারীর দেহেরই যাচ্না করে এরকম করিবে তাহারা, কিন্তু নিরাপদ কি ঠিক সেইরকম চোখে দেখে স্থশীলাকে? তাহা ত নয়। কিন্তু কেমন করিয়া কোথা দিয়া যেন কি একটা ঘটিয়া গিয়াছে। হয়ত কোথাও কোন পাশব প্রবৃত্তির সম্মুখে স্থশীলার তিলে তিলে সমাপ্তি ঘটিতেছে, হয় ত সে মুক্তির জন্য প্রাণপণ চীৎকার করিতেছে কিন্তু তাহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করিবার কেহ্ নাই। লঙ্কাধিপতি রাবণের অশোকবনে বন্দিনী সীতাদেবীর আকুল ক্রন্দন ব্যর্থ হইয়া যায় নাই, কারণ সেখানে রামচন্দ্র ছিলেন। নিরাপদ কি ইহা দেখিয়াও শিখিবে না তাহার কি করা উচিত ছিল? রামচন্দ্র যদি কুণ্ঠিতা সীতাদেবীর প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় বসিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি সীতাদেবীকে কোনদিনই ফিরিয়া পাইতেন না। নিরাপদর আজকাল তাই মনে হয় সারাজগত যেন তাহাকে ধিক্কার দিতেছে।

কিন্তু এই ছি ছি যে তাহাকে শুনিতেই হইবে। স্থশীলা বিধবা এবং যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজে বিধবাকে ভালবাসিবার কোন অধিকার নাই। স্থশীলাও এই ধিক্কার পাইবে। কাজেকাজেই হৃদয়ের গোপন-প্রেমের নীরব পূজা কেমন করিয়া লোকচক্ষে আনিবে? তাই সে স্থশীলার জন্য অতখানি ব্যস্ততা দেখাইতে ভয় পায়। এ ভয় তাহার ভালবাসার পবিত্র নীতির উপর আঘাতের ভয়। মানুষ দেহের উপর শত আঘাত সহ্য করিতে পারে কিন্তু ভালবাসার উপর, প্রেমের উপর কোন আঘাত সহিতে পারে না। সংসারে কোন কোন মানুষ ভালবাসিয়া আদৌ প্রকাশ করে না, কোন কোন মানুষ ভালবাসিয়া আঘাত পাইলে ভাঙিয়া পড়ে, আবার কোন কোন মানুষকে দেখা যায়

আঘাতের উদ্যত ফণা প্রতিরোধ করিয়া অজেয় ও অমর হইয়া গিয়াছে। নিরাপদ ভাঙিয়াও পড়ে নাই অজেয় হইবারও চেষ্টা করে নাই—শুধু সে প্রেমের অপ্রকাশ্য ব্যথায় ও আনন্দে ভরপুর।

তাই নিরাপদ কোনদিন ভাবে নাই যে ইহারই জন্য তাহার পাঁচুখুড়ো মারা যাইবে এবং ইহারই জন্য প্রকাশ পাইবে সুশীলার প্রতি তাহার জঘন্য লোভ। যদি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিত তাহা হইলে কখনই সে এমন হইতে দিত না। চলিতে চলিতে নিরাপদ স্থির করিতে থাকে, এবার সে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে আরেক প্রান্ত সুশীলাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে! যেমন করিয়া হউক তাহাকে সে উদ্ধার করিয়া আনিবে। মিছে এই লোকলজ্জা, নিন্দা গ্লানির ভয়, মিছে এই সমাজ! এসকলকে উপেক্ষা করিবে সে, উপেক্ষা করিবে এই সব অতিরঞ্জিত ভূতের ভয়কে। চলার পথে যতই তাহার দিন কাটিতেছে ততই সে দেখিতেছে অপরিসীম অক্ষমতা। মানুষকে এই সমাজ খাইতে দিতে পারে না মানুষকে করে না রক্ষা, উন্নত নৈতিক আদর্শ ধরে না লোকের সম্মুখে—এ সমাজ নিত্যদিন কেবলই আঘাত করে দুঃখ দেয়, নীচে নামাইয়া লইয়া যায় টানিয়া টানিয়া। তবুও কি ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে? উত্তেজিত ভাবে নিরাপদ পথ চলে। অন্তরে বুঝি জাগিয়া উঠে যুগ-যুগান্তরের সুপ্ত মানুষ, বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসা বহু অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার করে স্পর্দ্ধা। এতদিন শুধু নিজকে সে পৃথিবীর প্রবহমান স্রোতধারা হইতে দূরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছে, সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে নব-যুগের জাগ্রত আত্মাকে, ভয়ে ভয়ে মানিয়া লইয়াছে জীর্ণ সমাজের নির্ব্বিচার বন্ধনরজ্জুকে! কিন্তু আর কতকাল সে এমনি করিয়া নিজেকে ফাঁকি দিবে?

বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই নিরাপদ দেখিতে পায়—রাধা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। নিরাপদ বিস্মিত হইয়া যায়। যে রাধা কোন দিন

গ্রামে আসিতে চাহে নাই সে আজ হঠাৎ আসিয়া পড়িল কেন? অজানা আশঙ্কায় মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়া আসে। পায়ের শব্দ পাইয়াই রাধা নিরাপদর দিকে তাকায়। কাঁদন বুঝি রান্নাঘরে ছিল, বাহিরে আসিয়া পড়ে। নিরাপদ পর পর দুইজনের দিকে তাকাইয়া লইয়া রাধার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করে, হঠাৎ এসে পড়লি যে?

রাধা অল্প একটু হাসিয়া উত্তর দেয়, আসতে যখন হয় দাদা তখন হঠাৎই হয়।

কেন, নিরাপদ বলে।

রাধা বলে, যে নৌকার নোঙর ছিঁড়ে যায় দেখেছো তার অবস্থা? জোয়ার-ভাঁটার টানের সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেখানে-সেখানে ভেসে বেড়াতে হয়—

নিরাপদ রাধার হেঁয়ালী বুঝিতে পারে না। রাধা নিরাপদর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। নিরাপদ জিজ্ঞাসুভাবে তাকায় কাঁদনের দিকে। কাঁদন বলে, ওর চাকরী গেছে—শুনিয়া নিরাপদ মর্ম্মাহত হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে, তারপর?

তারপর আর কি, অস্ফুটস্বরে রাধা বলে, এখন যেখানে সেখানে ভেসে বেড়ানো!

—কেন শুনিছিলুম ত তোদের ষ্ট্রাইক যখন মেটে তখন কাউকে অযথা কাজ থেকে জবাব দেওয়া হবে না ব'লে ঠিক হয়েছিল?

—তা হয়েছিল বটে কিন্তু মালিকরা কবে, কোথায় কথা রেখেছে দাদা? ষ্ট্রাইক ভেঙে দিয়ে যখন আমরা সবাই কাজে যোগ দিলুম তখন ভেবেছিলুম বোধহয় আর কোনদিন আমাদের ওপর কোন অত্যাচার হবে না কিন্তু এক হপ্তা পেরুতে না পেরুতে এমন জুলুম আরম্ভ হ'য়ে গেল যে তার সীমা পরিসীমা নেই। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন আমার চাকরীর জবাব হ'য়ে গেল!

—অপরাধ ?

—অপরাধ আবার কি ? যাদের ঘরে ভাত নেই হুকুম তামিল করবার জন্যে শুধু যাদের জন্ম তারা চোখ রাঙাবে—যারা দয়াকরে দুটী খেতে দেয়, যারা প্রভু, সেই ক্রোড়পতি মালিকদের ?

—কিন্তু এসবের কি একটা উপায় হয় না ?

উপায় ? রাধা একবার কাঁদনের দিকে তাকাইয়া লয়। তারপর বলে, উপায় হয় দাদা, যদি আবার আমরা এই রকম কাজ বন্ধ ক'রে দিতে পারি কিন্তু তা' আর হবে না। প্রথমে যেমন আমরা সব পণ করে লেগেছিলুম আর তেমন পণ করে লাগবার সামর্থ্য নেই আমাদের। সবাই দেখেচি কাজ বন্ধ ক'রে থাকার কি কষ্ট ! তবু হ'ত, যদি আমরা মালিকদের ধাপ্পায় না পড়ে যেমন ষ্ট্রাইক চালিয়ে যাচ্ছিলুম তেমনিই চালিয়ে যেতুম তা'হলে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ কিছু করতে পারত না। কিন্তু কাজে লেগে গিয়ে আমরা আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেচি। আমরা আজ অল্প একটু সুখের আশায় প্রত্যেকেই লেগে থাকার ক্ষমতাটুকু হারিয়েছি। আবার চট্ ক'রে অতখানি কষ্টের মধ্যে গিয়ে পড়তে আমরা নারাজ ! তাই আজ মাথা তুলে বলবারও ক্ষমতা নেই আমাদের। এসব কাজে একবার একটুখানি সরে এলে আবার ভালভাবে এগিয়ে যাওয়া শক্ত হ'য়ে পড়ে।

তা' বটে, বলিয়া নিরাপদ কাঁধের জালটা নামাইয়া দুয়ারের একপাশে রাখিয়া দেয়। কাঁদন তেল গামছা আনিয়া নিরাপদর সামনে রাখিয়া দিয়া বলে, যাও ঠাকুরপো চান করে এসো শীগ্‌গির—বেলা পড়ে এল !

হ্যাঁ যাই, বলিয়া নিরাপদ দুয়ারের উপর বসিয়া পড়ে। তেলের বাটী কাছে টানিয়া লইয়া রাধাকে জিজ্ঞাসা করে, তারপর এখন কি করবি ঠিক করেচিস রাধা ?

—কিছুই ঠিক করিনি।

—তবু ?

—দেখি কি করা যায়।

—কেন তুই গ্রামে থাক্‌না ?

—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাই থাকব কিন্তু এখানেই বা কি নিয়ে থাকব ? মানুষকে বাঁচতে হলে ত তার জীবন ধারণের একটা উপায় থাকা দরকার ?

—সে ত বটেই।

—তবে ?

—যাহোক্ একটা এর পর দেখে নিস'খন। এখন তো আছিস্ এখানে দিনকতক ?

—না আমি ঠিক এখানে থাকব ব'লে আসিনি। একটা দরকারে হঠাৎ আসতে হ'ল !

এখানে রাধার আবার কিসের দরকার ? নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে। রাধা বলে, তুমি নেয়ে এসো তারপর বলব !

—বলনা কি দরকার।

—নেয়ে এসো আগে—বেলা প'ড়ে এসেছে।

রাধার আকস্মিক আগমনে নিরাপদ বিস্মিত হইয়াছিল এবং ভয়ও পাইয়াছিল। আকস্মিক ঘটিয়া যাওয়া যে কোন ঘটনাকেই সে চিরকাল ভয় করিতে অভ্যস্ত। সত্যই দুঃখীমানুষের জীবনে আকস্মিক কোন ঘটনাই শোভন নয়। কে জানিয়াছিল যে রাধার এই আকস্মিক আগমনের পিছনে তাহার চাকরী যাওয়ার মত এমন একটা মর্ম্মান্তিক ইঙ্গিত আছে ? কিন্তু নিরাপদ ঠিক ভাবে এতখানি না জানিলেও খানিকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছিল। এই বুঝিতে পারা অবশ্য ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার বুঝিতে পারা নয়—জীবনের অতীত দিনের অভিজ্ঞতায় যে অনুমান করা সম্ভব, ইহা তাই। তাহার এই অনুমান যে মিথ্যা নয় তাহা রাধার

চাকরী যাওয়ার কথা শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখন রাধা কি করিবে, কোথায় থাকিবে? এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে নিরাপদ স্নান করিবার জন্য উঠিয়া পড়ে।

—কাঁদন বলে, শীগ্‌গির এসো।

আচ্ছা, বলিয়া নিরাপদ বাহির হইয়া যায়।

রাধা এই গ্রামেই মানুষ। জাহানাবাদ হইতে সেই যে কবে এক বর্ষার দিনে তাহার দাদা মা-ও বাবা তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছিল, তারপর হইতে দিনগুলি এইখানেই কাটে। এইখান হইতেই তাহার বিবাহ হয়, এইখান হইতেই সে শ্বশুর বাড়ী যায়। তারপর জীবনে যে কত ঝড়ঝাপ্‌টা বহিয়া গেল, কে তাহার হিসাব রাখে। কাঁদন সুশীলা তাহার বান্ধবী—ইহাদের সহিত মনের কত গোপন কথা সে আলোচনা করিয়াছে, আকাশে নির্ম্মাণ করিয়াছে সুখের কত সৌধ, জীবনে বিচ্ছেদ হইবে না বলিয়া কতবার পণ করিয়াছে সবাই। কিন্তু সে সবই আজ স্বপ্ন! আজ এই বান্ধবীদের মধ্যে কেহই আর কাহারও নয়, তিনজনের পথ তিনদিকে।

কিন্তু আজও সে বান্ধবীগুলিকে ভুলিতে পারে নাই এবং তাহারই সাথে সাথে ভোলে নাই এই গ্রামখানিকে। সেই সবুজ-ওড়না পরিহিতা মেয়েটীর মত বসন্তের গ্রামখানি আজও তেমনিই আছে। সেই বিস্তীর্ণ, ধূ-ধূ করা মাঠ, বাঁশের বনে চৈতালী-বাতাসের শিশু-জনোচিত মাতামাতি, দূর-অরণ্যের পারে কোকিলের কুহুধ্বনি, মধ্যাহ্ন বেলার প্রকৃতি জুড়িয়া অলসতন্দ্রাঘোর—সবই রহিয়াছে যথারীতি, কিন্তু কে জানে এখানকার মানুষগুলি ঠিক আছে কিনা! যদি সে এখানে থাকিতে চায় তাহা হইলে ইহারা তাহাকে একটুখানি স্থান দিবে কি!

দিনান্তে ক্লান্ত সন্ধ্যা নামে। নিরাপদ স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসে।

কাঁদন দুয়ারে কাপড় রাখিয়া রান্নাঘরে চলিয়া যায়। দুয়ারের

একাংশে তালপাতার আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া নিরাপদকে দেখাইতে নিরাপদ খাইতে বসিলে রাধা গিয়া একদিকে বসে।

রাধা কি যেন একটা কথা বলিবে তাই নিরাপদ মন দিয়া আহার করিতে পারে না। মাঝে মাঝে সে রাধার দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকায়। কাঁদন রান্না ঘরের আগড়ের নিকট দাঁড়াইয়া বলে, ঠাকুরপো খেয়ে দেয়ে একবার তোমার দাদাকে দেখ্‌তে পার? সেই ভোরবেলা কাজে বেরিয়েচে এখনও এলোনা—

তাই নাকি, নিরাপদ চিন্তান্বিতভাবে প্রশ্ন করে।

কাঁদন বলে, হ্যাঁ—খেতেও আসেনি।

—কেন বল দিকি?

—কি জানি।

ইহাও আবার এক ভয়ের কথা। নিরাপদ বলে, আচ্ছা খেয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর সে চুপ করিয়া আহার করিতে থাকে।

রাধা দাদার এই নীরবতা লক্ষ্য করিয়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া বসে। তারপর ধীরে ধীরে বলিয়া উঠে, দাদা একটা কাজ করবে?

নিরাপদ রাধার দিকে তাকায়। রাধা বলে, কাজ অবিশ্যি এমন কিছু নয়।

কি, অস্ফুট স্বরে নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে। রাধা পিছন দিকে তাকাইয়া দেখে, রান্নাঘরের দরজার নিকট হইতে কাঁদন তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। রাধা যাহা বলিবে তাহা আগেই সে শুনিয়া রাখিয়াছে কিন্তু তবুও আবার সে শুনিতে চায়। রাধা বলে সুশীলার ওখানে একবার যাবে?

নিরাপদ চমকাইয়া ওঠে। ভাতের গ্রাস ফেলিয়া রাখিয়া সে বলিয়া উঠে, সুশীলা—সুশীলা কোথায় আছে রাধা?

—নীলকণ্ঠপুরে।

নোঙরহীন নৌকা

—নীলকণ্ঠপুরে ?

—হ্যাঁ সেখানেই তাকে অঘোর নিয়ে গেছে।

তারপর—তারপর, উত্তেজিতভাবে নিরাপদ বলিয়া উঠে।

তারপর আর কি পরেশ ঠাকুরের পাল্লায় প'ড়ে তিলে তিলে সে জীবন দেবার চেষ্টা করছে, বলিতে বলিতে রাধার চক্ষু দুইটা ছল ছল করিয়া উঠে।

পরেশ ঠাকুর—পরেশ ঠাকুরের পাল্লায় প'ড়ে, ভাল করিয়া নিরাপদ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কম্পিত কণ্ঠে রাধা বলিতে থাকে, পরেশ ঠাকুরই তাকে দিয়ে পয়সা উপায় করবার চেষ্টা করছে···

—বলিস কি ?

রাধাও ভাল করিয়া বলিতে পারে না, কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া আসে। নিজ জীবনে সে দেখিয়াছে ও-পথের কি জ্বালা! পূতিগন্ধময় নরকের মাঝে দিনগুলি যে কি বীভৎসতার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। কতদিন শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছে, হে ঠাকুর কোন শত্রুকেও যেন এ অবস্থায় ফেলিওনা! ইহার পরেও সে সুশীলার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? সমবেদনায় বুকের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠে।

নিরাপদের ভাতের থালা যেমন ছিল ঠিক তেমন ভাবেই পড়িয়া থাকে। ক্রোধ নয়, আকর্ষণ নয়, কি যেন একটা শক্তি নিরাপদকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। হয়ত বা সে বিস্ময় নয়ত বা আরও অন্য কিছু। তবু—তবু সে জ্ঞান হারায় নাই। সহজ মানুষের মতই সে বলিয়া উঠে, পরেশ ঠাকুর ত ফেরার—সুশীলা গেল কি ক'রে সেখানে ?

—সে-ইত সন্ন্যাসী সেজে এসে সুশীলাকে নিয়ে গেছে!

—পরেশ ঠাকুর সন্ন্যাসী ?

হ্যাঁ। ওখান থেকে ফেরার হবার পর সে সামনের দাঁত ক'টা বাঁধিয়ে নেয়, মাথায় লাগায় জটা, গেরুয়া বসন পরে হয় সন্ন্যাসী, একহাতে কি একটা গাছের শিকড়ে তৈরী সাপের মত আঁকা বাঁকা লাঠি, আর এক হাতে কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হঠাৎ একদিন পলাশপুর ব'লে এক গ্রামে যায়। সেখানে এক বুড়ীকে ঠকিয়ে তার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে। তারপর একদিন এক শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেললে। শিবের এক নাম নীলকণ্ঠ। তার জন্যে ঠাকুরের নাম হ'ল নীলকণ্ঠ ঠাকুর। নীলকণ্ঠ ঠাকুর খুব জাগ্রত—একথা কাগজ ছেপে বিলি ক'রে দিয়ে, খবরের কাগজে তুলে দিয়ে, সবাইকে জানিয়ে দেয়া হ'ল। কিন্তু তুনিয়ায় সবাই ত আর ভাল লোক নয় যে ধর্ম্মপথে তারা চলবে। কিন্তু খারাপ লোকদের শুধু নির্জ্জলা ধর্ম্মের টানে আনা যায় কি ক'রে? তাই সন্ন্যাসী ঠিক করলে মন্দিরের চারিদিকে সব বেশ্যাদের এনে বসানো হোক। লোকে অন্ততঃ এদের টানে এখানে আসবে, মন্দিরের আয় বাড়বে। আর তা ছাড়া যেসব বেশ্যাদের আনা হবে, তাদেরও কাছ থেকে বাড়ী ভাড়া হিসেবে, তাদের আয়ের ওপর ভাগ বসিয়ে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। তাই দেখতে দেখতে সন্ন্যাসী ঠাকুর সমস্ত গ্রামখানাই প্রায় কিনে ফেললে। হাতে ত আর টাকার অভাব ছিলনা, মদ চোলাই ক'রে অনেক টাকা সে উপায় ক'রেছে। তারপর বাজার হাট বসল, চারিদিকে ছোট ছোট চালাঘর ছেয়ে দেয়া হ'ল। দেখতে দেখতে মতলব মাফিক কাজও হ'তে লাগল। সমস্ত গ্রামখানাই সন্ন্যাসীর নিজের হ'য়ে গেছল ব'লে পলাশপুরের নাম বদলে দিয়ে নীলকণ্ঠঠাকুরের নামে সে গ্রামের নাম রাখলে নীলকণ্ঠপুর ··, কথাগুলি বলিয়া রাধা আরও যেন কি বলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা থামিয়া লয়।

নিরাপদ এত কথা শুনিতে চাহে নাই। তাই অসহিষ্ণুভাবে সে প্রশ্ন করিয়া উঠে, কিন্তু সুশীলাদের তার দরকার হ'ল কেন?

রাধা বাসাতে থাকে, তার মানে আছে। এটা কতকটা সুশীলার মায়ের জন্যে হয়েছে। তারপর বাদ বাকী পরেশ। অনেক দিন ধরেই সুশীলার মা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু অঘোর ঠিক সুযোগ পাচ্ছিলনা ব'লে তাদের পালানোটা ঘটে উঠছিলনা। এই সুযোগটা ক'রে দিয়েছিল পরেশ। পরেশের নীলকণ্ঠপুর নতুন জায়গা ব'লে বেশ্যার দল আসতে চাইছিলনা—কে জানে সেখানে যদি তাদের পসার না জমে! ওরি মধ্যে দু'চারজন যারা এসেছিল তাদের নিয়ে ত আর কাজ চলেনা। তাই পরেশ তার বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল প্রত্যেককে নীলকণ্ঠপুরে চাকরী বাকরী, জমিজায়গার লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে মেয়ে চুরি ক'রে আনবার জন্য জানিয়ে দিলে। অঘোর শুধু সুশীলার মাকে নিয়েই চ'লে যেত কিন্তু দেখলে সুশীলাকে নিয়ে যেতে পারলে যদি পুরস্কারটা বেশী হয় ত মন্দ কি? তাই সে পরেশকে খবর দিলে। তারপর ব্যস্, সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সুশীলাকে খানিকটা বিশ্বাস করিয়ে দিয়ে একেবারে সবসুদ্ধু নিয়ে অঘোর চলে গেল···

নিরাপদ কাঁদনের দিকে তাকায়। দেখে কাঁদন আঁচলে চোখ মুছিতেছে। এতক্ষণ একটা উত্তেজনার জন্যই নিরাপদর চোখে বোধ হয় জল আসে নাই। এবার সে আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠে, দেখলে বৌঠা'ন আমি যা' ভেবেছিলুম তাই হ'য়েছে। তারপর ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিয়া পড়ে। উঠানে নামিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠে, উঃ! ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে টাকা রোজগার করবার জন্য মানুষ এত নীচ কাজও করতে পারে!

একথা কি তুমি আজ জানলে দাদা? কোথায় নেই এসব? হতভাগিনী আমি—আমাকে ঘুরতে হয়নি এমন জায়গা নেই। চেয়ে ছাখো দিকি একবার কালীঘাটের কালীমন্দিরের আশে পাশে, চেয়ে ছাখো দিকি তারকেশ্বর বাবা তারকনাথের মন্দিরের চারদিকে,

কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের দেশে। কোথায় নেই এসব? যেখানেই ধর্ম্মের যত জাঁকজমক তারই আশে পাশে, এই অনাচার, এই অত্যাচার! কে বা কারা এসব করতে যায়—তুমি না আমি? বলিয়া রাধা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে নিরাপদর মুখের দিকে তাকায়।

নিরাপদও তেমনিভাবে তাকায় রাধার মুখের দিকে।

শুধু কি এই—এমনি ধারা কত জায়গা রয়েছে, বলিয়া রাধা তার অন্তরের জ্বালাটুকু প্রকাশ করে। নিরাপদ বলিয়া উঠে, পরেশের নামে আমি আদালতে নালিশ ক'রব!

বৃথা চেষ্টা দাদা, রাধা বলে, আজ পরেশ আর সেই পরেশ নেই, এখন সে সদানন্দ স্বামী। পুলিশের বড় বড় চাকুরে এসে তার কাছে মাথা নুইয়ে যায়, তারা সবাই তার শিষ্য। সেখানে তুমি তার কি করতে পার? তার চেয়ে বরং এক কাজ করো সুশীলাকে যদি ফিরিয়ে আনতে চাও তাকে ফিরিয়ে আনো। সে আসতে চায়—

সুশীলা আসিতে চায়! এইবার নিরাপদকে তাহার দুঃসাহস ও কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় দিতে হইবে। কিন্তু সে ইতিপূর্ব্বেই ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। প্রয়োজন নাই তাহার অন্য কিছু ভাবিবার। সে সুশীলাকে ফিরাইয়া আনিবেই। কিন্তু হঠাৎ সে নির্ব্বোধের মত রাধাকে এক প্রশ্ন করিয়া বসে। বলে, তোর সঙ্গে বুঝি তার দেখা হ'য়েছিল?

তা নাহ'লে এতকথা বলছি কি ক'রে, বলিয়া রাধা তাহার ও কাঁদনের দিকে তাকায়।

নিরাপদ বলিয়া উঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ তা' বটে···তোদের স্ট্রাইকের সময় তুই যে নীলকণ্ঠপুরেই ছিলি! তা' সুশীলা কি বললে?

সে বললে তোমরা তাকে মাপ কোরো। আর যদি সত্যি সত্যিই তাকে মাপ করতে পারো ত তাকে ফিরিয়েও এনো। এই তার একমাত্র ব্যথা।

কাঁদন সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠে, আহা আ!

কিন্তু বৌদি, কাঁদনকে উদ্দেশ করিয়া রাধা বলে, আমি ভেবেছিলুম ওর মা'টা সত্যি সত্যিই বদমাইস কিন্তু তা' নয়। সেও ফিরে আসতে চায়! তবে সে বলে, ঘরে ফিরেই বা সে কি করবে—বাইরে যে জ্বালায় ভুগছে ঘরেও তো তার সেই জ্বালা। যে মেয়ে উপযুক্ত স্বামী পায়নি সে কি করবে বলত? সে আমায় বলে, কটা মেয়ে বুড়ো স্বামী নিয়ে ঠিকভাবে ঘর করতে পেরেছে বলত? মেয়ে মানুষ ব'লে কি আমাদের জীবনে কোন সাধ আহ্লাদ নেই?

কাঁদন বলে, কিন্তু ওভাবে তার বেরিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।

সেকথা আমিও বলি, রাধা বলে, কিন্তু কি-ই বা আর করবে সে? অনেক মেয়েকেই ত দেখছি ভাই—সবাই, সবাই-ই এই কথা বলতে চায়। সকলের এই কথাটার পেছনে কি এতটুকু সত্যি নেই!

তা' আমি বলছিনা, কাঁদন বলে।

রাধা বলে, এছাড়া বলবারও কিছু নেই ভাই।

নিরাপদ ফিরাইয়া আনিবে সুশীলাকে। যদি আর কেউ না চায় তবে সে একাই পারিবে। গাড়ু হাতে লইয়া চিন্তিতভাবে সে আঁচাইতে যায়। আচানো হইয়া গেলে গাড়ুটাকে একদিকে রাখিয়া দিয়া সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যাবেলায় কি জানি কেন সে একবার আকাশের দিকে তাকায়। হয়ত কোন দেবতার উদ্দেশ্যে কোন কিছু প্রার্থনা জানায়, নয়ত ঐ আকাশে গাঢ়নীলিমার দিকে তাকাইয়া চলিবার কোন ইঙ্গিত আশা করে। তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠে, আমি যাব—যাব, সুশীলাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে যাবই···

পিছন হইতে কে যেন তাহার কথাটাকে সমর্থন করিয়াই বলিয়া উঠে, চল্ চল্ যেতেই হবে—চল্!

সহসা সকলেই সেদিকে দৃষ্টি ফিরায়। বনমালী আসিতেছে এবং

মনে হয় যেন তাহার সাথে সাথে আরও কাহারা আসিতেছে। বনমালী বলে, নীচু হয়ে ভাই!

আগে আসে বনমালী, বনমালীর পিছনে কালী ও গোপাল, শশী আর বিপিন আসে ওদেরই পিছন পিছন। পাঁচু বাঁচিয়া নাই—তাহা না হইলে কলাবাগানের সব দিনমজুরগুলিকেই এখানে দেখা যাইত।

উহারা আসিয়া সব দাওয়ার একদিকে বসিয়া পড়ে। বনমালী বলে, নীরো কোথায় যে যাবি বল্‌ছিলি—চ'না চ'লে যাই···অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বনমালীর! কি বলিতে চায় সে?

সব যেন কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া ঠেকিতেছে নিরাপদর। কই, কর্ম্মান্তে কোনদিন ত সকলে দল বাঁধিয়া এমন করিয়া এ বাড়ীতে আসে নাই? কে জানে আজ কি ঘটিয়াছে!

বনমালী পাগলের মত একপ্রকার হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠে, এই দক্ষিণপাড়ায় আশুবাবুর বড় একটা প্লট জমি তৈরী হবে—তাই আমাদের বাস উঠিয়ে দিতে হবে কাল থেকেই!

এঁ্যা! সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমনভাবে হতচেতন হইয়া যায় নিরাপদ ঠিক তেমনি ভাবেই যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকে। তবে কি এই জন্যই বনমালীর কাজ হইতে ফিরিতে এত দেরী হইল?

বনমালী আবার বলে, বাড়ীটা ছিল একটা ঝঞ্ঝাট ছিল। তিনমাস আগেকার একটা তারিখ দিয়ে আগে আমায় সই করিয়ে নিলে, তারপর বল্‌লে—দেনা ত তুই শুধতে পারবিনা বনমালী তাই তোর বাড়ীটা ঐ টাকাতেই আমরা নিয়ে নিলুম, পরে যেন তাই-ই তুই মত করলি আর এই জন্যেই সইটা নেয়া হ'ল। এখন কাল থেকে ওখানে বাবুদের বড় একটা প্লট জমি তৈরী করা হবে, সেইজন্য তোদের সব ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। একবার ইচ্ছে হোল বলি—হাঙ্গাম-হুজ্জুত

কোর্টঘর যা হয় হোক জমি আমি ছাড়বনা কিন্তু কাকে বল্‌ব এ কথা? তারা শক্তিমান, অর্থবল লোকবল সবই আছে তাদের। কিন্তু আমার, আমার কি আছে? হাতে পায়ে ধরে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী আর ম্যানেজার বাবুর কাছে কত কাঁদলুম কিন্তু কিছু হল না। এ'ত আমার কথা— আমার জমি ছিল ব'লে এতকথা বলতে পেরেছি। এদের তাও নেই, তাই এরা বল্‌তেও পারল না! ঐ একই তারিখ দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে সোজা হাঁকিয়ে দিলে। ওরা বড় মানুষ, ওদের বড় প্লটে অনেক ফসল ফল্‌বে, অনেক লাভ হবে—তার জন্যে হোকনা দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দারা ঘর বাড়ী ছাড়া, হোকনা দক্ষিণপাড়া লোকালয়শূন্য, ওদের তা'তে কি এসে যায়?

সব কথা শুনিয়া নিরাপদ জিজ্ঞাসা করে, তারপর?

তারপর, বনমালী দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িতে পড়িতে বলে, তারপর বল্‌না কালী, বল্ গোপাল—আমি আর পারিনা!

সবইত বলা হইয়া গিয়াছে! কালীই বা বলিবে কি আর গোপালেরই বা বলিবার কথা কোথায়? সবাই শুধু সেই আসন্ন-সন্ধ্যার স্বল্পালোকে ভরা অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

কাঁদন ব্যাপারটা বুঝিয়াছে। কালই সকালে এই গৃহখানি হইতে তাহাদের বিদায় লইতে হইবে—ইহা ভাবিয়া তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠে। এই গৃহের বাহিরে যে সব শূন্য—শূন্যময় ধূ ধূ করা পৃথিবী। কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহারা? ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠে সে।

বনমালী বলিয়া উঠে, কাঁদো কাঁদো—খুব কাঁদো! কেঁদে ভাসিয়ে দাও দুনিয়াটা—তবু যদি কিছু ফল মেলে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সংবাদটা দক্ষিণপাড়ার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে, প্রতিঘরে উঠে এই কান্নার রোল।…

কালী, গোপাল, শশী ও বিপিন বনমালীর সাথে আসিয়াছিল যদি সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া একটা পথ বাহির করিতে পারে তাহারই আশায়—কিন্তু কোথায় পথ ?

ঐ ঘরে ঘরে শোনা যায় কান্নার রোল···

মর্ম্মাহত স্তম্ভিত নিরাপদ কাণপাতিয়া শোনে ঐ কান্না। রাধা আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, দাদা কি হবে ?

—যে নৌকোর নোঙ্গর ছিঁড়ে যায় তার অবস্থা কি হয় ?

—তাকে ভেসে বেড়াতে হয় !

—তবে আমাদেরও ভেসে বেড়াতে হবে।

শুধু ভাসিয়া চলারই মানুষ তাহারা। কে জানে পৃথিবীর কোন নাম-না-জানা সাগর-জলে তাহারা ভাসিয়া বেড়াইবে !